ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪০২ঃ৩

সৈয়দ আলী আহসান	আধুনিকতাঃ সময় এবং শিল্পের পরিপ্রেক্ষিত
আবু তাহের বাবু	আধুনিক চিত্রকলা চর্চা ও দেশজ সংস্কৃতির বিকাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দৃষ্টান্ত
মোবাশ্বের আলী	বারশ' বছরের বাংলা সাহিত্যঃ রাজনীতিক প্রেক্ষাপট
মোঃ আবুল কাসেম	বাঙালি মুসলমানের বিবর্তনশীল মাতৃভাষা-চেতনাঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অতীত প্রেক্ষাপট
শর্মিষ্ঠা রায়	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কারঃ ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট
মোঃ আশরাফুল ইসলাম	রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ
এ.কে.এম. নুরুল আলম মুহাম্মদ আফাজউদ্দীন	ইসলামী শিক্ষার অনুষঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য
গোলাম কিবরিয়া ভুইয়া	বলকান যুদ্ধে 'দি কমরেড' পত্রিকার ভূমিকা (১৯১২-১৪)
প্রিয়ব্রত পাল	বাংলাদেশে দারিদ্র ও দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টা; একটি পর্যালোচনা
মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামতঃ একটি পর্যালোচনা
মোহাম্মদ সাদেক সেলিনা বানু	মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ রাজশাহীস্থ 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা
মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	বিবাহের 'প্রীতি উপহার'
সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী	বঙ্গভাষার গতি

আইবিএস জার্নাল

আই.বি.এস জার্নাল

সম্পাদক মণ্ডলী

মোখলেসুর রহমান
ইস. ইতিহাস বিভাগ, রা.বি.

এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
ইস. ইতিহাস বিভাগ, রা.বি.

এম. শামসুর রহমান
লোক প্রশাসন বিভাগ, রা.বি.

নুরুল হোসেন চৌধুরী
ইতিহাস বিভাগ, রা.বি.

ঝরণা নাথ
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রা.বি.

সফর আলী আকন্দ
সামাজিক ইতিহাস, আই.বি.এস.

প্রীতি কুমার মিত্র
ইতিহাসতত্ত্ব, আই.বি.এস.

এম. জয়নুল আবেদীন
অর্থনীতি বিভাগ, আই.বি.এস.

নির্বাহী সম্পাদক
মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস
পরিচালক, আই.বি.এস.

প্রবন্ধে উদ্বৃত্ত তথ্য ও মতামতের জন্য ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ–এর কোনো দায়দায়িত্ব নাই।

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আই.বি.এস. জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী–৬২০৫
বাংলাদেশ।

আই.বি.এস. জার্নাল

১৪০২ ঃ ৩

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সম্পাদিত

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকঃ
মোফাজ্জল হোসেন
সচিব, আই.বি.এস.
ফোনঃ ৪৮৫৩

প্রকাশ কালঃ
চৈত্র ১৪০২
এপ্রিল ১৯৯৬

মূল্যঃ ৫০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
ডঃ আবু তাহের বাবু

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণঃ
সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
এ/১৭৪ শিল্পনগরী, রাজশাহী। ফোনঃ ৫৮৪২

সূচীপত্র

সৈয়দ আলী আহসান	আধুনিকতাঃ সময় এবং শিল্পের পরিপ্রেক্ষিত	১
আবু তাহের বাবু	আধুনিক চিত্রকলা চর্চা ও দেশজ সংস্কৃতির বিকাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দৃষ্টান্ত	৭
মোবাশ্বের আলী	বারশ' বছরের বাংলা সাহিত্যঃ রাজনীতিক প্রেক্ষাপট	১৭
মোঃ আবুল কাসেম	বাঙালি মুসলমানের বিবর্তনশীল মাতৃভাষা-চেতনাঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অতীত প্রেক্ষাপট	৪৩
শর্মিষ্ঠা রায়	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কারঃ ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট	৫১
মোঃ আশরাফুল ইসলাম	রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ	৬৩
এ.কে.এম. নুরুল আলম মুহাম্মদ আফাজউদ্দীন	ইসলামী শিক্ষার অনুষঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য	৭৯
গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া	বলকান যুদ্ধে 'দি কমরেড' পত্রিকার ভূমিকা (১৯১২-১৪)	৯৭
প্রিয়ব্রত পাল	বাংলাদেশে দারিদ্র ও দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টা; একটি পর্যালোচনা	১০৭
মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামতঃ একটি পর্যালোচনা	১১৭
মোহাম্মদ সাদেক সেলিনা বানু	মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ রাজশাহীস্থ 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা	১৩৫
মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	বিবাহের 'প্রীতি উপহার'	১৫৫
সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী	বঙ্গভাষার গতি	১৮৯

প্রবন্ধকার পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসান	জাতীয় অধ্যাপক, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আবু তাহের বাবু	সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
মোবাশ্বের আলী	বহু সরকারী কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত
মোঃ আবুল কাসেম	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
শর্মিষ্ঠা রায়	পিএইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস.
মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সহঃ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এন. এস. সরকারী কলেজ, নাটোর, বাংলাদেশ
এ.কে.এম. নুরুল আলম মুহাম্মদ আফাজউদ্দীন	উভয়েই সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
গোলাম কিবরিয়া ভুইয়া	সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
প্রিয়ব্রত পাল	সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	পিএইচ. ডি. ফেলো, আই.বি.এস.
মোহাম্মদ সাদেক সেলিনা বানু	অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. ফেলো. সমাজকর্ম বিভাগ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী	ধনবাড়ীর জমিদার; বুদ্ধিজীবী

আধুনিকতা ঃ সময় এবং শিল্পের পরিপ্রেক্ষিত*

সৈয়দ আলী আহসান

আমি এ মুহূর্তে যে সময়ের মধ্যে বাস করছি সে সময়টি আমার অবস্থানের এবং বোধের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। আমি আমার সময়কালে সকল ঘটনার সাক্ষী, আমি আমার সময়কালে সকল আবিস্কারের লক্ষ্য এবং আমি আমার সময়কালের সকল বিশ্বাসের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার এবং সাক্ষ্য আমার অনুভূতিকে একদিকে যেমন শাসন করে, আবার অন্যদিকে, পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহায্য করে। আমি যে অবস্থায় যেখানেই বাস করি না কেন, আমার কাছে কিন্তু অতীতের ইতিহাস সুস্পষ্ট, আমি অতীতকে গ্রহণ করি বা না করি, অতীত আমার কাছে অনুকূল না প্রতিকূল এ সমস্ত চিন্তা এবং বিবেচনার অধিকার আমি পেয়ে থাকি বর্তমান সময়ের অঙ্গীকার থেকে। আমি আধুনিকতা বলতে বুঝি বর্তমান সময়ের সর্বপ্রকার চৈতন্যকে। এ চৈতন্য একই সঙ্গে প্রকাশ্যে পরিস্ফুট জীবনের এবং অন্তর্লীন মানসলোকের। প্রকাশ্য জীবনকে আমরা দৃষ্টির অধিকারে গ্রহণ করে থাকি এবং এ প্রকাশ্য জীবনে বিজ্ঞান আছে, প্রকৌশল আছে, নির্মিতি আছে, আবার প্রকৃতির বহুমাত্রার ঔদার্য আছে, তেমনি আবার মানস-চৈতন্যের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ আছে, বিশ্বাসের পরিমিতি আছে এবং জ্ঞানের অধিকার আছে। সুতরাং আধুনিকতার চৈতন্য অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গভীর।

একজন মানুষ তার দৃষ্টির অধিকারে পৃথিবীকে গ্রহণ করে। এ অধিকারটি একই সঙ্গে দু'রকমঃ একটি হচ্ছে দর্শনজাত, অপরটি উপলব্ধিজাত। যা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, তাকে আমরা নির্ণয় করি কখনও গণিতের সাহায্যে, কখনও পরিমাপের সাহায্যে, কখনও বিবৃতির সাহায্যে, আবার কখনও কল্পনার স্পর্শ দিয়ে। আমরা যা দেখি তার কিছু অংশ বাস্তব, আবার কিছু অংশ কাল্পনিক। কল্পনা হচ্ছে বোধ ও অনুভূতির সাহায্যে বাস্তবের এক নব নির্মিতি। এই নির্মিতিটা ধরা পড়ে চিত্রকলায়, কবিতায়, ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যে। একজন শিল্পী তার দৃশ্যমান জগতকে তার দৃশ্যমান অনুভূতির সাহায্যে প্রশ্ন করে থাকে এবং এ প্রশ্নের সাহায্যে যে উত্তরটি গড়ে ওঠে সে উত্তরটি বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে; কখনও কবিতা হয়, কখনও রূপবান ছবি হয়, কখনও একটি শূন্যস্থানে একটি অট্টালিকার আকৃতি হয়। ইংরেজী ভাষায় এটাকে দুটি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে *পারসেপশন*, আরেকটি হচ্ছে *এক্সপ্রেশন*। *পারসেপশনকে* আমরা প্রত্যক্ষকরণ বলতে পারি যা হচ্ছে একজন মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অনুভূতি। *এক্সপ্রেশন* হচ্ছে অভিব্যক্তি, যা

---

* আই.বি.এস. সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

প্রতীকগতরূপে কখনও শব্দে, আবার কখনও বস্তুগত নির্মিতিতে প্রকাশ্য হয়। এ পৃথিবীতে মানুষ নানারূপে পার্থিব বস্তুকে দেখে থাকে এবং সকলের দেখা এক রকমের হয় না। আবার সকল কালের দেখাও একই রকমের নয়।

যে প্রকৃতি পৃথিবীর আদি থেকে আছে সে অর্থে সনাতন, সে প্রকৃতিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়ে পড়ছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এক সময়ের বনাঞ্চল পরবর্তী সময়ে কলরবমুখর জনপদে পরিণত হয়। এক সময়কার নদী এবং পুকুর পরবর্তী সময়ে ভরাট হয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়, এক সময়কার শীতল আবহাওয়া হয়তো অন্য এক সময়ে গ্রীষ্মের দাবদাহে পরিণত হয়। মোটকথা, আধুনিক সময় একেক কালে একেক রকম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে যে নির্জন পথঘাট দেখেছিলেন, কোলাহল শোনেননি এবং পুষ্করিণীতে স্নানরতা কয়েকজন রমনীকে দেখেছিলেন। তিনিই তার পরিণত বয়সে জোড়াসাঁকোতে এ দৃশ্য আর দেখেননি। আমরা এভাবেই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাই। এ দৃশ্যান্তর সম্পর্কে *মিলিন্দ পইনহো*তে একটি সুন্দর প্রশ্নোত্তর আছে। গ্রীক সম্রাট মিলিন্দ অর্থাৎ মিরাণ্ডার বুদ্ধের সেবক নাগ সেনকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "মানুষের সতত পরিবর্তনশীলতার তাৎপর্য কি?" অর্থাৎ পুনর্জন্ম কি? নাগ সেন উত্তরে বলেছিলেনঃ "মহারাজ, আপনার একটি শৈশব ছিল, আপনার একটি যৌবন ছিল এবং বর্তমানে আপনি একজন পরিণত বয়সী, শৈশবের আপনি, যৌবনের আপনি এবং বর্তমানের আপনি এই তিনজন কি একই রিপুর অধিকারী? না, মহারাজ তা নয়, আপনাকে অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং আপনার জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বোধ মূর্তি লাভ করেছিল। বর্তমানে আপনি একজন অন্য মানুষ। মৃত্যুর পরও আপনার পরিবর্তন চলতে থাকবে বহু অয়নের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে অবশেষে নির্বাণে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।" নাগ সেনের কথা থেকে আমরা যে সত্যটি পাচ্ছি তা হচ্ছে মানুষের জীবনে সময় বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন প্রকৃতির। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কালে যে বোধ এবং দৃষ্টির সীমায় আবদ্ধ ছিলেন এখনকার দিনের আমরা অবিকল সেই বোধ ও দৃষ্টির সীমার মধ্যে আবদ্ধ নই। আমরা পৃথিবীতে এমন একটি চলাচলের মধ্যে বাস করি তা সতত পরিবর্তন এবং বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন অঙ্গীকারে অভিষিক্ত।

আধুনিককালে মানব জীবনের যে পরিবর্তনটা এলো সে পরিবর্তনটির সূচনা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুটা পূর্ব দিকে। ১৯১৪ সালের পূর্ব দিকে ইউরোপীয় সভ্যতায় কেমন একটি সংক্ষুব্ধতা জেগে উঠেছিল। এই সংক্ষুব্ধতার প্রভাব পড়ে শিল্পকলার উপর এবং সাহিত্যের উপরে। এরফলে শিল্পে ও কাব্যে যে পরিবর্তন আসে তাকেই আমরা বর্তমানকালের আধুনিকতা বলে থাকি। যে কোন সময়ে কবি এবং শিল্পীর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে কিছু সমস্যার সমাধান করা। সে সমস্যা আঙ্গিকের হতে পারে, কল্পনারও হতে পারে। কবি ও শিল্পীরা যখন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সমাধান দেবার চেষ্টা করে থাকেন তখন সে সমস্ত সমাধানের ফলে শিল্পগত সকল প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় না, বরং নতুন বিবেচনার জন্ম হয় এবং সেই সমাধান থেকে আগামীকালের জন্য একটি নতুন

সমস্যারও উদ্ভাবনা জাগে। একজন শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে যুগের প্রাণধর্মকে আবিষ্কার। এ আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনি যুগের ঘটনা পরম্পরাকে স্পর্শ করেন, কিন্তু তার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। রাজনৈতিক চেতনায় পরিবর্তন অথবা সমাজ ব্যবস্থায় একটি নবলব্ধ বিশ্বাস এগুলোর একটা আকস্মিকতা আছে এবং এই পরিবর্তনগুলোর দ্বারা কোন সমাজ বা জাতির বিচার চূড়ান্তভাবে একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গও নির্মাণ করে না। যেহেতু শিল্পের মূল নির্ভরতা হচ্ছে মানুষের একটি অন্তর্গূঢ় চৈতন্য কবি বা শিল্পী প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন না করে মানববোধের সত্য স্বরূপকে আবিস্কার করতে তৎপর হন। আমি বলতে চাচ্ছি, কবি এবং শিল্পী মানুষের চেতনলোকে সকলের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। তারা সর্বকালেই সমস্ত চৈতন্য এবং অনুভূতির পুরোভাগে থাকেন। যেমন প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্যকে তারা অনুভব করেন তেমনি মানুষের অস্থিরতা, যন্ত্রনা, আগ্রহ ও প্রশান্তিকে তারা সহজেই অনুভব করেন। এভাবে কবি এবং শিল্পীগণ একটি জাতির চূড়ান্ত সচেতনতাকে বহন করেন।

কবিতায় অথবা চিত্রকলায় একটি প্রকাশরীতি অথবা আঙ্গিক যখন অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় তখন সেই আঙ্গিক নতুন ভাবধারা বহনের উপযোগী থাকে না। কারণ, প্রথমতঃ বহুল ব্যবহারের ফলে পরিচয়ের ত্রিসীমায় তার যে সহজলভ্যতা তা পাঠকের জন্য কোন দুর্লভ সামগ্রী নয় এবং এই অর্থেই বহন প্রচলিত রীতি একটি গতানুগতিকতায় মলিন হয়ে পড়ে। নতুন সময়ে এবং নতুন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন গতানুগতিক রীতিই পূর্বভাবের অনুষঙ্গে ভারাক্রান্ত। তাই নতুন তাৎপর্যে তা কখনও বহমান হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মানুষ সর্ব মুহূর্তে তার স্বভাব অনুসারে এবং সাময়িক অবস্থার শাসনে একটি বিশিষ্ট প্রকাশরীতি আবিস্কারের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। পূর্বতন রীতি মানুষের বর্তমান অবস্থায় পরিচয়কে প্রকাশ করতে সাধারণত সক্ষম হয় না। আমরা তাই দেখি যে কবিতা বা চিত্রকলায় ভাব বৈলক্ষণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যাণ্ড যখন পৃথিবীতে একটি বিপুল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, শিল্প-বিপ্লবের ফলে একটি অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় আপামর সাধারণ যখন আনন্দিত এবং নব নব বৈজ্ঞানিক আবিস্কারে জ্ঞানের তৎকালীন সমগ্রতায় ইংল্যাণ্ড পরিপুষ্ট তখন টেনিসন ছন্দোবদ্ধ, উপমা ও অনুপ্রাসে অলঙ্কৃত এবং স্বচ্ছলতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত যে কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সে কবিতাগুলো তাদের মর্যাদা হারিয়েছিল। টেনিসনের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুষমামণ্ডিত কবিতা তখন ক্লান্তির উপঢৌকন হয়েছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন বিশ্বাস এবং নতুন বাণী ভঙ্গিকে আবিস্কার করতে চাচ্ছিলেন। সাম্রাজ্যের অহমিকা তখন ক্রমশ বিনাশ হচ্ছে; অর্থনৈতিক অসফলতায় দেশের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অভাবে সর্বত্রই বিভ্রান্তি ও অবিবেচনা; এ সময় যারা কাব্য ক্ষেত্রে নতুন শিল্পীরীতির পরীক্ষা নিয়ে আবির্ভূত হলেন তাঁরা হচ্ছেন হপকিংস, ইয়েটস, এজরা পাউণ্ড এবং টি. এস. ইলিয়ট। এঁরা প্রত্যেকেই ফরাসী প্রতীকী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলত দেখা যাবে যে, ইংল্যাণ্ডের আধুনিক চেতনার উৎস ফরাসী

প্রতীকীবাদ বিদ্যমান ছিল। ইংল্যাণ্ডের কবিতায় যে পরিবর্তন এলো তা মূলত ফরাসী কাব্যের পরিবর্তন সূত্রে।

শিল্পকলাকে একটি নতুন অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন সেজান। তিনি যে সংজ্ঞা দিয়ে ছিলেন আজও সে সংজ্ঞা সত্যধর্মী ও বাস্তববোধ সাপেক্ষ। তিনি বলেছিলেন ঃ "একজন শিল্পী তার চিত্রকলার সাহায্যে একটি বোধকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। যা আছে এবং যা দৃষ্টির অধিকারে চিহ্নিত তা আছে প্রকৃতির কাছে এবং প্রকৃতির সমগ্রতার মধ্যে। কিন্তু তাকে যখন রং ও রেখায় একটি পরিচিতিতে আনব তখন সেটি হবে তার জন্য একটি নতুন অস্তিত্বের দায়ভাগ।" তিনি এজন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন; একটি হচ্ছে *রিয়ালাইজেশন* অর্থাৎ একটি যথার্থতা এবং প্রকৃত অস্তিত্ব নির্মাণ। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে *মডেল্যশন* অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিধান, যাকে সঙ্গীতে সুর-বাঁধা বলা যেতে পারে। যে বস্তুকে শিল্পী দেখছেন তার একটি *ভাইটাল* বা প্রাণপূর্ণ মন-নিবদ্ধতা আছে, থাকে তিনি বলেছেন *ভাইটাল ইনসেনসিটি*। আমি অবশ্য এখানে হারবার্ট রীডের অনুবাদকে গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ একটি বস্তু অথবা আকৃতি নিজস্ব অস্তিত্বে যে শোভা এবং প্রাণ বিকীরণ করে শিল্পী তাকেই নবরূপে আনয়ন করেন। এটাই হচ্ছে নতুন অস্তিত্বে নিয়ে আসা। সেজান এ ধারণাটি রেনেসাঁ যুগের ধারণার সঙ্গে মেলে না। রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা বস্তুর যথার্থতা নির্মাণ করবার চেষ্টা করতেন, তাই তাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদ শিখতেন এবং দূরত্বের জ্যামিতিক পরিমাপ শিখতেন। তাঁরা যা আছে অবিকল তার অনুকৃতি নির্মাণ করবার প্রয়াস পেতেন।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানব চরিত্রের রহস্য বিচিত্রভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে। আমরা এখন জানি যে মানুষের মনোজগৎ বলে একটি বিরাট ও অতলস্পর্শী এক জগৎ আছে। মানুষের চিন্তা, অভিপ্রায়, বাস্তব জীবনে যা অপ্রাসঙ্গিক এ সমস্ত কিছু মনোজগতে সংগৃহীত হতে থাকে। মানুষের মস্তিস্ক এ সমস্ত সংগ্রহকে বিচিত্ররূপে ধারণ করে, আলোড়িত করে, বিক্ষুব্ধ করে। আবার প্রশান্তি নির্জনতায় সুপ্ত করে। মানুষের মনোজগতের এসব তাৎপর্য যখনই পরীক্ষিত হতে লাগে এবং প্রকাশিত হতে লাগে, তখনই শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা এগুলোর বিশিষ্টতা নির্জেফের শিল্পকর্মে এবং আবেগের বিচার্যের মধ্যে পরিস্ফুট করার প্রয়াস পেলেন। দেখা যাচ্ছে যে, মনোজগতে বিভিন্ন চিন্তা অথবা আগ্রহ অথবা অনুসন্ধিৎসা অথবা আকাঙ্খা অথবা হতাশ্বাস একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে চায়। অর্থাৎ মনোজগতের কর্মচৈতন্যের একটি এককালীনতা আছে। ফলে আসে ইংরেজিতে যাকে বলে স্পন্টেনিটি। এর অর্থ হচ্ছে মানুষের মন কখনই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না; এবং মানুষের মনের কোন প্রকার দিক নির্দেশনা নেই। সে একই সঙ্গে বর্তমানকে ধারণ করে, অতীতকে জাগ্রত করে এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্খার স্বরূপ নির্ধারণ করে। এই তিনটি কাজ একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। এগুলো সাহিত্যে এবং চিত্রকর্মে কি করে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্যের শিল্পতত্ত্বজ্ঞ এবং সাহিত্যিকগণ ভাবনা শুরু করলেন। এ ভাবনার ফলশ্রুতিরূপে আমরা *স্ট্রীম অব কনশাসনেস* অর্থাৎ বোধের এককালীন ধারাক্রম এই চিন্তার প্রকাশ পেলাম। যারা এহেন চৈতন্যকে তাদের সৃষ্টিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তারা

যুক্তিকে ভেঙ্গে ফেললেন, ব্যাকরণের বিন্যাসকে অস্বীকার করলেন; এবং একটি অভিনব প্রচেষ্টায় এক ধরণের সমোচ্চারণ নির্মাণ করলেন। প্রুস্ত, জেমস্ জয়েস, বেকেট এবং উইলিয়াম ফকনার এঁরা এই সমুচ্চয়কে সার্থকভাবে রূপ দিলেন। চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর্য এই এককালীনবোধকে রূপ দেবার চেষ্টা যারা করেছেন তাদেরকে আমরা পরাবাস্তববাদী বলি, আবার কখনো অভিব্যক্তিবাদী কঠিন, আবার কখনো কখনো অন্যান্য নানা অভিধায় তাদেরকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করি। এগুলোর সূত্রপাত কিন্তু কিউবিষ্ট পদ্ধতির সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। পিকাসো যদিও কিউবিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক; কিন্তু ব্রাক–কিউবিষ্ট পদ্ধতিকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত লালন করলেন। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে আমরা দেখি ক্যানভাসের সম্মুখের সমান্তরলতায় পাশ্চাত্যের অভিব্যঞ্জনাগুলো জাগ্রত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে পশ্চাৎ এবং সম্মুখকে এককালীন করে ফেলেছেন। কৌশলগত এ দিকটি বর্তমান সময়ের এক ধরনের জীবনবোধে পরিণত হয়েছে। আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, বর্তমানের মানুষ তার সময়কালের তাৎক্ষণিকতার মধ্যে যখন বাস করে তখন সে এই তাৎক্ষণিকতার সকল উপকরণগুলো একই সঙ্গে পেতে চায়। আবার পুরাতন ঐশ্বর্যকে সে অস্বীকার করতে চায় না। এর উপরেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা করার যা আছে তাও সে তাৎক্ষনিক মুহূর্তের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে চায়। এটা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ কারণে আধুনিক শিল্প অথবা কবিতা অথবা সৃষ্টিকর্মের অন্যবিধ প্রকাশ খুব সহজে আমাদের বোধগম্য হয় না। আধুনিক শিল্পকে অথবা সাহিত্যকর্মকে বুঝতে হলে বর্তমান কালের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালেই বিশ্বাসের একটি স্থান ছিল। আদিম যুগের মানুষের কাছে বিশ্বাসের প্রতি বর্ণীকরণ ছিল এক রকম, মধ্যযুগে ছিল অন্য রকম, রেনেসাঁ যুগে ছিল আর এক রকম; এবং বর্তমানে যথার্থ যে কি রকম তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, আমরা যে সময়কালের মধ্যে বাস করছি সে সময়কালে আদিমবোধের মানুষও আছে; মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাসের মানুষও আছে। আবার অপর নাস্তির মানুষও আছে। এরফলে আমাদের সমাজে নানা প্রকার বিচক্ষণী বারবার একে অন্যকে ধাক্কা দেয়। এগুলো বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা আমি করব না। আমি শুধু আমার সময়কালে বিশ্বাসকে আধুনিকতার রূপসমেত কিভাবে দেখতে পাচ্ছি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিককালে মানুষের সময় খুব কম। তাদের জীবন সামগ্রিকভাবে গ্রাস করেছে ব্যস্ততা। কর্মের দায়ভার বিজ্ঞাননির্ভরতার কারণে এতবেশী নিবিষ্টচিত্ততার জন্ম দিচ্ছে যে, মানুষ তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করার অবসর খুঁজে পাচ্ছে না। বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসেছে। দেখা যায়, আজকের বিজ্ঞানের অধিকার কোন চরমতম সিদ্ধি নয়, নতুন আবিস্কারে এর পরিবর্তন আসতে পারে। তাই বর্তমান সময়ের মানুষ সর্বমুহূর্তে একটি সংশয়ের মধ্যে থাকে। যে গ্রহলোককে সে এতদিন জেনেছে, দেখতে পাচ্ছে যে তার স্বরূপের পরিবর্তন হচ্ছে। কিছুদিন আগে আমরা খবরে জেনেছি যে, এতদিন অর্থাৎ বিগত পাঁচশত বৎসর ধরে যে রাশিচক্র আমরা মেনে আসছিলাম তাতে বারোটি রাশির অবস্থান ছিল। বর্তমানে বলা হচ্ছে যে রাশি বারোটি নয়, তেরোটি। ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যদি এই গণনাটি শুদ্ধ হয় তবে এতদিনকার রাশি গণনা

যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল তাই প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ আমরা দেখতে যাচ্ছি যে, বর্তমান কালে প্রাচীন বিশ্বাসের অবস্থাগুলো বিনষ্ট হয়ে যচ্ছে, এবং নতুন অভিপ্রায় নতুন নতুন চৈতন্যের জন্ম দিচ্ছে। এ সব কারণেই বর্তমান সময়ে মানুষ বেশ কিছুটা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তবুও মনে রাখতে হবে যে, সকল দায়ভাগ গ্রহণ করলেও মানুষকে প্রশান্তির অন্বেষণ করতেই হয়। কেননা প্রশান্তি হচ্ছে মানব মনের অভ্যন্তরীণ নিরুদ্ধ ইচ্ছার একটি প্রকাশ। এই প্রশান্তি একমাত্র বিশ্বাসই এনে দিতে পারে। তাছাড়া আরো একটি বড় কথা আছে, একজন কবি অথবা নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিক অথবা চিত্রকর অথবা ভাস্কর সর্বদা বিশেষ একটি বিশ্বাসকে অনুসন্ধান করেন। যে কথা আমি শুরুতেই বলেছি, সেজান এ কথাই বলেছেন, তাঁর বক্তব্য হচ্ছেঃ একজন শিল্পী তাঁর বিশ্বাসকে এবং অন্তলীন অনুভূতিকে সর্বদাই চেষ্টা করেন অস্তিত্বে নিয়ে আসতে। এই অস্তিত্ব হচ্ছে শিল্পের প্রকাশরূপ। বর্তমানকালে আমেরিকায় এবং জাপানে *আইডিয়া* আর্টি বলে একধরনের শিল্পকলা গড়ে উঠেছে। একে আমি আখ্যা দিয়েছি ভাববাদী শিল্প বলে। এ শিল্প হচ্ছে এমন একধরনের তাৎক্ষণিক শিল্প যাকে অবলোকন করা যায়, কিন্তু অধিকার করা যায় না। যেমন এক জায়গায় কিছু বালু জড় করা হয়েছে, তার উপর রং ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আবার শুষ্ক ও নতুন পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কাছে একটি বোতল রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা এক ধরনের সাময়িক অবস্থানগত ভাববাদী শিল্প। শিল্পীরা বলছেনঃ যথার্থ শিল্পকে অধিকার করা যায় না, গৃহ সজ্জার উপকরণ করা যায় না, এবং চিরকালীন অভিব্যক্তিতে ধরে রাখা যায় না। কিছুদিন আগে বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী সুলতান ফিদা হোসেন অনেকগুলো ছবি এঁকে সেগুলোর প্রদর্শনী করেছিলেন। তিনি সেই ছবিগুলোর ফটো তুলতে দেননি অথবা কাউকে নকল করতে দেননি। কিছুদিন প্রদর্শনী চলল, তারপর দর্শকদের সামনে তিনি একে একে ছবিগুলোকে পুড়িয়ে ফেললেন। এটাও ভাববাদী শিল্পের একটি নতুন প্রকরণ। অর্থাৎ শিল্পকে আয়ত্তে আনা যাবে না, অধিকার করা যাবে না, কিন্তু শিল্পকে অনুভবের মধ্যেই রাখতে হবে। এভাবে অনুভবের মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে একটি শিল্পকে যেভাবে প্রথম দেখেছিলাম, সেই দেখার স্মৃতি অনবরত রূপ পরিবর্তন করবে। এবং এইরূপ পরিবর্তন করাটাই শিল্পের জন্য অনিবার্য সত্য।

আধুনিকতা বর্তমান কালে একটি জটিল পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশে অভীপ্সার পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয় এবং আমরা আমাদের পুরাতনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে চাই সে কারণে আধুনিক সময়ের যে প্রকৃতি পাশ্চাত্যে রূপলাভ করেছে সেই প্রকৃতি বর্তমানে পুরোপুরি আমাদের বোধের আয়ত্ত্বে নেই। সে কারণে আমরা আমাদের নগরজীবনের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের অভিপ্রায়কে আনবার চেষ্টা করছি, আধুনিক সুরের মধ্যে গ্রামের সুরের মিশ্রণ ঘটাতে চাচ্ছি এবং নাগরিক জীবনের রূপকল্পকে এমনভাবে বিচূর্নিত করতে চাচ্ছি যে তার মধ্য দিয়ে আমাদের স্বভাবের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিত যেন ধরা পড়ে। বাংলা কবিতায়, উপন্যাসে এবং অংশত আমাদের চিত্রকর্মে এবং ভাস্কর্যে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ধরনের আবেগের বিচূর্ণতা ধরা পড়েছে। এটাই হচ্ছে বর্তমান সময়ের আধুনিকতা।

আধুনিক চিত্রকলা চর্চা ও দেশজ সংস্কৃতির বিকাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দৃষ্টান্ত

আবু তাহের বাবু

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চায় নিজের দেশের শিকড়ের সাথে সংযোগ রেখে আন্তর্জাতিক হবার জন্য শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর চিত্রকলায় কিছু দিক নির্দেশনা আমাদের দিয়ে গেছেন। বিশ্বের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা দেখি মূলতঃ ইয়োরোপের ইতিহাসবিদরাই তা রচনা করেছেন এবং তাঁদের রচনায় ইয়োরোপই সবটুকু জায়গা জুড়ে আছে। প্রাচ্যের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস নেই, আছে শুধু প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ওপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য। ফলে আমাদের আধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টিতে এবং চিত্ররীতির যুক্তি ও নান্দনিকতায় ইয়োরোপীয় মানসিকতা খুব বেশী কাজ করে। তবে একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো, বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিক চিত্র শিল্পী প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের কাছ থেকে আঙ্গিকগত অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ বহু পূর্বের প্রাচ্য শিল্পকলার ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় আমাদের আছে তা বিশ্ববাসীর জানা হয়ে গেল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর চিত্রকলা সৃষ্টিতে দেশীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশ্ব সংস্কৃতির মাঝে সমন্বয় সাধন করে আমাদের আত্মপরিচয় নির্মাণে সব সময় সচেষ্ট থেকেছেন।

ভূমিকা

চিত্রশিল্পীরা তাঁদের চিত্রকলায় দেশের মানুষ ও প্রকৃতি তথা তাবৎ বিশ্বের মানবজাতি ও প্রকৃতির কথাই তুলে ধরেন। তাই চিত্রকলায় দেশীয় পরিচিতির মধ্যেই যে আন্তর্জাতিকতা প্রকাশ পায় তা বলবার অবকাশ রাখে না। যদিও প্রত্যেক দেশের চিত্রকলায় সেই দেশের ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় তথাপি শিল্পের একটি চরিত্র হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। দার্শনিক হেগেলের মতে, একটি মাধ্যম আরেকটি মাধ্যমকে, একটি প্রকরণ আরেকটি, একটি যুগ আরেকটি যুগকে পরিপূরণ করে চলেছে ক্রমাগত। তাই আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্য দেশগুলোর শিল্পীরা বিভিন্ন সময় চিত্রে পরিবর্তন এনেছেন, এবং এই পরিবর্তন আনতে তাঁরা কখনও আদিম শিল্পকলা থেকে কখনও বা লোকজ শিল্পকলা থেকে অথবা প্রাচ্য শিল্পকলা থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছেন। এ প্রভাব তাঁরা গ্রহণ করেছেন নতুন আংগিকগত দিককে ফুটিয়ে তুলতে অথবা শিল্পের শক্তিমান ভাষাকে প্রকাশ করতে। যেমন হিস্পানী শিল্পী পাবলো পিকাসো কৃষ্ণ আফ্রিকার ভাস্কর্যের চরিত্র থেকে তাঁর 'কিউবিজম' ধারা প্রবর্তনের প্রেরণা পান। ফরাশি কিউবিষ্ট

শিল্পী ব্রাক ইরানী নক্সাধর্মিতা থেকে তাঁর চিত্রের আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। 'ফোববাদী' শিল্পী মাতিস সহ পরবর্তী অনেক শিল্পীই চিত্রকলায় জাপানি ছাপচিত্রের প্রভাব নিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শিল্পীরাই তাঁদের নিজ দেশের ঐতিহ্য ও লোকজ শিল্পের প্রভাব নিয়ে নিত্য নতুন আঙ্গিক চিত্রকলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রশিল্পীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রফেসর শোভন সোম যথার্থই বলেছেন, "অনাদি কাল থেকে দাদী নানীর মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় আমরা গান, রূপকথা শুনে আসছি। সেগুলি আমাদের মজ্জায় মিশে গেছে। সেই আমাদের কাঁথার ফোঁড়ে ফোঁড়ে আমাদের কামনা বাসনাগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের কবিতায় গল্পে সেই নকসী কাঁথার মাঠ ফিরে ফিরে এসেছে। এ আমাদের ঐতিহ্যের গভীরে রয়েছে।"[১] এ সমস্তই আমাদের চিত্রকলা চর্চাতেও প্রকাশ পেয়েছে।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর নেতৃত্বে ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই শিল্পীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জন্ম নেয়। প্রথমদিকে শিল্পীরা এদেশে মানুষের মনে চিত্রকলাকে গ্রহণ করাবার জন্য "ঢাকা আর্ট গ্রুপ" নামে একটি চিত্রকলা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং তখন তাতে বুদ্ধিজীবীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর ১৯৫২ সালে এসে ঢাকায় বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার সাথে শিল্পীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। সে সময়ের উত্তপ্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে শিল্পীরা জ্বলে উঠেছিলেন এবং চিত্রকলায় প্রকাশ করেছিলেন তীব্র নিন্দা, তীক্ষ্ণ বিবৃতি ও সংগ্রামের সাহসী সৈনিকের চেতনা যা পরে ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রূপ নিয়েছিল। পঞ্চাশে পাশ করা তখনকার অধিকাংশ তরুণ শিল্পীরা নতুন দিগন্তের হাতছানিতে বর্হিদেশে গমন করেছিলেন উচ্চতর শিল্পশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এবং দেশে ফিরে এসেছিলেন পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক চিত্রকালার নতুন নতুন শিল্প আন্দোলনের চেতনা নিয়ে। তারপর তাঁরা চিত্রে নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে নব্য অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এরপর ষাটের দশকের শেষদিকে দেশের রাজনৈতিক পটভূমি আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠে এবং চিত্রকলা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কেননা তখন দেশে স্বাধীনতার জন্য গণজাগরণ শুরু হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলায় নয়মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে এবং 'বাংলাদেশ' স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এদেশের চিত্র শিল্পীরা আবার নিজেদের শিকড় এর সাথে সম্পর্ক রেখে চিত্রকলা চর্চা শুরু করেন। শিল্পীদের চেতনায় তখন ভয়াবহ ও যন্ত্রণাকর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে তা প্রভাব ফেলে। ফলে স্বাধীনতা উত্তর তরুণ শিল্পীদের কাজে এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটে, নতুন স্রোতধারা বইতে শুরু করে এবং শিল্পীরা আরো পরিণতিমুখী হতে থাকেন, তখন ঢাকায় শুধু শিল্পকলার একক আন্দোলন রইলো না, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীসহ খুলনায়ও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার সফলতা সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, চিত্রকলায় আমাদের জাতিগত চেতনাবোধ জন্ম নিয়েছে ও আপন দেশীয় স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন এর চিত্রকলা

চল্লিশ দশকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয় শিল্পীদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে এবং এসব তাঁদের শিল্পের বিষয় হয়ে উঠে। এসব থেকে শিল্পীরা যেমন শিল্পের বিষয় নির্বাচন করেছিলেন তেমনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শৈলীও নির্মাণ করছিলেন। এভাবেই শিল্পী জয়নুল আবেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কলকাতার পথে দুর্ভিক্ষে খেতে না পাওয়া মানুষদের ছবি এঁকে। তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা শিল্পী গ্রুপের সদস্য ছিলেন না। পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রাম উজাড় করে কলকাতায় অন্নের খোঁজে আসা মানুষদের প্রতিবাদহীন অসাহয়তা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। মানবেতিহাসের এক সমুহ বিপর্যয় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তিনি বলিষ্ঠ রেখায় প্রকাশ করেছিলেন, এতে করে তাঁর চিত্রকলায় অ্যাকাডেমিক সংকীর্ণতা ও পৌনপুনিকতা প্রবলভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় এটা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, আঙ্গিক কখনই বিষয় নিরপেক্ষ নয়। আঙ্গিক হলো বিষয় সাপেক্ষ এবং বিষয়কে স্ফুটতর করাই আঙ্গিকের কাজ। বিষয়ই আঙ্গিককে টেনে আনে। সে সময় অনেক শিল্পীই দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রে পেয়েছে সার্থক ও পরিপূর্ণভাবে মন্বন্তরের ভয়াবহতা ও মর্মস্পর্শিতার আবেদন। তাঁর নিজের কথায়, "যামিনী দা বলতেন, এই দুঃখের ওপর আবার দুঃখ দিলে জয়নুল।" যামিনী দা'ই বলতে গেলে আমাকে বাধ্য করলেন ছবিগুলো বাইরের মানুষকে দেখাতে, প্রদর্শনী করতে। ... এখন সবাইকে একবার দেখতে হবে। দেখে দুঃখ পেতে হবে এবং দুঃখ থেকে আনন্দ। দেখতে হবে বিড়লাকে, ধনকুবের বিড়লা অলক্ষ্যে পাপ সচেতন হয়ে বলে উঠবেঃ সরিয়ে নাও এগুলো আমার সামনে থেকে, আমি সহ্য করতে পারি না। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অবশ্য সহ্য করলেন। সহ্য নয় শুধু– তিনি, ভেংকটাচারিয়াম, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী, মুলক রাজ আনন্দ প্রমুখ কলকাতার এই অখ্যাত বাঙাল শিল্পীকে রাতারাতি ভারত বিখ্যাত করে তুললেন।"২ শিল্পী জীবনের পরবর্তী তাঁর চিত্রকলার বিষয় বাংলাদেশ ও বাঙালি, বাংলার মৃত্তিকায় প্রোথিত শিকড়ই তাঁর চিত্রধারার, চিত্রকলার প্রাণরস জুগিয়েছে।

শিল্পী যে ছবি আঁকেন তাতে অবচেতনভাবে নিজেকেই আঁকেন, নিজের মনের কথার প্রতিবিম্ব রুপ পায় তাঁর চিত্রে। ঠিক তেমনি কবিতায় কবি নিজের কথা বলেন। এটা সব কিছুতেই, মানুষ অপরকে তাঁর নিজের কথাই বলে। নিজের মনের ভাবনা দিয়েই সবকিছুকে ভাবতে শেখেন। শিল্পীর মনের ভাবনায় বা অনুভূতিতে কখনও কখনও কিছু বিষয়বস্ত, আকৃতি বা রং প্রতীক হিসাবে দেখা দেয় যা তাঁর শিল্পে আসে। এরকম কিছু প্রতীক বারবার শিল্পীদের কাজে ঘুরে ফিরে আসে। শিল্পী জয়নুলের চিত্রে দু'টি বিষয়বস্তু প্রতীক হিসাবে বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে– কাক ও গরু (বলদ)। কাক তিনি এঁকেছেন দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় অশুভের প্রতীক হিসাবে। দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা হলো দুঃখজনক ও শোকের। শোকের রং কালো, তাই তিনি কালো কালিতে এই ছবিগুলো এঁকেছেন, ঠিক তেমনি কালো কাকের উপস্থিতি এনেছেন। আর এই কাকের চরিত্র অনুযায়ী তাদের উপস্থিতি হলো– নোংরা, মহামারী এলাকায়, পুতিগন্ধময় ময়লা আবর্জনাস্তুপে।

এরা যেমন খারাপ নোংরা মরাপঁচা জিনিস খায় তেমনি তাদের কণ্ঠও হয় কর্কশ যা আজও আমাদের মনে অশুভের ইঙ্গিত এনে দেয়। তাই দুর্ভিক্ষের বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে তিনি বারবার এই কাককে বেছে নিয়েছেন। তাঁর এই কাকের ছবিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাতে রেখায় যেমন এসেছে সচলতা, তেমনি স্বভাবগত কাকের ধূর্ততা যা অন্য কোন শিল্পীর আঁকা কাকের চিত্রে এই চরিত্রগত যথার্থতা এবং উপস্থাপনগত সার্থকতা পাওয়া যায় না।

শিল্পী জয়নুলের ছবিতে আর একটি বিষয়বস্ত বারবার এসেছে, তা হচ্ছে, বলদ। এই বলদ কখনও দড়ি ছিঁড়তে বা খুঁটি উপড়ে ফেলতে চাইছে, কখনও বা অদম্য বেগে গাড়ীর চাকা কাদায় পড়ে গেছে তা উঠাতে চাচ্ছে, কখনও বা শক্তি দিয়ে হালচাষ করছে– ফসলের জন্য। এই বলদ হচ্ছে শক্তি। শক্তিটা হচ্ছে প্রজননের– উর্বরার শক্তি, হালচাষের শক্তি, স্বভাবের শক্তি, তার দৈহিক শক্তি। সবদিক থেকেই এই শক্তি তাঁর ছবিতে এসেছে। অর্থাৎ শিল্পী এখানে নিজেই এই অদম্য বেগে, প্রাণশক্তিতে সামাজিক নানারকম বাধা–ধর্মীয় কুসংস্কার, অর্থনৈতিক সংকট, সবকিছু বাধাকে অতিক্রম করে বেড়িয়ে এসেছেন। জয়নুল আবেদিনের মধ্যে এই বাধা অতিক্রম করার ব্যাপারটা ছিল প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। এই বলদ প্রতীকটি তাঁর ছবিতে কলকাতায় আসেনি, এসেছে ঢাকায় আসার পর। ঢাকায় আসার পর শিল্পচর্চায় তাঁর এই বাধা এসেছিল, সেই বাধা ছিল পাকিস্তানের প্রশাসনিক বাধা, সমাজে শিল্পকলাকে গ্রহণ করার বাধা। এই সব বাধাকে অতিক্রম করার যে অদম্য শক্তি তা ছবিতে এসেছে, এটা তাঁর নিজেরই মানসিক শক্তি। এই শক্তিতেই তিনি আমাদের সমাজে শিল্পকলার হালচাষ করেছেন। শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর চিত্রকলায় জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন, এবং এই সত্যকে দর্শকের মাঝে, সর্বসাধারণের মাঝে সঞ্চারিত করেছেন, প্রভাবিত করেছেন, দেশের মানুষকে একটি আদর্শে একটি সত্ত্বায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর চিত্রে প্রকৃতি এবং মানুষ সর্বাঙ্গীন একাত্ম হয়ে সৌন্দর্য লাভ করেছে, এই সৌন্দর্য এসেছে কখনও সুখী জীবন প্রণালীতে আবার কখনও এসেছে শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও বিদ্রোহের রূপ নিয়ে।

শিল্পী জয়নুল আবেদিনের চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রেখা প্রধান। চিত্রে এই রেখার ব্যবহার বা রৈখিক চরিত্র আমাদের প্রাচীন বাংলার পালযুগের পুঁথিচিত্রে ও গ্রামীণ পটচিত্রে ঐতিহ্যের পথ ধরে চলে আসছে। পৃথিবীতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই রেখাঙ্কনের মাধ্যমে ছবি আঁকা চলে এসেছে। বস্তুর কাঠামোকে প্রতিভাস করে তুলতে বা একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তুকে আলাদা করে দেখার জন্য শিল্পীরা রেখার ব্যবহার করেছেন। রেনেসঁস যুগ থেকে প্রথম যখন সরাসরি মডেল দেখে আঁকা শুরু হয় তখন বিশেষ করে শিল্পী দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জোলো ও রাফায়েলের ড্রইং থেকে রেখাচিত্র একটি স্বাধীন মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালে এসে শিল্পী ভ্যানগগ, মাতিস এবং পিকাসো তাঁদের চিত্রে রেখার ব্যবহার আরো স্বাধীন স্বত্তায় প্রকাশ করেন। ভারতীয় এবং চীনা ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলায় রেখার ব্যবহার

গুরুত্বের সাথে ব্যবহার হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ প্রথম রেখাচিত্রের সূচনা করেন, পরবর্তীতে শিল্পী নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তি নিকেতনে চিত্র চর্চায় রেখার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত করেন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় রেখাচিত্রকে আরো নিজেদের সৃজনী সত্ত্বায় এনে দাঁড় করান।[৩] শিল্পী জয়নুল দুর্ভিক্ষের ছবিতে রেখার ব্যবহারে আনলেন বেগবান গতি, বিষয়বস্তুর রুক্ষতা। এই রেখা লালিত ভাষা নয়, এই রেখার মধ্যে ছিল জীবনের কঠোর সংগ্রামের পরিচয়, নির্মম রুঢ় রেখা। বেঙ্গল স্কুল বা ভারতীয় অন্যান্য রীতির সাথে এর কোন মিল নেই। এই রেখা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, কিছুটা অ্যাকাডেমিক ট্রেডিশন থেকে পেয়েছেন বাকিটা তাঁর নিজস্ব। লাইনে তিনি ভলিউম, টেক্সচার আনতেন, এতে জীবনের রুক্ষতাও আনতেন। শিল্পী গোপাল ঘোষ ১৯৫০ সালে যেসব দুর্ভিক্ষের স্কেচ করেছিলেন তাতে সে ভাবে জীবনের রুক্ষতা ফুটে উঠেনি। এখানে রেখা বিষয়ের সাথে একীভূত হয়নি। শিল্পী জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্রগুলো এঁকেছিলেন সাধারণ (টিনটেড) কাগজের উপর কালো কালিতে মোটা ব্রাশের টানে। দামী রং ও ক্যানভাসে আঁকেননি। কেননা, এই চিত্রের বিষয় মর্মান্তিক অভাবগ্রস্থ মৃত্যুপ্রায় মানুষের। মানুষের জীবনে আনন্দের ছিটে ফোঁটাও এখানে নেই। তাই শোকের দিক থেকে তিনি কালো কালি ও সাধারণ কমদামী কাগজ ব্যবহার করেছেন। দুর্ভিক্ষের চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলি হচ্ছে – ডাষ্টবিন এর মধ্যে মানুষ উচ্ছিষ্ট খাবার কুড়াচ্ছে, ডাষ্টবিনের পার্শ্বে উচ্ছিষ্ট খাবারের অন্বেষণে কাক ও মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি, ফুটপাতে মৃতপ্রায় শায়িত মানুষের মুখের ভিতর কাক খাদ্যের জন্য ঠোকরাচ্ছে, ফুটপাতে ক্ষুধার্ত মানুষ ও কুকুর একসাথে শায়িত আর মানুষের শরীরের উপর উপবিষ্ট কাক–যাকে ক্ষুধার্ত রোগাক্রান্ত জীর্ণ মানুষটির তাড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই, ফুটপাতে ও গাছের নিচে কাক ও শিশুদের খাদ্যের আহাজারী, এমনই সব চিত্রের মধ্যে পৃথিবীর সভ্য মানুষের যে মানবতার লঙ্ঘন ও নৈতিক অবক্ষয় তা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। মানবতার চরম অপমানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'ম্যাডোনা–১৯৪৩' ছবিটি। যাতে ফুটপাতে মরে পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে এক হতভাগ্য মা, যার শুষ্ক স্তন মুখে নিয়ে দুধ খাবার বৃথা চেষ্টা করছে তার সন্তান। এই মানব সন্তানটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জন্মেছিলো, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কড়াল গ্রাসে সে তার মায়ের বুকের দুধ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই 'ম্যাডোনা' বিষয়টি নিয়ে সারাবিশ্বে অনেক শিল্পীই ছবি এঁকেছেন। যেমন শিল্পী যত্ত্ব, রাফায়েল প্রমুখ। তাঁদের ম্যাডোনা চিত্রে এসেছে শিশু যিশু তার মাতা মেরীর কোলে, এবং শিল্পী রাফায়েলের ম্যাডোনা হচ্ছে, সুখী সুন্দর মাতার কোলে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। এক্ষেত্রে শিল্পী জয়নুলের যে দুর্ভিক্ষের ম্যাডোনা তা পূর্বের সকল আদর্শকে ছাড়িয়ে এক নতুন আদর্শের জন্ম দিয়েছে, সারা বিশ্বের মানুষকে এক নতুন শিক্ষা দিয়েছে। এতে করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'ম্যাডোনা' ছবিগুলোর মধ্যে শিল্পী জয়নুলের ম্যাডোনা চিত্র ভিন্ন আঙ্গিক ও আদর্শের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়। পাশাপাশি শিল্পী ইন্দ্রগারের আঁকা দুর্ভিক্ষের ম্যাডোনা চিত্রেও দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা যথার্থভাবে আসতে দেখিনা আমরা।

শিল্পী জয়নুলের চিত্রকলায় রেখার ব্যবহার আমরা তাঁর অন্যান্য চিত্রেও দেখতে পাই। যেমন- গুনটানা, মই দেয়া, বিদ্রোহ, সংগ্রাম প্রভৃতি ছবিতে তিনি যেমন রেখার সাহায্যে বস্তুর কাঠামো দিয়েছেন তেমনি দিয়েছেন ছন্দ। এই রেখা হালকা- গাঢ়, চিকণ-মোটা, যা আলোছায়া ও পরিপ্রেক্ষিতের কারণে দিয়েছেন, বস্তুগত বাস্তবতাকে প্রকাশ করার জন্য। পরবর্তীতে তাঁর কিছু কিছু জলরং এর আঁকা চিত্রেও মোম ঘসে বস্তুর আদল আনার জন্য রেখার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যাতে করে তিনি চিত্রে তাঁর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য তৈরী করেছেন। আবার কিছু কিছু চিত্রে তিনি রেখার ব্যবহারে 'খাগ' দিয়ে অর্থাৎ বাঁশের কঞ্চির মাথা কলমের নিবের মতো করে কেটে তা কালিতে ডুবিয়ে নিয়ে বস্তুর বর্হিরেখা দিয়েছেন অথবা তুলি দিয়ে দিয়েছেন।

শিল্পী জয়নুলের চিত্রচর্চার বেশী সংখ্যক ছবি হচ্ছে জলরং মাধ্যমে আঁকা। এই জলরং মাধ্যমে ছবি আঁকতে তিনি সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে এই জলরং দিয়ে ছবি আঁকার একটি পরম্পরা আছে। যা প্রাচীন পালযুগের চিত্রকলা থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদের মুঘল শৈলী ও গ্রামীণ পটচিত্রেও এই জলরং বা পানিতে মিশিয়ে রং ছবিতে ব্যবহার হয়ে এসেছে। প্রকৃতিগতভাবেও আমাদের এই বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ, যা নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-ডোবায় ভর্তি। বর্ষাকালে এবং বন্যার সময় এই দেশ অধিকাংশ পানিতে ভরে যায়। তাই এই জলরং চিত্র যেন এদেশের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। আবার ভাস্কর্য চর্চায় পোড়ামাটির টেরাকোটা ভাস্কর্যও এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বহন করে। জয়নুলের শিল্পী সত্তায় এই দেশীয় মাধ্যমটা সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে, তাই অধিকাংশ ছবিতেই তিনি জলরংকে মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আর একটি বিষয় হলো, তিনি কিছু কিছু জলরং চিত্রকে স্মরণীয় করে রাখতে অনেক কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও দর্শকদের স্বাক্ষর রাখতেন। এতে আর একটি দিক হলো তিনি তাঁর ছবির সাথে দর্শককেও একাত্ম করে নিতেন। যেমন আধুনিক নাটকে কখনো দর্শককে মঞ্চের অভিনেতাদের সাথে এক করে ফেলা হয়।

তাঁর প্রথমদিকের জলরং মাধ্যমে কাজগুলির মধ্যে বেশীরভাগ হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী ও নদীপাড়ের মানুষদের নিয়ে। যেমন 'জেলে নৌকা', 'মাছধরা' ও প্রতিক্ষায়' প্রভৃতি ছবিতে তাঁর বৃটিশ একাডেমিক প্রশিক্ষণের প্রভাব দেখা যায়, তবে ছবিগুলিতে অঙ্কন-দক্ষতা রয়েছে। 'জেলে নৌকা' ছবিতে, সারারাত মাছ ধরার পর সকালের রৌদ্রে নৌকাগুলির উপর জাল শুকোবার এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। যাতে জালের নেটের মধ্যে দিয়ে নৌকা ও পানির যে স্বচ্ছ দৃশ্য তা রং ও তুলির ব্যবহারের দক্ষতার মধ্যে দিয়ে এনেছেন। আর 'প্রতীক্ষায়' ছবিটিতে বোর্ড কাগজের উপর জলরঙের প্রলেপ একটি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য এনেছে। এতে রং শুকিয়ে গিয়ে বোর্ডের যে টেকসচার এবং ভংগুর রেখার প্রধান্য পেয়েছে, তাতে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার রুক্ষতা এসেছে। এই রকম প্রায় সব ছবিতেই তাঁর বিষয়ের মানুষ অতি সাধারণ, নিম্নবিত্ত, কৃষক, মোটে মজুর, সর্বহারা। কখনই সমাজের বিত্তবান বা উপরের শ্রেণীর মানুষদের তিনি

ছবিতে বিষয় হিসাবে নেননি। যে সকল মানুষ পরিশ্রম করে, প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচবার জন্য, যাদের শ্রমে গড়ে উঠে জীবনে বেঁচে থাকার সবকিছু তিনি তাদেরই বারবার ছবিতে এনেছেন, দিয়েছেন প্রাধান্য।

শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণকালে সেখানকার আধুনিক শিল্পের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটেছিল, লন্ডন স্লেইড স্কুলের প্রশিক্ষণ ও সেখানকার শিল্পীদের সাথে মত বিনিময়ও তাঁকে বিশ্বের আধুনিক শিল্পকলার জ্ঞানে পরিপক্ক করেছিল। পরে দেশে ফিরে এসে ছবিতে তিনি দেশীয় ঐতিহ্য সম্বলিত লোক শিল্পের রেখা ও সরলীকরণ এর ধারা নিয়ে কাজ করেছেন, সেসব চিত্রে আমরা দেখতে পাই ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার বদলে সমতল ও দ্বিমাত্রিক বাস্তবতা এবং রং এর ব্যবহারে মনের ভাব ও আবেগের প্রকাশ। এ সময় তাঁর ছবির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'রমণী ও কলস', 'বেদেনী', 'স্নানরতা দুই জন মহিলা', 'গ্রাম্য মহিলাদের পানি আনতে যাওয়া', 'বধু ও আয়না', 'মা ও ছেলে', 'মেয়েদের চুল বাঁধা', 'দুইজন মহিলা' ইত্যাদি। ছবিগুলিতে কখনও বধুর গলা লম্বা করেছেন বা মুখের আদল সহজ করে দিয়েছেন। এতে বাংলার গ্রামীণ পুতুল এর সাদৃশ্য মিলিয়ে রেখার ব্যবহারে এনেছেন একটি রেখার সাথে আরেকটি রেখার সংগতিপূর্ণ পরিবর্তন। রেখা ও রং ব্যবহারে তিনি এনেছেন সহজ সরল এবং স্বাচ্ছন্দ গতি। বস্তুগত কাঠামোকেও তিনি সহজভাবে ভেঙ্গেছেন, তাতে বিষয়গতভাবে বাংলার গ্রাম্য মহিলাদের স্বভাবভঙ্গী এসেছে।

শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ১৯৭০ সালে আঁকা 'নবান্ন' ও 'মনপুরা–৭০' স্ক্রল চিত্রকলা দু'টি তাঁর শিল্পী জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি। তিনি বাংলাদেশে শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ গড়ে তোলার সাথে সাথে এদেশের একটি নিজস্ব চিত্ররীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর এই দু'টি ছবিতে। এক্ষেত্রেই তিনি একজন সফলভাবে আমাদের শিল্পের আচার্যের ভূমিকা পালন করেছেন। এ দু'টি চিত্রকলার যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় তা হলো– প্রথমতঃ চিত্রের মাধ্যম হচ্ছে জলরং মাধ্যম, এই জলরং মাধ্যমে প্রাচীনকাল হতে আমাদের দেশে চিত্রকলা তৈরী হয়ে আসছে এবং আমাদের দেশের প্রকৃতির সাথে এই জলরং মাধ্যমটির সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছবির আকারগত দিক থেকে চিত্রদু'টি বাংলার গ্রামীণ জড়ানো পটচিত্রকলা 'স্ক্রল'– এর মতো জড়ানো আকৃতির। তৃতীয়তঃ ছবিতে বিষয়বস্তুর কম্পোজিশন বা সংগঠনে এসেছে বাংলার গ্রামীণ পটচিত্রের বিষয়ের মতো 'ন্যারেটিভ কম্পোজিশন' বা বর্ণনা ভিত্তিক সংগঠন। যে ন্যারেটিভ কম্পোজিশন বাংলার নকশী কাঁথার মধ্যে সততই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নকসী কাঁথায় দেখা যায় 'লোটাস' মটিফের চারিপার্শ্ব দিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষ ফিগার দ্বারা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কখনো নকসী কাঁথায় পুরো ছবিতে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই কম্পোজিশন বা কাহিনীভিত্তিক উপস্থাপনা বাংলা চিত্রকলার ঐতিহ্য শৈলী হিসেবে চলে আসছে। কেননা এদেশ হচ্ছে গ্রামীণ

প্রকৃতি ঘেরা ছয় ঋতুর দেশ, এদেশে আমরা বংশ পরম্পরা ধরে অতীতের গল্প কাহিনী শুনে শুনে বড় হই, যেসব কাহিনীর মধ্যে মিশে আছে আমাদের বীরত্ব গাথা যুদ্ধ বিদ্রোহ, প্রেম ও বিচ্ছেদ যা আমাদের রূপকথায় গ্রামীণ ছড়াগানে এবং এই নকসী কাঁথার মধ্যে রয়েছেঃ এই গ্রামীণ লোক ঐতিহ্যই আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। তাই শিল্পী জয়নুল আবেদিন আমাদের এই ঐতিহ্য তাঁর এসব স্কুল চিত্রকলায় তুলে ধরেছেন যা আন্তর্জাতিক শৈলীর সাথেও সম্পর্কিত। চতুর্থতঃ ছবিতে রেখার ব্যবাহারেও আছে বাংলার পরম্পরা চিত্রশৈলীর রৈখিক বৈশিষ্ট্য। তবে এসব ছবিতে মোম ঘসে যে রেখার আদল আনা হয়েছে, তাতে আছে ভিন্নতর স্বাদ, যা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, পূর্বে তা আলোচনায় বলা হয়েছে। পঞ্চমতঃ ছবির বিষয় একান্তই বাংলাদেশের জীবনভিত্তিক, নবান্ন চিত্রে রূপ পেয়েছে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন যাত্রার সুখ-দুঃখের ঘটনা প্রবাহ এবং মনপুরা ছবিতে আছে দুর্যোগপূর্ণ উপকূলীয় মানুষদের জীবন যাত্রার করুণ দৃশ্য।

'নবান্ন' চিত্রটি পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুট প্রস্থ। চিত্রের বিষয়বস্তু খণ্ড খণ্ড আকারে মোট সাত খণ্ডে এঁকেছেন। ১৯৭০ সালে ফেব্রুয়ারীতে বাঙালীর হারিয়ে যাওয়া নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করতে যেয়ে তিনি এই ছবিটি এঁকেছেন। ছবিতে আছে গ্রাম বাংলার জীবনযাত্রার সুখ দুঃখের ঘটনা প্রবাহ, যেমন- ফসল কাটা, ফসল তোলা, ধানভানা, বিয়ে যাত্রা এবং সবশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহাজনী ঋণের দায়ে নিঃস্ব হয়ে সর্বহারা কৃষকদের শহর অভিমুখে যাত্রা। সবকিছু মিলে পুরো ছবিতে তিনি বাংলার গরীব কৃষকদের জীবনযাত্রা ও করুণ পরিণতি তুলে ধরেছেন। 'মনপুরা-৭০' ছবিটি আটাশ ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুট প্রস্থ। ১৯৭০ সালে ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলে কয়েকটি জেলা ও দ্বীপাঞ্চলে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়েছিল। পানিতে ভাসিয়ে নিয়েছিলো কয়েক লক্ষ মানুষ, পশু-পাখি, নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো অনেক ঘরবাড়ী। এই ভয়াবহ পরিণতির একটি দ্বীপ মনপুরা, যার বাস্তবতা নিয়েই ছবিটি। ছবিতে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ একসাথে গাদাগাদি হয়ে পড়ে রয়েছে। ছবির শেষ অংশে একটি মাত্র মানুষ জীবিত অবস্থায় হাঁটুমুড়ে বসে আছে। হয়তো এই মানুষটিকে ধরেই আবার শুরু হবে পরবর্তী বংশধর। শিল্পীর সৃষ্টি যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি তাঁর সৃষ্টিতে সব মানুষ মরে যায় না, দ্বীপের বহু মানুষ মরে গেছে, তবুও ঝড়ের প্রকোপ এড়িয়ে বেঁচে আছে একটি মানুষ। আবহমান বাংলার মানুষদের করুণ জীবনযাত্রার এইতো পরিণতি। তবে এতে আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অবশেষে নতুন করে বাঁচবার আশ্বাস। এই ছবি প্রসঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন "মনপুরায় যখন তৃতীয় দিনে নামলাম, বন্ধু আর আমি ঘুরছি সারাদিন। যে কয়টা লোক বেঁচে আছে তারা দৌড়ে আসল। দেখলাম সব জখম আলা, তারা কাঁদতে আরম্ভ করলো, আমরাও কাঁদতে আরম্ভ করলাম। আপনারা বিশ্বাস করুন আমার পিছনে সমুদ্রের খাড়ি, লাইন ধরে যেখানেই যান খালি গরু, মানুষ শুয়ে রইছে- বাঙালী মরলে সব এক হয়। তবে শেষ একটা ফিগার আমি মাথা নিচু করে রাখছি বসাইয়া, অরে যদি পারেন বুঝাইয়া শুনাইয়া আবার উঠাইবেন, ভবিষ্যতে- এই রইলো আশা"।[৪] এই কথার মাঝেই প্রকাশ পায় তাঁর সহজ-সরল

হৃদয়ের অনুভূতি, সাধারণ মানুষ দুঃখে কষ্টে কাঁদলে তিনিও কেঁদে ফেলতেন। আবার তাঁর 'বাঙালী মরলে সব এক হয়।' কথার অর্থে– জীবিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে ধনী গরীব আছে, আছে উঁচু নীচু ভেদাভেদ, আছে অহংকার। কিন্তু মরলে আর থাকে না কোন শ্রেণীভেদ, সব মৃত্যুই সমান যা উপলব্ধি করিয়েছেন। এবং তাঁর শেষ কথায় যে মানুষটিকে মাথা নিচু করে এঁকেছেন, তার সম্বন্ধে বলেছেন 'অরে যদি পারেন বুঝাইয়া শুনাইয়া আবার উঠাইবেন ভবিষ্যতে'। এখানে তিনি মানুষটিকে বুঝাবার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেবার কথা বলেন নি, বলেছেন জ্ঞান শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা দেবার কথা, তাঁরা যেন সত্যিকারের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, বাঁচবার জন্য। ভবিষ্যতে বারবার যেন অসহায়ের মতো তাঁদের অকাল মৃত্যু না হয়, তাঁরা যেন সত্যকে জানতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে বেঁচে থাকার সঠিক শিক্ষা। এই মনের আশা নিয়েই তিনি শেষ করেছেন তাঁর চিত্রলেখা।

উপসংহার

প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তেমনি বাংলাদেশের সংস্কৃতিরও আছে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা চিত্রকলার চর্চাতেও লক্ষ্য করা যায়। একটি জাতি তার নিজস্ব চেতনাবোধ প্রকাশের মাধ্যমেই আপন স্বকীয়তার পরিচয় উম্মোচন করে। অতীতে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি সত্তার আগমন ঘটেছে এবং তারা বয়ে নিয়ে এসেছে তাদের সংস্কৃতি। এইসব বিভিন্ন সংস্কৃতির স্রোত আমাদের সংস্কৃতির স্রোতের সাথে মিশে গেলেও মূলসত্তা স্বকীয় ধারা থেকে বিচ্যুৎ হয়নি বরং আরো প্রাণবন্ত, শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এদেশের চিত্রকলাতেও স্বাতন্ত্র এনে দিয়েছে। এদিক থেকে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শিল্পচর্চায় দেশীয়বোধ গড়ে উঠলে দেশের শিক্ষা, আচার–আচরণ, পোশাক–পরিচ্ছেদ, খাদ্য ও স্থাপত্যে এক আমূল পরিবর্তন আসবে এবং তা উত্তরকালে সুন্দর দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়তেও সহায়ক হবে। এই দেশীয়বোধ সৃষ্টিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তথ্য নির্দেশঃ

১। শোভন সোম। "সমকালীন শিল্পচর্চার সমস্যা"। মোস্তফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত *সুন্দরম* (ত্রৈমাসিক) বসন্ত সংখ্যা, ঢাকাঃ ১৩৯৭ বাং) পৃ. ২৩।

২। মাহমুদ শাহ কোরেশী। "দুঃখের ওপর দুঃখ, জয়নুলের জন্য"। *প্রতিভাস* (শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকা), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮ শিল্পচার্যের ৬৭–তম জন্ম বার্ষিকীতে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২৯–৩০।

৩। আবুল মনসুর। "রেখাঙ্কন ও জয়নুল আবেদিন"। *দৈনিক পূর্বকোন*। চট্টগ্রামঃ ২২–৭–৮৮ইং, পৃ. ৫।

৪। *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন* (ডকুমেন্টরী ছবি) ঢাকাঃ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

বারশ' বছরের বাংলা সাহিত্য ঃ রাজনীতিক প্রেক্ষাপট*

মোবাশ্বের আলী

এক

সূচনাতে বলা প্রয়োজন, এদেশের সাহিত্য বিকাশে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পণ্ডিতদের অভিমত বাংলা সাহিত্যের বিকাশ পাল আমলে অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে। পালদের পর্যুদস্ত করে সেনরা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন দ্বাদশ শতকে। আর এই শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরা সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দেশজ ভাষা ও সাহিত্যের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন।

১২০৪ খ্রীঃ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকারের ফলে এদেশে মুসলমান আমলের সূচনা হল। আর মুসলমানেরা এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পরেও। সুদীর্ঘকাল এদেশে রাজভাষা প্রচলিত থাকলেও মুসলমান শাসকগণ কেন কি কারণে ও কিভাবে দেশজ ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক।

১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরেজ রাজস্ব আদায়ের কাল থেকে এদেশের শাসনভার লাভ করে, তারপর ১৯৪৭ পর্যন্ত – প্রায় দুইশ' বছর এদেশ প্রবল প্রতাপে শাসন করে। ইংরেজ শাসকগণ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার মানসে ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৩৫ খ্রীঃ ফারসীর বদলে ইংরেজী রাজভাষা প্রবর্তিত হয়। অথচ ইংরেজ আমলে এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আশ্চর্য ঋদ্ধি ঘটে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে এই সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশ ও সমৃদ্ধির রহস্যজাল আমাদের উন্মোচন করতে হবে। ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান আমল। ইংরেজী আমলে প্রায় দুই শ' বছর ধরে কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। পাকিস্তান মুক্তিলগ্নে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলার মানুষ আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু স্বপ্ন ও বাস্তবে অনেক ব্যবধান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিপর বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করার অপপ্রয়াস, এ তথ্য সবার জানা। আর এরই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে ভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষার জন্যে প্রাণদান, বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ঘটে আত্মোপলব্ধি এবং স্বাধিকার লাভের প্রয়াস।

---

* আই.বি.এস. সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ

১৯৫২ থেকে ৭১ বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস– যার ফলশ্রুতিতে ঘটে একটি রক্তাক্ত সংগ্রাম, যা বিশ্বের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ নামে সুপরিচিত। পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন যেমন সাহিত্যের প্রেরণা হয়েছে তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যেও মুক্তিযুদ্ধ এক অনন্ত প্রেরণাস্বরূপ।

সুতরাং বারশ' বছরের বাংলা সাহিত্য পরিক্রম করলে বলা যায়, এ সাহিত্য রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রতিকূলতায়, আনুকূল্যে বা বৈরীতায় বিকশিত অথবা ক্লিষ্ট হয়েছে।

এ কারণে বারশ' বছরের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, বিশেষ করে বলতে গেলে রাজনীতিক প্রেক্ষাপট উন্মোচনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
এইটুকু ভূমিকার পর আমরা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে যাচ্ছি।

দুই

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপালের রাজদরবার থেকে এই গ্রন্থটি বহু যত্ন ও চেষ্টা সহকারে উদ্ধার করেছেন। চর্যাপদ এবং আরও তিনটি গ্রন্থ সরোজব্রজের *দোহাকোষ,* কৃষ্ণাচার্যের *দোহাকোষ* ও *ডাকার্ণব* একত্রে তাঁর সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নামে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মশায় সব পুঁথির ভাষা বাংলা বলে মনে করেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। শুধু প্রথম পুঁথি চর্যাপদের ভাষাই বাংলা, অপরগুলি অপভ্রংশে রচিত।

চর্যাপদে কাহ্নপাদ, লুইপাদ, শবরপাদ, ভুমুকপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত ৪৭টি – ৪৬টি সম্পূর্ণ, ১টি খণ্ডিত – পদের সন্ধান মেলে। তাছাড়া তিব্বতী অনুবাদে আরও ৩টি পদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে লুইপাদ প্রভৃতি প্রাচীনতম সিদ্ধাচার্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আবির্ভূত হন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, সিদ্ধাচার্যগণ মোটামুটি দশক থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় *প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়* গ্রন্থে তিনটি তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে মহাযান সিদ্ধাচার্যগণের গুরু–শিষ্য পরম্পরা একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন চর্যাকারও রয়েছেন। এর থেকে চর্যা রচনার কাল পরিসর মোটামুটি অবগত হওয়া যায়। চর্যাগীতি অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে বলে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

চর্যাপদ সহজযান মতবাদকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই সহজযান বৌদ্ধ মহাযান মতবাদ থেকে উদ্ভূত। সপ্তম অষ্টম শতকে পূর্বভারতে মহাযান মতবাদ থেকে সহজযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান,

কালচক্রযান ইত্যাদি শাখার উদ্ভব ঘটে। মহাযানের এই প্রতিটি শাখার সাধন–পদ্ধতিতে তন্ত্র–মন্ত্র ও যোগাচারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং গুরু অপরিহার্য। সুতরাং এক যানের সাথে অপর যানের ব্যবধান বড় একটা সুস্পষ্ট নয় এবং এজন্যই একযানের সিদ্ধাচার্য অপর যান কর্তৃক স্বীকৃত। আবার একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মবোধকে অবলম্বন করে চর্যাপদ রচিত হয়েছে এবং এই পদগুলি যাদের উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে তাঁরা প্রাকৃতজন। সুতরাং তাদের নিকট বোধগম্য করার অভিপ্রায়ে তাদের মুখের বুলি বাংলায় যা সবেমাত্র অপভ্রংশের খোলশ ছিন্ন করে রূপ লাভ করতে শুরু করেছে – রচিত হয়েছে। "বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া। মাগধী অপভ্রংশ ক্রমে প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন সৃজ্যমান এই নতুন ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সাদরে, সানন্দে গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন বাংলায় 'চর্যা' গীতিগুলি এই নতুন সৃজ্যমান ভাষায় একমাত্র পরিচয়।"– (নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*)।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে দেশজ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার দরুন। এই সময় বাংলাদেশ পাল রাজাদের শাসনাধীন এবং পাল রাজগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী।

একশ' বছরের মাৎস্যান্যায়ের পর ৭৫০ খ্রীঃ গোপাল গণভোটে দেশের রাজা নির্বাচিত হলেন। গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশ চারশ' বছর ধরে বাংলা ও বিহারে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন– সেনরা পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া অবধি।

লক্ষ্য করার বিষয়, পাল আমলে এসেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সংস্কৃত রাজভাষা হলেও পালরাজগণ তাঁদের ধর্মমত নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন; শুধু তাই নয়, পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। এরই ফলে সিদ্ধাচার্যদের পক্ষে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত রাজভাষা হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রাজকীয় আনুকূল্য এই ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কেউ কেউ যে প্রত্যক্ষভাবে রাজকীয় প্রসাদ লাভ করেছেন, ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মেলে। যেমন কাহ্নপাদ। পাহাড়পুরের সোমপুরে বিহারে অবস্থান করেন অষ্টম শতকের শেষে। আর এই সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল। তিনি ৭৭০ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৮১০ খ্রীঃ অবধি ক্ষমতায় থাকেন।

একটা প্রশ্ন হতে পারেঃ চারশ' বছর ধরে ২৩ জন সিদ্ধাচার্য মাত্র ৫০টি পদ রচনা করেছেন। আর এর মধ্যে একটিরও সন্ধান বাংলাদেশে মেলেনি– ৪৭টি পাওয়া গেছে নেপালে, আর বাকি তিনটি তিব্বতে, তাও অনুবাদের মাধ্যমে।

বৌদ্ধধর্ম দেশের রাজধর্ম বলে এবং রাজ আনুকূল্যে দীর্ঘ চার পাঁচ শতকে আরও অনেক চর্যা রচিত হওয়াই স্বাভবিক। অথচ এদেশে একটি পদের সন্ধানে মেলেনি – এমন কি, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* মতো গোয়াল ঘরেও নয়।

বিষয়টি সত্যি ভাববার মতো। চারশ' বছর ধরে পাল রাজাদের শাসনের পর দ্বাদশ শতকের সূচনায় সেন রাজাদের পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যার পরিণামে বৌদ্ধ আমলে রচিত সাহিত্য আবিষ্কার করতে হয়েছে বিদেশ থেকে – নেপাল ও তিব্বত থেকে।

সেন রাজাদের কীর্তি–কলাপ ও কার্যাবলী আলোচনা করলে তার সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেন আমল নিয়ে আলোচনা করছি।

তিন

পালদের দুর্বলতার সুযোগে সেনরা আধিপত্য বিস্তার করেন। রাঢ় ও দক্ষিণ বঙ্গ আয়ত্ত করার পর সেন বংশের বিজয় সেন (১০৯৫–১১৫৮ খ্রীঃ) উত্তর বঙ্গের অনেকখানি দখল করে নেন। বার শতকের মাঝামাঝি উত্তর বাংলার বাকি অংশটুকু সেনরা অধিকার করেন। এভাবে ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাংলা সেনদের আয়ত্তাধীন হয়।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন ১১৫৮ খ্রীঃ। বল্লাল সেন প্রধানত যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা, বর্ণ সংস্কার ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। বঙ্গীয় কুলজী গ্রন্থে কৌলীণ্য প্রথার উৎপত্তির সাথে বল্লাল সেনের নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কৌলীন্য প্রথা জোরদার করার জন্যে তিনি কণৌজ থেকে ব্রক্ষেণ আসেন এবং নতুন করে বর্ণবিন্যাস করেন। তাঁর কৌলীণ্য প্রথায় ভেদনীতি চরম প্রশ্রয় পায়। তাঁর কোপানলে পাড় সুবর্ণ বনিকেরা শূদ্রের পর্যায়ে নেমে আসে। আবার রাজশক্তি প্রয়োগ করে তিনি যোগী কপাণ্য, গন্ধবণিক এদের বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সূদ্রদের শ্রেণীবিন্যাসে নানারূপ, বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্মণ সেনকে পিতৃ প্রবর্তিত কৌলীণ্যের মধ্যে দু'বার সমীকরণ করতে হয়।

বল্লাল সেন *ব্রত সাগর আচার সাগর প্রতিষ্ঠা সাগর দান সাগর* ও *অদ্ভুত সাগর* এই পাঁচটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হতে মত ও উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি এই সকল গ্রন্থে হিন্দুর নানা আচার প্রতিষ্ঠান নানা কর্ম ও নৈমিত্তিক লক্ষণের বিবরণ দিয়েছেন।

তিনি পুত্র লক্ষণ সেনকে রাজ্যভার অর্পণ করে পুণ্য গঙ্গায় সস্ত্রীক ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন।

লক্ষণ সেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার অসমাপ্ত *অদ্ভুত সাগর* গ্রন্থটি শেষ করেন। তিনি একজন কবি এবং তাঁর রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গেছে। ধোয়ী, সরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রমুখ বিখ্যাত সংস্কৃত কবি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। তাঁর সভাসদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস *সদুক্তি কর্ণামৃত* নামে একটি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ

প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ৪৮৫ জন কবির রচিত ১৩৭০টি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর সভাপণ্ডিত হলায়ুধ ধর্মশাস্ত্র নিয়ে সংস্কৃতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। সেন আমলে রচিত গ্রন্থের তালিকা রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের* (৭ম সংস্করণ) ১৯১–৯৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এই দীর্ঘ তালিকা এখানে পুণরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এসূত্রে বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের মন্তব্য উল্লেখ ঃ

"সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে অপভ্রংশ ও বাংলায় রচিত তান্ত্রিক সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার কমিয়া পুণরায় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির যুগ আরম্ভ হয়।"

সেন রাজারা যদি সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা না করে দেশজ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাহলে সেন আমলে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যেত, কিন্তু অনিবার্য কারণে তা হয়নি।

বরং ক্ষমতাসীন শক্তির শাসনে বৌদ্ধদের শুধু নিগৃহীত নয়, দেশ থেকে বিতাড়ণের একটা প্রচেষ্টা দেখা দেয়। যারা সমর্থ, তারা রাজরোষের ভয়ে বিদেশে – নেপালে, তিব্বতে, বর্মায় – গিয়ে আশ্রয় নেয়। যারা অসমর্থ অর্থাৎ দেশ ছেড়ে যাবার কোন উপায় নেই তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে – পার্বত্য চট্রগ্রামে। একই কারণে আটশ' বছর পরেও দেখা যায়, বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্রগ্রামে।

বৌদ্ধদের সাথে বৌদ্ধরচিত সাহিত্যও বিতাড়িত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বৌদ্ধ গান ও দোহার সন্ধান মিলে নেপালে ও তিব্বতে– তিব্বতে অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে।

অবশ্য ইতিহাসে এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর সাথে তুলনা মেলে য়ুরোপে অন্ধকার যুগের – ইতিহাসে যাকে বলা হয় dark age –গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। গথ ভিসিগথ এই সকল বর্বরের উপর্যুপরি আক্রমণে রোমান সভ্যতার পতন ঘটে এবং সমগ্র য়ূরোপে নেমে আসে ঘোরতর অন্ধকার।' গ্রীক পণ্ডিতেরা প্রাণভয়ে পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে আসেন কন্সটানটিনোপোলে– তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। সেখানে গ্রীক সাহিত্য – দর্শন জ্ঞান – বিজ্ঞান রক্ষিত ও চর্চিত হতে থাকে। তারপর ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় য়ূরোপবাসী এগুলো উদ্ধার করে। ফলে য়ূরোপে ঘটে রেনেসাঁস – পঞ্চদশ – ষোড়শ শতকে।

ইস্তাম্বুলে সযত্নে রক্ষিত না হলে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান –বিজ্ঞানের কি পরিণতি হত, তা বলা মুশকিল। তেমনি নেপালে রাজদরবারে *বৌদ্ধগাণ ও দোহা* এর তিব্বতী অনুবাদে চর্যাপদ পাওয়া না গেলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস কয়েক শ' বছর পিছিয়ে যেত। এবং আমরা আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার থেকে হতাম বঞ্চিত। রাজরোষ কী ভয়াবহ!

বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই নেপাল ও তিব্বতের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যেমন গ্রীক সংস্কৃতিমনা মাত্রেই ইস্তাম্বুলের নিকট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ প্রতিকূলতায় সেন আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংসের কোলে পতিত হয়।

চার

অথচ কৌতুকের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০–১৩৫০ এই সময়টুকু অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ জন্যে নবাগত রাজশক্তিকে দায়ী করা হয়েছে।

অথচ এই নবাগত মুসলমান রাজশক্তিই বাংলা সাহিত্যকে নতুন করে প্রেরণা যোগায়– যে সাহিত্যের গতি সেন আমলে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

মুসলমান রাজকীয় শক্তিরূপে এদেশে এল ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় (১২০৪ খ্রীঃ) এবং এর ফলে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। ইতোঃপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, সেন আমলে বাংলা সাহিত্যের গতি অবরুদ্ধ হয়ে আসে। ফলে মুসলমান আমলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে অনুভূত হয়।

বাংলাদেশে মুসলমান বিজয় অভিযান ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেছে। সে সময় মুসলমানরা রাজকীয় শক্তিরূপে পরিচিত বিশ্বে ক্রম–সম্প্রসারণশীল এবং তাদের গতিবিধি সর্বত্র অপ্রতিহত। তা ছাড়া হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। তাই বখতিয়ার খলজী অতি সহজে বাংলাদেশ অধিকার করলেন। নবাগত মুসলমানেরা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এদেশে বহন করে নিয়ে এল। রাজকীয় শক্তির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রসার ঘটল এবং ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবল জোয়ারের ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল।

ইতোঃপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে, সেন আমলে সংস্কৃত কাব্য–সাহিত্য চর্চিত হয়েছে – জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* এবং ধোয়ীর *পবণদূত* এর সব চাইতে বড় নজির। এ জন্যে সেকালে যে সকল ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনী– যেমন ময়নামতী মানিকচাঁদ, গোপীচাঁদ, চন্ডী মনসা বা ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী – প্রচলিত ছিল, সেগুলো সাহিত্যরূপ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু মুসলমান সুলতানগণ অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন বলে দেশজ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন এবং তাঁদের আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল।

মুসলমান আমলে যে বাংলা সাহিত্য রচিত হল তা মূলত ইসলামী সংস্কৃতি সঞ্জাত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ যুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষ কয়েকটি খাতে বা ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী সাহিত্য মঙ্গল কাব্য, রোমান্টিক এবং ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনী, ইত্যাদি। বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রী চৈতন্যের জীবনী বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। মনসা চন্ডী, ধর্ম ঠাকুর, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি দেব–দেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে।

ইরান-তুরান- হিন্দুস্থানের জন্য কল্প-কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী কাব্য রচিত হয়েছে। আবার এদেশের ধর্ম ভিত্তিক কাহিনী- যেমন নাথ ধর্মের ময়নামতি, মানিকচাঁদ, গোপীচাঁদের কাহিনী কাব্যরূপ লাভ করেছে। আবার *মহুয়া, মহুয়া, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা* ইত্যাদি লোক কাহিনী নিয়ে পালা গান রচিত হয়েছে।

প্রথমত, বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা আলোচনা করা যাক। বৈষ্ণব পদাবলীর উপজীব্য রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান। এ উপাখ্যান বাংলাদেশে মুসলামান বিজয়ের পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং তা অবলম্বন করে জয়দেব সংস্কৃতে *গীতগোবিন্দ* রচনা করেন। শোনা যায়, *গীতগোবিন্দ* নাকি পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাধকদের নিকট বহুল আদৃত হয় - এবং এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, বলতেই হয়। হয়ত রাধা-কৃষ্ণের নাম শুনে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হন এবং তাঁদের বিচারবোধ অবলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা *গীতগোবিন্দ* বিকৃত ও হীন রুচির পরিচায়ক এবং পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে যে ভক্তিভাবের পরিচয় মেলে এর মধ্যে তা বিন্দুমাত্র নেই, বরং ইন্দ্রিয়পারবশ্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব নগন্য এবং এই সাহিত্য যে ইসলামী প্রভাবে রচিত হয়েছে, এর মধ্যে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মুসলমান আমলেই বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩০) পরেই এর বিপুল প্রসার ঘটে। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর আবির্ভাব।

মুসলমানের উদার ধর্মবোধ ও সাম্যভাব ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত আচারক্লিষ্ট হিন্দুকে সজোরে নাড়া দিল এবং হিন্দুধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর নড়বড়ে হয়ে উঠল। এই সংঘাতের ফলেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তিনি হিন্দু ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে ইসলামের অন্তর্নিহিত উদার্যকে অবলম্বন করে হিন্দু ধর্মের এক নতুন রূপ দিলেন এবং এর নাম হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ঠিক একই কারণে উত্তর ভারতে কবির, দাদু, মীরাবঙ্গে, এঁদের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় রাজা রামমোহনের আবির্ভাব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ভগবান প্রেমময়রূপে পরিকল্পিত হয়েছে এবং এরূপ পরিকল্পনা অভিনব বটে। এর দুটি হেতু। প্রথমটি, মুসলমান প্রভাবে ফারসী সূফী সাহিত্যের সাথে বাঙালী হিন্দুর পরিচয় ঘটে। উল্লেখ্য, ফারসী সূফী কবি রুমীর *মসনবী* সে - আমলে ফারসী জানা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করে। সূফী মতবাদে আল্লাহর প্রেমিক সত্তারই প্রকাশ ঘটেছে এবং এরূপ পরিকল্পনা হৃদয়গ্রাহী বলেই বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এর আশ্চর্য প্রভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়টি মনস্তত্বমূলক। ভগবানকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করলে ধর্মবোধ ও সামাজিক ঔচিত্যবোধ দুই বজায় থাকে, অথচ এর সাথে হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যা করা সম্ভব হয়, মন ও প্রাণ কোনটারই হানি হয় না।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ এনামুল হক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সূফী প্রভাব নির্ণয় করেছেন। ডঃ এনামুল হক বলেছেনঃ

'নামে রুচি, জীবে দয়া' – ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের মূলমন্ত্র। তাঁহাদের 'নামে রুচি' কীর্তনের অর্থাৎ নাম সংকীর্তনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং 'জীবে দয়া' সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেব এই 'নামে রুচি' ও 'জীবে দয়া' মুসলিম সূফী সাধকদের 'জিকর' ও 'খিদমৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। সূফীদের 'সমা' ও বৈষ্ণবদেব 'কীর্তনে' কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয় তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সূফীদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। 'কীর্তন' ও 'সমা' এবং 'দশা' ও 'হাল' শব্দার্থ, ভাব, সম্পাদনা ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম' সূফীদের 'ইশ্‌ক'ঃ 'রাধা–কৃষ্ণ' সূফীদের 'সাকী' ও 'বুৎ' কিংবা 'শমআ' ও 'পরওয়ানা'; 'ঐশ্বর্য' সূফীদের 'কিয়ামৎ' ছাড়া আর কিছুই নহে।" – (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য)।

ফারসী সূফী কাব্যের প্রভাবে বাংলায় বৈষ্ণব কাব্য রচিত হয়েছে। সূফী কাব্য রূপকধর্মী; বৈষ্ণব কাব্যও রাধা–কৃষ্ণের রূপকে রচিত। সূফী কাব্যে আল্লাহর প্রেমময় সত্তার উপলব্ধির সাধকচিত্তে যে দুর্বার প্রয়াস, তাই 'আশিক' ও 'মাশুকে'র রূপকে রূপলাভ করেছে। তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীতে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্যে মানবাত্মার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা তাই রাধা কৃষ্ণের মাধ্যমে কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। অতএব বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা–কৃষ্ণ পূর্বকালীন বা পৌরাণিক রাধা–কৃষ্ণ নয়। পদাবলীর রাধা মানবাত্মা বা জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ পরামাত্মার প্রতীক। রাধা–কৃষ্ণে এই যে নতুন আধ্যাত্মমূলক অর্থদ্যোতনা তা একান্তভাবে সূফী কাব্যের প্রভাবসঞ্জাত এবং এজন্যই বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে ফারসী গজলের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ডঃ এনামুল হক এ সাদৃশ্য এভাবে নিরূপণ করেছেনঃ

"সূফীদের 'গজলিয়াৎ' ও বৈষ্ণবদের 'পদাবলীর' ভাব ও রচনা উভয় দিক হইতে অনেকখানি এক। সূফী সাহিত্যের 'মৈয়' ও 'শরাব' বৈষ্ণব পদাবলীতে 'প্রেম' ও 'পিরীতি' হইয়া দেখা দিয়াছে। সূফী সাহিত্যের 'আশিক' 'মাশুক' বৈষ্ণব পদাবলীর 'রাধা' 'কৃষ্ণ'। এই সাহিত্যের 'হিজরান' ও 'বিশাল' বৈষ্ণব পদাবলীর 'বিরহ' ও 'মিলন'।

পদাবলী ব্যতীত বৈষ্ণব সাহিত্যের অপর একটি প্রধান শাখা জীবন–চরিত। বৈষ্ণব সাধকরাই সর্ব প্রথম বাংলা সাহিত্যে মহাজন চরিত রচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*, লোচন দাসের *চৈতন্য মঙ্গল* কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্য চরিতামৃত*, চূড়ামান দাসের *চৈতন্য জীবনী ভুবনমঙ্গল* জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* হরিচরণ দাসের অদ্বৈতের জীবনী *অদ্বৈতমঙ্গল* এবং ঈশান নাগরের *অদ্বৈত প্রকাশ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই মহাজন জীবনচরিতগুলো সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক নয়, বরং এই সকল জীবনীতে চৈতন্য ও অদ্বৈতের বাস্তবরূপ অলৌকিক কাহিনীতে আচ্ছাদিত এবং এই আচ্ছাদন ছিন্ন করে তাঁদের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এক দুরূহ ব্যাপার। বৈষ্ণব সাধকগণ এরূপ জীবনী লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন মুসলমানদের রচিত দরবেশ – ওলিয়াদের জীবনী থেকে। মুসলমান দরবেশ উলিয়াদের জীবনী – যেমন ফরীদুদ্দীন আত্তারের *তজ্‌কিরহ– হ – উলিয়া'*তে – লৌকিক ও আলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। কেননা ভক্তরা জীবনী লিখতে বসে স্বভাবত কল্পনার প্রশ্রয় নিয়েছেন। এরূপ প্রয়াস বৈষ্ণব মহাজন–চরিতেও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, বৈষ্ণব মহাজন চরিতগুলি মুসলমান প্রভাবে রচিত হয়েছে।

রামায়ণ, মহাভারত এই দু'টি মহাকাব্যে হিন্দুদের জীবনবোধ ও বিশ্বাস বিধৃত হয়েছে। মুসলমান সুলতানগণ এই দু'টি মহাকাব্য অনুবাদে উদ্যোগ নিয়েছেন হিন্দুদের বোধ– বিশ্বাসকে জানার ভাগ্যে। গল্প শোনার একটা তাগিদও হয়তো তাঁরা অনুভব করে থাকবেন।

মুসলমান আমলে বৈষ্ণব সাহিত্যের পর মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ধারা। মঙ্গল কাব্যে নানা লৌকিক ও আঞ্চলিক দেব–দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এজন্য একে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ ধর্মীয় সাহিত্য বলে আখ্যাত করেছেন। এবং এর যথার্থ সাহিত্যমূল্য আজও নির্ধারিত হয়নি।

মঙ্গল কাব্যে দেব–দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে বটে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে এক বা একাধিক চমৎকার মানবীয় কাহিনী বলা হয়েছে। *মনসামঙ্গলে* চাঁদ সওদাগর লখীন্দর বেহুলা, চন্ডীমঙ্গলে কালকেতু ফুল্লরা এবং ধনপতি লহনা – খুল্লনা। *ধর্ম মঙ্গলে* লাউসেন এবং *রায়মঙ্গলে* দেবদত্তের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীগুলি কবির স্বকপোলকল্পিত নয়, বরং বহুকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত। অথচ এগুলি কাব্যরূপ লাভ করেছে পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* (১৪৯৪–৯৫ খ্রীঃ) উল্লিখিত হয়েছে যে, কানা হরিদত্ত এর আগে *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক বিপ্রদাস চক্রবর্তী *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন ১৪৯৫–৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং দেখা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয় পঞ্চদশ শতকের শেষে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি মানিক দত্ত। সম্ভবত তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে কাব্য রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী কবি দ্বিজমাধব ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্ডীমঙ্গল রচনা করেছেন। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি নিছক কিংবদন্তীও হতে পারেন। সম্ভবত খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল এর এ কাব্য রচিত হয়েছে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে। *রায় মঙ্গল* কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস এবং কাব্যটি রচিত হয় আনুমানিক ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

সুতরাং মঙ্গল কাব্যের নানা কাহিনী মুসলমান বিজয়ের পূর্বে প্রচলিত থাকলেও কাব্যের উপজীব্য হল ওঠে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে। সেনরাজাদের আমলে এই কাহিনীগুলি কাব্যরূপ লাভ করেনি। এর হেতু এই যে, সে সময়ে বাংলাদেশে ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং এরই ফলে লৌকিক ও আঞ্চলিক কাহিনীর প্রবেশাধিকার ঘটেনি। মুসলমানেরাই এদেশে কাহিনী কাব্যের প্রবর্তন করেন এবং এর দ্বারা উৎসারিত হয়েই যে মঙ্গল কাব্যের রচয়িতাগণ নানা লৌকিক কাহিনীকে কাব্যরূপ দেয়ার প্রয়াস পান, এ কথা অনায়াসে বলা যায়। বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই এর কাব্যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হুসেন শাহেব প্রশংসা নিতান্ত অমূলক নয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মঙ্গল কাব্যের পূর্বেই মুসলমানী কাহিনী–কাব্য রচিত হয়েছে। এ গুলিকে রোমান্টিক কাহিনী কাব্য বলে অভিহিত করা যায়। এ পর্যন্ত যে সকল কাহিনী কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে মুহম্মদ সগীরের *য়ুসুফ জুলিখা* ই প্রাচীনতম। কাব্যটি চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে রচিত হয়। তারপর *লাইলী মজনু, সয়ফুলমুলক, হানিফা ও কয়রাপরী, গুল–ই বকাওলী, জেবুলমূলক, সামারুখ,* ইত্যাদি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে অসংখ্য কাহিনী কাব্য রচিত হয়েছে। এ কাহিনীগুলি মূলত ফারসী প্রভাবজাত।

ফারসী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলায় রোমান্টিক কাহিনী কাব্য রচিত হল এবং এরই সূত্রধরে ভারতীয় কাহিনীর বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ ঘটে। *মনোহর–মধুমালতী গদা–মল্লিকা; বিদ্যাসুন্দর* ইত্যাদি দেশীয় কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় বহু পুঁথি রচিত হয়।

আবার মুসলমানী আমলেই নাথ সাহিত্য নিয়ে অনেক পুঁথি লেখা হয়, যদিও ময়নামতী, মানিক চাঁদ, গৌরীচাঁদের কাহিনীর উদ্ভব ঘটে পাল আমলে। পাল আমল থেকে এ সকল কাহিনী মুখে মুখে চলে আসে এবং মুসলমানী আমলে রচিত হয় গোরক্ষ বিজয়, মানিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, যোগীপাল, ভোগীপাল মহীপাল গীত, ইত্যাদি পুঁথি। যেমন শেখ বা মীর ফয়জুল্লাহ *গোরক্ষবিজয়* রচনা করেন ষোড়শ শতকে; ভবানীদাসের *ময়নামতীরগান* এবং আব্দুস শুকুর মাহমুদের *গোপীচাঁদের সন্ন্যাস* রচিত হয় অষ্টাদশ শতকে।

মানুষের জীবনের মৌল আবেগ ধর্ম, প্রেম, বীররস ইত্যাদি। মুসলমান আমলে সাহিত্যে ধর্মবোধ ও প্রেমানুভূতির প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। বীররসের প্রকাশ ঘটেছে জঙ্গনামায় – হজরত মুহাম্মদ বীর হানিফার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী এবং কারবালার যুদ্ধবর্ণনায়। জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ সুলতান, শারিবিদ খাঁ প্রমুখ লিখেছেন *রসুল বিজয়* কাব্য। মুহম্মদ আকিল লিখেছেন জৈগুনের কিস্‌সা, বীর হানিফার এ্যাডভেঞ্চারা কাহিনী এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। আলাউল লিখেছেন *সিকান্দর নামা।*

কারবালার কাহিনী রূপ দিয়েছেন মৌলত উজির বাহরান খান, মুহম্মদ খান, যামিদ, হায়াত মাহমুদ, নসরুল্লাহ খোন্দকার।

গল্প শোনার চিরন্তন বাসনা থেকে যেমন ধর্মীয় কাহিনী রূপ পেয়েছে তেমনি লোক কাহিনীও মুসলমান আমলে রূপায়িত হয়েছে। মহুয়া, মসুয়া, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা চন্দ্রাবতী এই সকল লোক কাহিনী পালা গান হলেও নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ। মুসলমান সুলতানগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সংক্ষেপে এর একটি বিবরণ দেয়া যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ্য গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৯১–১৪০৯ খ্রীঃ)। কৃত্তিবাস তাঁর আমলে রামায়ণ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি (জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৭০–১৪৬০ খ্রীঃ) সুলতানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেনঃ

মহলম জুগপতি চির জীব জীবয়ু
গ্যাসদীন সুলতান।

সুলতান নিজে শুধু বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। তাঁর আদর্শে অমাত্যগণও অনুপ্রাণিত হবেন, এতো স্বাভাবিক।

এরপর উল্লেখ্য নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৫৫–৭৬ খ্রীঃ)। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। *পদচন্দ্রিকায়* পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র লিখেছেন, তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন এবং নৃপতি তাঁকে উজ্জ্বল মনিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুন্তল, রত্নখচিত দশ আঙ্গুলের অঙ্গুরীয় দিয়ে হাতির পিঠে চড়িয়ে সোনার কলসীর পানিতে অভিষেক করিয়ে 'রায় মুকুট' উপাধি দেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা মালাধর বসুকে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন।

বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস তাঁর দরবারে সমাদৃত হন। সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (১৪৭৬–৮১ খ্রীঃ) অনুগ্রহে কবি জৈনুদ্দীন *রসুল–বিজয়* কাব্য রচনা করেন।

ইউসুফ শাহের পুত্র জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ১৪৮১/৮২ খ্রীঃ হতে ১৪৮৭/৮৮ খ্রীঃ রাজত্ব করেন। বৃন্দাবন দাস *চৈতন্য ভাগবতে* তাঁকে 'মহাতীর নরপতি' বলেছেন।

বাংলা ভাষাভাষীমাত্রই আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রীঃ) নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। কেননা তিনি বাংলা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতার আদর্শ পূর্বসূরীদের কাছে থেকে গ্রহণ করে এর পরাকাষ্ঠা ঘটান এবং এই মহান আদর্শ উত্তরসূরীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা তুলনা রহিত। তিনি বাঙালী ললনাকে ঘরে তুলে বাংলা সাহিত্যকে হেরেমে এবং দরবারের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে

সমগ্র দেশে বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। অথচ তিনি জন্মসূত্রে বাঙালী নন– সুদুর তুর্কীস্থানের অধিবাসী। তাঁর আমলে বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তারা সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। শুধু সমসাময়িক কালের কবিগণ নয়, উত্তরকালের কবিরাও তাঁর প্রশংসায় উচ্ছসিত হন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতক পর দৌলত উজীর বাহরাম খান *লাইলী মজনু* কাব্যে তাঁর প্রশংসা করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সেনাপতিগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী উভয়ে চট্টগ্রামে হোসেন শাহের দুই সেনাপতির – পরাগল খান ও ছুটি খান – পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁদের আদেশে কাব্য রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খানের আদেশে মহাভারতের স্ত্রী পর্ব রচনা করেন। শ্রীকর নন্দী পরাগল খানের যোগ্য পুত্র ছুটি খানের আদেশে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫১৯) এবং পিতার মহান আদর্শ – বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ– অক্ষুন্ন রাখেন। কবিশেখর নামক একজন পদকর্তার ভণিতায় নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে তৎকালীন সুলতান হোসেন শাহের সাথে নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে তৎকালীন সুলতান হোসেন শাহের সাথে নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীখণ্ডের পদকর্তা বিদ্যাপতি নসরৎ শাহের দরবার অলংকৃত করেন। সুলতান তাঁকে 'কবির ঋণে' উপাধিতে ভূষিত করেন। শেখ কবীর নামক একজন পদকর্তাও সুলতানের মহিমা কীর্তণ করেন।

স্বাধীন বাংলার সুলতানগণ এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা একটি রীতিতে পর্যবসিত হয়। তাই নসরৎ শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ যুবরাজ থাকাতেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠাপোষণ করেন। যুবরাজ ফিরোজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর *বিদ্যাসুন্দর* বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেও (১৫৩২–৩৩) কবি সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তা আফজাল আলি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের অকালমৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩–৩৮) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর আমলে শাহ মুহম্মদ সগীর *য়ুসুফ জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। সে আমলে ধর্ম বহির্ভূত বিষয়– মানবীয় প্রেমাবেগ– নিয়ে লেখা এই প্রথম কাব্য এবং সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাব্য।

তাঁর আমলে আমলে বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রয়াস দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে বৃন্দাবন দাস *চৈতন্য ভাবগত* (১৫৩৬) এবং লোচনা দাস *চৈতন্য মঙ্গল* (১৫৩৮) রচনা করেন। বলা হয়েছে, এ সকল জীবনীগ্রন্থ বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার দ্বারা রচিত। মুসলমান সুলতানগণ বাংলা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষণের যে উজ্জ্বল নির্দশন রেখে গেছেন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ফলে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির জোয়ার বয়ে যায়।

সাহিত্যে ঐতিহাসিক কার্যকারণ সূত্র একটি প্রধান কথা। পাল আমলে বাংলা সাহিত্যের সূচনা হলেও সেন আমলে এর গতি অবরুদ্ধ হয়ে আসে, অথচ মুসলমান আমলে এর আশ্চর্য ঋদ্ধি দেখা গেল। এই কথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক প্রেক্ষিত বা প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে হবে।

পাঁচ

ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে ইংরেজ এদেশের শাসন ভার লাভ করে। এদেশে ইংরেজ শাসনের যথার্থ সূচনা ঘটে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট যেদিন ইংরেজ দেওয়ানী লাভ করল। রাজধানী স্থানান্তরিত হল মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় – যেখানে তারা সুদৃঢ় ঘাটি গড়ে তুলেছিল ভাব চার্ণকের আমল থেকে সপ্তদশ শতকের শেষে।

এই ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলাদেশে শাসন জাল বিস্তার ও সুদৃঢ় করার মানসে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে – যার ফল পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়।

পরোক্ষভাবে কথাটি বলা হল এই কারণে যে, ইংরেজ সরকার প্রত্যক্ষভাবে এদেশে এমন শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছেন যে শ্রেণী হবে ইংরেজের অনুকরণ প্রিয় এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্ধ সমর্থক। এই উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফারসীর বদলে ইংরেজী রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা প্রবর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, এই নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

আগের কথাটুকু আাগে বলে নেয়া প্রয়োজন। ইংরেজ এদেশের শাসনভার লাভ করেই এদেশে কায়েমী শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে চাইলেন। ফলে তাদের প্রয়োজন হল এদেশের আইন ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠ রূপ দান। এই প্রয়োজন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আইনের বই অনূদিত হল। আর এই অনুবাদকর্মে যাঁরা ব্রতী হলেন তাঁরা সব ইংরেজ– জোনাথান ডানকান, (১৭৫৬ – ১৮১১) জন চার্লস মেয়ার, (১৭৬৬–৯১) হেনরি পিটার বরস্টার (১৭৬১ – ১৮১৫)। যে ঔপনিবেশিক স্বার্থে আইন পুস্তকের অনুবাদকর্ম গৃহীত হয়, সেই একই স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এরপর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আর এই কলেজে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অধ্যক্ষতায় বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ইংরেজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে এই বিভাগ খোলেননি, খুলেছেন বিলেত থেকে সদ্য আগত সিভিলিয়ানদের দেশজ বা বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার প্রয়াসে। কেননা অধিকৃত অঞ্চলের বা দেশের ভাষা না জানলে তার প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়। একই প্রয়োজনে পাকিস্তান আমলে বাঙালী সিভিলিয়ানদের উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানো হয়।

প্রশাসনিক প্রয়োজন থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। কেরী সাহেবের অধ্যক্ষতায় রামরামবসু মৃত্যুঞ্জয়, তারাচরন শিকদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ লিখলেন গদ্যের বই। বাংলা গদ্য বিকাশের পথে এগিয়ে গেল। আর এরই ফলে বাংলা গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টির অপূর্ব সম্ভাবনা দেখা দিল। ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানী আমলে তুর্কী, মোগল ও নবাবদের কালে সেই সম্ভাবনা দেখা দেয়নি।

এখানে একটা প্রসঙ্গ উথাপন করা যেতে পারে। ফোর্ট উইলিয়মের আগে পুরানো বাংলা গদ্য আবিষ্কারের জন্য অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, আনিসুজ্জামান, পূর্ণেন্দু নাথ, সুধাংসু তুঙ্গ, দেবেশ রায়, কসিমাধব চট্টোপাধ্যায়, গোলাম মুরশিদ প্রমুখ পণ্ডিত ও গবেষকগণ প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন।

তবে ফোর্ট উইলিয়মের পূর্বে গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়নি নানা কারণেঃ
এক. বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম থেকে যাত্রা শুরু করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠে। আর এই সংবাদপত্র বাংলাদেশে ইংরেজী সভ্যতার একটি অবদান।

দুই. বাংলা গদ্য বিকশিত হলেও সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী হয় বিদ্যাসাগরের হাতে– যে কারণে তিনি বাংলা গদ্যের জনক বলে অভিহিত। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর সব চাইতে বড় অবদান এই যে, তিনি ইংরেজী গদ্যের অনুকরণে বাংলা গদ্য নির্মাণ করেন। ইংরেজী গদ্যের অনুসরণে কমা, সেমিকোলন এভাবে যতি বিন্যাস করে বাংলা গদ্যে ছন্দস্পন্দ সঞ্চার করেন।

তিন. বিদ্যাসাগরের মতো গদ্য শিল্পীর আবির্ভাবের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গদ্য স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে সম্ভব হয়েছে।

চার. কিন্তু এ সূত্রে স্মর্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হলে *দুর্গেন্দনন্দিনী*র মতো উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বা পরে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা প্রায় সবাই ইংরেজী শিক্ষায় শুধু শিক্ষিত নয় উচ্চ শিক্ষিত। সে আমলে সাহিত্যিকদের মানস গঠনে হিন্দু কলেজ হুগলী কলেজের অবদান অসামান্য। অথচ ইংরেজরা এই সকল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ সাম্রাজ্যের একদল তল্পীবাহক তৈরি করার অভিপ্রায়ে – যার ফলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। এ সূত্রে মেকলের বিখ্যাত উক্তিটি স্মর্তব্য।
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষাই বাংলাদেশে নিয়ে এল রেনেসাঁস বা নবজাগরণ – বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে শতবর্ষব্যাপী এক আশ্চর্য জাগরণ। আবির্ভাব ঘটল মধূসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার।

ইংরেজী শিক্ষা না পেলে মধূসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটত না। হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে মধূসূদন মিল্টনের মতো কবি হতে চেয়েছেন, এ কথা সবার কথা। কিন্তু যে তথ্যটুকু সবার জন্য নয় তা হল ঃ তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে এ্যাংলো স্যাক্সন সভ্যতাকে

স্বাগত জানিয়েছেন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুদের পুণরুজ্জীবনের জন্যে – খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে। এ সূত্রে মাদ্রাজ প্রবাসকালে তাঁর একটি বক্তৃতা – The Anglo - Saxon and the Hindu -র শেষ অংশটুকু উল্লেখ করা যেতে পারেঃ It is the glorious mission, I repeat, of the Anglo - Saxon to renovate, to regenarate, or in one word, to Christianise the Hindu.

খ্রীষ্টান মধুসূদন প্রথম জীবনে কবিতা ও কাব্য ইংরেজীতে লেখেন, ব্যর্থ হয়ে বাংলায় আসেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *Rajmohon's wife* নামেই প্রকাশ, ইংরেজীতে লেখা। এরপর বাংলাতেই লিখলেন *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাস স্কটের আইভারহো'র অনুসরণে। এরপর বিন্যাসের দিক দিয়ে *কপাল কুণ্ডলা* উল্লেখ। এর মধ্যে সর্বমোট ৩১টি পরিচ্ছেদ আছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের সুচনায় একটি করে উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩১টি উদ্ধৃতির মধ্যে ১৩টি ইংরেজী সাহিত্য থেকে, ৯টি করে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত হয়েছে। একমাত্র সেক্সপীয়ার থেকে নেয়া হয়েছে সাতটি উদ্ধৃতি। এর থেকে বঙ্কিম ইংরেজী সাহিত্য বিশেষ করে সেক্সপীয়ারের প্রতি কতখানি দুর্বল, তা সুস্পষ্ট। 'বঙ্কিম ও সেক্সপীয়ার' শিরোণামে কোন গ্রন্থ আজও কেন রচিত হয়নি, আমার অবাক মনে হয়।

উনিশ শতকে ইংরেজী শাসনব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। অতএব ইংরেজদের স্বাগত জানানোর যে অভিপ্রায় বাংলার নবজাগরণের প্রথম হোতা রাজা রামমোহনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, মধুসূদনের মধ্যে এবং বঙ্গিমচন্দ্রের মধ্যে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

"বন্দেমাতরম" সংগীত স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতার একজন অগ্রদূতরূপে নন্দিত এবং তাঁর *আনন্দমঠ* অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সন্নাসীদের নিকট দারুণ প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণযোগ্য।

ছেয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে *আনন্দমঠ* রচিত। ছেয়াত্তরে মন্বন্তরে ফলে এদেশে ফকির ও সন্নাসী বিদ্রোহ ঘটে রংপুর অঞ্চলে। এবং এই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজ শাসকদের ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হয়। ফকির ও সন্নাসী বিদ্রোহ নিয়ে তিনি একটি দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস লিখতে বসেন। অথচ উপন্যাস লিখতে বসে তিনি একে একটি কল্পিত বা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকার রূপ দেয়ার মানসে পটভূমি বদলে আনলেন বীরভূম অঞ্চলে এবং উপন্যাসে ভক্তিভাব বা ধর্মভাব সংক্রামিত করার মানসে গীতার শ্লোক সংযোজন করলেন। শুধু তাই নয়, ১ম সংস্করণে ভূমিকার সাথে বিজ্ঞাপনে আছেঃ

"বাঙালীর স্ত্রী অনেক সময়েই বাঙালীর সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজপীড়ন অনেক সময়ই আত্মপীড়ণ মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।"

সন্তানেরা বিদ্রোহ করে অন্যায় করেছে, অনেক বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর পক্ষে তা বোধগম্য হয়নি। এ কথাই বঙ্কিম উপন্যাসে বলেছেন। ১ম সংস্করণ ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে আছেঃ
"ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন করার জন্য আসিয়াছিল সন্তানেরা তখন তাহা তুষ্টে নাই।"

উপন্যাসের উপসংহারে চতুর্থ খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদে মহাপুরুষ ও সত্যানন্দের সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্যঃ

> "সত্যানন্দা.... আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।
>
> মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে – মাতৃমঙ্গল সাধন করিয়াছ – ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।
>
> সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব। মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।" – (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ পৃঃ ৭৮৭–৮৮)।

ইংরেজকে মিত্র সম্বোধন করে এই দেশাত্মবোধমূলক উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটেছে। এরপর উল্লেখ্য ইংরেজপ্রভু ওয়ারেন হেস্টিংস এর স্তুতিঃ "এই সময়ে প্রথিতনামা ভারতীয় ইংরেজকূলের প্রাতঃ সূর্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি বিচার করিলেন যে এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব।"

যে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বঙ্কিম ন্যায়বিচারের প্রতীকরূপে চিত্রিত করেছেন তাঁর যথার্থ স্বরূপ এবং inpeachment ইতিহাসের যে কোন ছাত্রের জ্ঞাত। অথচ ডেপুটি বঙ্কিমকে ইংজের রাজ ও ইংরেজ প্রভূদের তোষণ করতেই হয়।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের পরিণতি গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম প্রচারকরূপে। এদিক দিয়ে লিও তলস্তয়ের সাথে তিনি তুলনীয়। এর ফলে রুশ সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি তা অপূরণীয় বলতেই হয়। শেষ জীবনে বঙ্কিম উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়ে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে যেমন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে তেমনি এই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে *গীতাঞ্জলি* লিখে নোবেল পুরস্কার পেলেন তা ইংরেজীতে লেখা আর নিজেই লেখেন বা বাংলা থেকে ইংরেজীতে তরজমা করেন। তারপর ১৯১২ তে বিলেত যাত্রা, ইয়েটসের সাথে যোগাযোগ, বিলেতি বন্ধুদের তারিফ বিলেতী ও মার্কিনী পত্রিকায় সুখ্যাতি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পথ সুগম করে দেয়। এ সকলের বিস্তৃত বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথের *পিতৃস্মৃতি* ও *On the edges of time* গ্রন্থদ্বয়ে।

এই নোবেল পুরস্কার কবির জন্য ব্যক্তিগত অর্জন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্জন। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য সর্বপ্রথম এই গৌরব লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কারপ্রাপ্তির নেপথ্য কাহিনী নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এবং তিনি ইংরেজের একজন বন্ধুরূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ– শত বৎসরে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়াতে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন উদারপন্থী – ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Ii beral জীবনের শান্ত ও সুন্দররূপ ধ্যান করেছেন, কুৎসিতরূপ পরিহার করে গেছেন। সমালোচক আবু সায়ীদ আইয়ুব যতই প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন রবীন্দ্র নাথ evil বা অমঙ্গল নিয়ে ভাবিত তা যথার্থ নয়।

কেননা রবীন্দ্রনাথ সর্বাশ্রয়ী রস – কৌতুহলী কল্পনায় সামান্য অসামান্য, বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে উঠে। তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণের প্রকাশ দেখেছেন, আপাত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে সুন্দরের মহিমা নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর সর্বগ্রাসী রস কল্পনায় সুন্দর অসুন্দর, সু– কু, দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিক্ষোভ চাঞ্চল্য একাকার হয়ে গেছে।

জীবনের এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ধ্যান করেছেন শান্তিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং তাঁর পক্ষে খুন–খারাবি, বোমা – বিস্ফোরণ, মাইন গ্রেনেড, বিপ্লবী– বিদ্রোহী – সন্ত্রাসী এসবকে একটা উৎপাত বলে ভাবাই স্বাভাবিক। জালিয়ানওয়ালাবারে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) এরপর তিনি নাইট খেতাব বর্জন করবেন কিনা, ভাবতে বেশ সময় লাগে। বর্জন করলেন দেড় মাস পর (৩০ মে ১৯১৯)।

এরপর অসহযোগ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর শান্তি নিকেতনে আগমন ও ছাত্রদের সাথে মেলামেশা তিনি সুদৃষ্টিতে দেখেননি। গান্ধী ও গান্ধীর কর্মকাণ্ড এই দুয়ের প্রতি তাঁর বিপরীত দৃষ্টির পরিচয় মেলে।

শান্তিকামী রবীন্দ্রনাথ বড় ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত মোটামুটি এড়িয়ে গেছেন। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শরিক হয়েছেন। এবং এর বিস্তৃত বিচরণ আছে রমেশচন্দ্র মজুমদারকৃত বাংলাদেশের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে।

তবে এই আন্দোলনে তিনি এবং আরো অনেক বিশেষকরে পূর্ব বাংলার বড় বড় জমিদারেরা শরিক হন শুধু ভাষা–ভাষী বিভক্তির কারণে নয়, বিষয় বিভক্তির কারণেও। নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে যাবে তাঁদের জমিদারী, অথচ তাঁদের অবস্থান হবে কলকাতায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর অধিকাংশ রাজশাহী বিভাগে – যে বিভাগ নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত।

সুতরাং তাঁর পক্ষে নিজেকে বিপন্ন ভাবাই স্বাভাবিক। এরপর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তিনি নিরাপদ বোধ করেন।

তিনি গান্ধীর চরকাকে সমর্থন করতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি বিপ্লবী বা সন্ত্রাসীদের। শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* প্রকাশিত হলে (১৯২৬ খ্রীঃ) লেখক ও প্রকাশককে অনেক বিড়ম্বনা ঘটতে হয়। শরৎচন্দ্র এই পরিস্থিতিতে কবির সহানুভূতি যাঞ্চা করেন। বিনিময়ে তিনি ঔপন্যাসিককে লেখেনঃ "আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম– আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম – একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।"

পত্রটিতে আরো আছে, 'বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ প্রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীর চরকাকে সমর্থ করতে পারেননি এবং এ নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। তবে নজরুল গান্ধীর অহিংস নীতিকে সমর্থন করতে পারেননি, কেননা তিনি কবি জীবনের সূচনালগ্ন থেকে চরমপন্থী। তাঁর প্রথম কাব্য অগ্নিবীণা উৎসর্গিত হয়েছে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। ভিনি ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার অভিযোগে কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে বাঙালী কবি বা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম।

রবীন্দ্রনাথ – নজরুল সংবাদ ভারি কৌতুক কর। বিশ্বকবি অনুযোগ করে বলেনঃ "আজকাল তুমি নাকি তরবারি দিয়ে দাঁড়ি চাঁছ।"

এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রচ্ছন্ন। আবার তিনি 'খুন' শব্দটিকে কিছুতে হজম করতে পারেননি। আর এই নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যতই দুর্বলতা থাক না কেন, চরম অবিচার দেখে মাঝে মধ্যে তিনি বিচলিত হয়েছেন এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পুর্বে "সভ্যতার সংকট" ইংরেজের প্রতি তাঁর সকল বিশ্বাস একেবারে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। অবশ্য সে সময় উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তি ম্রিয়মান।

অথচ নজরুল কবি–জীবনের সূচনালগ্ন থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব পোষণ করে এসেছেন– যে সাম্রাজ্যের ছত্র ছায়ায় রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে তিরিশের কবিদের মধ্যে এসে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ঋদ্ধি লাভ করেছে।

এ সময়কে বাংলার নবজাগরণ বলেও কোন কোন ঐতিহাসিক চিহ্নিত করেছেন। এই নবজাগরণের সূচনা রামমোহন দিয়ে আর এর শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও

রবীন্দ্রনাথ। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার জন্যে নিজ ব্যয়ে এ্যাংলো-হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন, ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করলে এদেশের মানুষের মনের মুক্তি ঘটবে না। তাই তাঁর এই আয়োজন এবং এখান থেকে শুরু হয় নবজাগরণের জয়যাত্রা।

নবজাগরণের প্রথম কবি মধুসূদনের অভীষ্ট ছিল Albions distant shore এ যাত্রা। সেই লক্ষ্যে মানস যাত্রা করে তিনি অবশেষে গিয়ে পোঁছেন ২৮০০ বছর আগেকার হেলেনিক জগতে এবং আবিষ্কার করেন হোমারকে – যে হোমার সম্পর্কে এলিয়টের মন্তব্যঃ With Homer started our tradition এই য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্য লালিত হয়েছে।

মধুসূদন *মেঘনাদ বধ* কাব্য হোমার এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের গ্রীক নাট্যকার য়ুরিপেদেশ এর অনুসরণে রচনা করেছেন। রোমান কবি ওভিদের (৪৩ খ্রীঃ পূঃ – ১৭ খ্রীঃ) অনুসরণে রচিত হয়েছে বীরাঙ্গণা কাব্য। রোমান কবি ভার্জিলের এনিড এবং ইতালীয় কবি তাসস্যে অনুসরণে লিখতে চেয়েছেন 'সিংহল বিজয়' মহাকাব্য। এবং য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের কবি পেত্রার্কের অনুসরণে রচনা করেছেন সনেট। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ ইংরেজ মহাকবি মিল্টনের blank verse.

মধুসূদনের পর বঙ্কিমচন্দ্রও য়ূরোপ থেকে বিকীর্ণ আলোকস্নাত হয়েছেন। তবে তিনি নিজেকে ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে সেক্সপীয়ারে সীমিত রেখেছেন। মধুসূদনের মতো রেনেসাঁসের য়ুরোপে অথবা এরও আগে রোমান এবং হেলেনিক জগতে পৌছতে পারেননি। তাঁর এই সীমাবদ্ধতা নৈরাশ্যজনক।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্যের সাথে বিশেষ এবং আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত। তবে কিশোর কালে মধুসূদন আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় একবার মাত্র হোমারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যায় হেলেনিক রোমান বা রেনেসাঁসের য়ুরোপ বাংলা সাহিত্যে ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে থাকে তিরিশের কবিদের ক্ষেত্রে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্পূর্ণ স্বকীয় এবং তিনি নিজের পথে নিজেই এগিয়ে গেছেন। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কলম হয়ে উঠেছে তরবারি। আবার চল্লিশের দশকের সূচনায় উদ্ভাবিত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁর সম্পাদিত নবযুগের পাতাগুলো মেললেই এ কথা স্পষ্ট হবে। শোনা

যায়, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগানটি নাকি কবি ফররুখ আহমদ রচিত। অথচ এটি মৌলানা আকরম খাঁ আজাদ পত্রিকায় নিজের বলে চালিয়ে দেন।

পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ফররুখ আহমদ মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির কথা ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্বপ্ন ও বাস্তবে অনেক ফারাক।

ছয়

পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্নে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার মানুষ রাজনীতিক স্বাধীনতার মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও একরূপ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখে। কথাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

ভৌগোলিক কারণে পূর্ব বাংলার প্রকৃতি ও জীবন ধারা পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি ও জীবনধারা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কাব্যে' এ কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব বাংলায় আছে, প্রকৃতির সাথে মানুষের নিয়ত সংগ্রাম। সংগ্রামশীল মানুষ জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হয়েও অদম্য মনোবলে সে বেঁচে আছে। আর পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি শান্ত কোমল মেদুর। সেখানে জীবন সংগ্রামমুখর নয়, বরং নির্বিরোধ ও শান্তরসে আপ্লুত।

অথচ পূর্ব বাংলার যে বিচিত্র জীবন তা সাহিত্যে রূপায়ণের যথেষ্টমাত্রায় অবকাশ ঘটেনি। কেননা অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে বাংলাদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়। সেখানে যে ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতকের প্রথমে গড়ে ওঠে তা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষা অবলম্বন করে – পূর্ব বাংলার কোন অঞ্চলের ভাষা অবলম্বন করে নয়। ইংরেজ আমলে কলকাতাকেন্দ্রিক যে সাহিত্য গড়ে ওঠে এর মধ্যে পূর্ব বাংলার জীবনধারা অবহেলিত হওয়াই স্বাভাবিক। কলকাতায় বসে বা পশ্চিম বাংলায় থেকে পূর্ব বাংলার জীবন নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। উনিশ শতকের শেষ পাদে রবীন্দ্রনাথের গল্পে পূর্ব বাংলার জীবনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে, তেমন গল্প কি খুব বেশি লেখা হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের গল্প লিখতে পেরেছেন, কেননা এ জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রত্যক্ষ।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামশীল জীবন নিয়ে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অদ্বৈতকুমার মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' অথবা আফসারউদ্দীন আহমদের 'চর ডাঙা চর' এরূপ অসংখ্য উপন্যাস লেখার অবকাশ থাকলেও খুব বেশি কি লেখা হয়েছে?

পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে সূচনা গল্প থেকে অশুভ রাজনীতিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায় নজরুল – রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। প্রথমত নজরুল, কেননা তিনি পাকিস্তান–বিরোধী। এমন প্রস্তাব আসে যে, নজরুলকে সংস্কার করতে হবে। তিনি কবিতায় যে সকল ধর্মবিরোধী উক্তি করেছেন ও শব্দ প্রয়োগ করেছেন সেগুলি বর্জন ও পরিমার্জন করতে হবে।

এরপর আঘাত হানা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি। তবে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে সমকাল সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর এবং বিশেষ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে সৎ সাহস দেখিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ক্ষেত্রে যে রাজনীতি এর চাইতে ভয়াবহ হল ভাষার ক্ষেত্রে রাজনীতিক তৎপরতা। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী বাঙালী। অথচ বাংলা নয়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। মায়ের ভাষা বাংলার কণ্ঠরোধ করার প্রতিবাদে শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন। ফাল্গুনের এক রক্ত ঝরা বিকেলে (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২) ভাষার জন্যে শহীদ হল বাংলা মায়ের দুলালেরা। ভাষার জন্যে মাথাদান বিশ্বের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম।

একুশের প্রেক্ষিতে রচিত মুনির চৌধুরীর 'কবর' এক অপূর্ব অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। ভাষার জন্যে যারা শহীদ হল তারা তো কখনও মুরতাদ হতে পারে না। তারা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে। স্বৈরাচারী শক্তি তাদের মাটিতে পুতে ফেললেও তারা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে, কবর থেকে বেরিয়ে আসবে আগামী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে।

অসুর শক্তি বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। তাই তো আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে কথা বলছি – বিশ্বের মানচিত্রে একমাত্র রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র একান্তভাবে ভাষাভিত্তিক।

সাত

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে বাংলাদেশ আন্দোলন। এই ভাষার প্রশ্নেই জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে। নব্য ঔপনিবেশিকবাদকে পর্যুদস্ত করতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা – মুক্তিসংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে। ফলে '৭১ এর ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে শুরু হয়ে গেল হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ– নৃশংসতায় যা তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির, হালাকুকেও হার মানায়। আর এই মরণযজ্ঞের মধ্যে মুক্তিকামী বাঙালী ঝাপিয়ে পড়ে। ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয় বাংলার মানুষের চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা– যে চেতনায় এদেশের প্রতিটি মানুষ ভাস্বর।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ যে বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হবে, এ প্রত্যাশা নিতান্ত স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প, উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস ইত্যাদি ধারায় এ যাবত কত গ্রন্থ লেখা হয়েছে এর সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের হাতের কাছে নেই। নব্বইয়ের দশকের সূচনায় জাতীয় গ্রন্থ আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বইমেলায় কয়েকশ বইয়ের সংগ্রহ দেখেছি। এরপর প্রতি বছর দেখছি, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নতুন নতুন বই বেরুচ্ছে। এখন হয়তো চারের সংখ্যায় গিয়ে পৌঁচেছে।

মুক্তিযুদ্ধের আবেগ নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয় বাংলাদেশের সাহিত্যে– বিশেষ করে কথা সাহিত্যে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় অসংখ্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও জার্নালে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা হয় অগণিত কবিতা, কিছু সংখ্যক নাটক। রচিত হয় ইতিহাস ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সাহিত্যে হয়ে ওঠে অনন্ত প্রেরণাস্বরূপ। যুদ্ধের বিভীষিকাময় চিত্র, আবার মুক্তিযোদ্ধাদের স্বদেশপ্রাণতার প্রবল আবেগ ও ত্যাগের মহিমা বিধৃত হয়েছে কথা সাহিত্যে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য ছোটগল্প লেখা হয়েছে। যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ অবধি যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়ন, আবেগ ও অনুভূতি এর ছায়াপাত ঘটে ছোটগল্পে। এ সূত্রে শওকত ওসমানের 'দুই ব্রিগেডিয়ার' আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমুদ্দি দফাদার', জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' আলাউদ্দীন আল আজাদের 'রূপান্তর' সুচরিত চৌধুরীর 'নিসঙ্গ নিরাশ্রয়' আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'কেয়া, আমি এবং কয়েক মেজর', সৈয়দ শামসুল হকের কথোপকথনঃ তরুণ দম্পতির' রাহাত খানের 'মধিখানে চর' হাসান আজিজুল হকের 'ফেরা' মঈনুল আহসান সাবেরের 'ভিড়ের মানুষ' ইত্যাদি গল্প উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিচ্ছুরিত হয়েছে আহমদ ছফার 'নিহত নক্ষত্র' বিপ্রদাস বড়ুয়ার 'আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি' 'বীরাঙ্গানা প্রেম' 'যুক্ত জয়ের গল্প' ফজলুর রহমানের 'ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে।

হুমায়ুন আহমদের 'জলিল সাহেবের পিটিশন' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতেরচিত এক অসাধারণ গল্প। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের নাট্য জগৎকে নতুন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করেছে। নাট্য রচনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হল। আমাদের জাতীয় জীবনের সব চাইতে বড় যে অভিজ্ঞতা মুক্তযুদ্ধ নাট্যকারেরা এর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হয়ে উঠল একাত্তর পরবর্তী নাটকের অন্যতম ফল্গুধারা। মুক্তিযুদ্ধের একই সঙ্গে গৌরবময় আবার বেদনাময় অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে নাটকে।

বেদনাময় দিকটি রূপ পেয়েছে আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'তোমরাই' নাটকে। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' একটি উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক। এছাড়া মামুনুর রশীদের 'সমতট', মমতাজ উদ্দীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' 'এবারের সংগ্রাম' 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' 'কি চায় শঙ্খচিল' ও 'এই সেই কণ্ঠস্বর' উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাটকের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশ্বের সর্ব প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক হল গ্রীক নাট্যকার ঈস্কিলাসের 'পারসীকে' (৪৭২ খ্রীঃ পূঃ)। পারস্যযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই নাটকটি আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটকের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট 'পারসীক' এক মূল্যবান দলিল। তাই আড়াই হাজার বছর ধরে নাটকটি দেশে দেশে নন্দিত হয়ে আসছে।

আমাদের প্রত্যাশা, কালে বাংলাদেশের নাট্যকারেরাও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুরূপ নাটক লিখতে সমর্থ হবেন।

যেমন নাটক তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা তলস্তয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*'র অনুরূপ উপন্যাস লেখা হবে– বিংশ শতকে না হলেও একবিংশ শতকে হতে পারে। কেননা যে যুদ্ধের পটভূমিতে *যুদ্ধ ও শান্তি* উপন্যাস রচিত – নেপোলিয়নের যুদ্ধ – তা সংঘটিত হয় ১৮০৫ থেকে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অথচ তলস্তয় উপন্যাসটি রচনা শুরু করেন প্রায় অর্ধ শতক পরে– ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। 'যুদ্ধ ও শান্তি' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এক বিস্তীর্ণ পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত। শুধু তাই নয়, মানবীয় সকল অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেনঃ

There is hardly any subject of human experience that is left out of war and Peace.

আমাদের প্রত্যাশা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগামীতে অনুরূপ উপন্যাস রচিত হবে। আমাদের ঔপন্যাসিকদের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ অশেষ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের আবেগ নিয়ে অজস্র কবিতা রচিত হয়েছে। বেগম সুফিয়া কামালের 'মেহেরুন নেসা' আহসান হাবীবের 'স্বাধীনতা' আবুল হোসেনের 'সেদিন যেন আর না আসে', সৈয়দ আলী আহসানের 'তা হলেই তো আমি জয়ী,' সিকানদার আবু জাফরের 'সংগ্রাম চলবেই', শামসুর রহমানের 'উদ্ধার' শহীদ কাদরীর 'স্বাধীনতার শহর,' আলাউদ্দীন আল আজাদের 'বাংলা তোমার নাম', ফজল শাহাবুদ্দীনের 'একটি দেশকে একাত্তুরে', দিলওয়ারের 'এই দিনে আমি', জিয়া হায়দরের 'একদা কুখ্যাত একজন', ওমর আলীর 'অভিশাপ' আবুবকর সিদ্দিকের 'বাংলার বৃষ্টি', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে' রফিক আজাদের 'কায়মনে তৈরী যে আমি' নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া' মহাদেব সাহার 'নিজস্ব অ্যালবাম', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মৃত্যু, 'বৃষ্টির মতো', আবুল হাসানের 'বিকলাঙ্গের দেশপ্রেম', শিকদার আমিনুল হকের 'নেকড়ের মুখে', মুহম্মদ রফিকের 'হে দেশ, হে আমার বাংলাদেশ', আবু কায়সারের 'বুলডোজার' মুহম্মদ নুরুল হুদার 'কুসুমের ফণা' আসাদ চৌধুরীর 'রিপোর্ট' সাজ্জাদ কাদিরের 'মার্চ '৭১', খালেদা এদিব চৌধুরীর 'একাত্তরের দিনঃ স্বপ্ন এবং কষ্ট' ইমরান নুরের 'স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা', আল মুজাহিদীর 'কাচগড়া' হাবিবুল্লাহ সিরাজীর সৌধ', সানাউল হক খানের 'স্বাধীনতা, নিজের সংজ্ঞায়', হাসান হাফিজের 'শুধু বাংলাদেশ' ইত্যাদি কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের আবেগ নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি কবিতার কয়েকটি চরণঃ

তোমাদের ঘৃণার আগুন লেলিহান স্পর্শ করে
আপন আকাশ সীমা সব পাপ পোড়াবার
অপার পাবক হয়ে উঠো রূপাকৃতি।
কয়েকটি জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন হয়ে গেছো আজ,
সংগ্রামের খর প্রাণকণা অনশ্বর বীরাঙ্গনা।

– বীরাঙ্গনা, হাসান হাফিজুর রহমান

আট

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই কাব্যে মধুসূদন প্রেমময়ী নায়িকাদের – ওভিদ যাদের বলেছেন heroines বা heroides বীরাঙ্গনা বলে অভিহিত করেছেন।

অথচ উপরে উদ্ধৃত কবিতায় বীরাঙ্গনা শব্দের মানে কত বদলে গেছে। যারা Semantics এর ছাত্র তাঁরা জানেন, কাল থেকে কালে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শব্দের বাচ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থ কত পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই মধুসূদনের বীরাঙ্গনা এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র।

যে প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, একালে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রেক্ষিত বলে নতুন ধরনের সাহিত্য রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। মধুসূদন জাতীয় উদ্দীপনামূলক একটি মহাকাব্য লিখতে চান এবং এ বিষয়ে তাঁকে প্রেরণা যোগান বন্ধু রাজনারায়ন বসু। তিনি লিখতে বসেন পুরাকালের বিজয় সিংহ কর্তৃক সিংহল বিজয়ের কাহিনী নিয়ে।

একালের বাংলাদেশের কবি লিখবেন সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বিজয় কাব্য। কেননা আমরা তো বিজেতা তা মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের একটি অন্যতম শাক্তিশালী কাহিনী পর্যুদস্ত করে স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে এনেছি। সেই বিজয়ের গৌরব গাথা নিয়ে আগামী দিনের মহাকবি নতুন এক মহাকাব্য রচনা করবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

অলি আহাদ ঃ *ভারতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫–৭৫

আবদুল করিমঃ *বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল*

আব্দুল জলিলঃ *পাঁচ হাজার বছরের বাঙালী ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ*

আহমদ শরীফঃ *বাঙলা ও বাঙালী*

উপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ *বাংলার সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ*

কো আন্তে নেভী থ্রিবোন গার্ড লেভিন, থ্রি কতোভস্কিঃ *ভারতবর্ষের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*

তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াঃ *পাকিস্তানের রাজনীতির বিশ বছর*

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ *বৃহৎবঙ্গ* (১ম ও ২য় খণ্ড)

নীহাররঞ্জন রায় ঃ *বাঙালীর ইতিহাস*

পূর্ণেন্দুনাথ ঃ *বাংলা ভাষায় আইন চর্চার ধারা*

বদরুদ্দীন ওমর ঃ *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম ও ২য় খণ্ড)

মুক্তধারা (সম্পাদিত) ঃ *রক্তাক্ত বাংলা*

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (১ম ও ২য় খণ্ড)

মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*

মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*

মোবাশ্বের আলী ঃ *মধুসূদন ও নবজাগ্রতি* (৪র্থ সং)

মোবাশ্বের আলী ঃ *বাংলাদেশের সন্ধানে* (২য় সং)
রমেশচন্দ্র মজুমদারঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
সুকুমার সেনঃ *প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী*
সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল*
সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ *প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*
শামসুল হুদা চৌধুরী ঃ *একাত্তরের রণাঙ্গন* (২য় সং)
হুমায়ুন কবির ঃ *বাংলার কাব্য*
Ahmed Kamaruddin : *A Social History of Bengal*
Ahmed Abul Mansoor: *End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution*
Amit Sen : *Bengal Renaissance*
Azad, A. K. : *India Wins Fredom*
Chandra A. N.: *The Sannayasi repellin*
Chndhry, A. M. : *Dynaslic History of Bengal*
Datta V. H: *Fort William- India House Correspondence*
Das Gupta, T. C. : *Aspects of Bengal Society from old Bengali hiteratance*
Dow, Alexander: *The History of Hindustan (3 Vols.)*
Fletcher, J. B. : *Literature of Italian Renaissance*
Gilbert Murray: *A History of Ancient Great Literature*
Ghosh, S. M. : *Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*
Hashim Abul : *In Retrospechor*
Mareus, S. D. : *A History of Latin Literatrure*
Nirad C. Choudhury: *Thy Hand, Great Anarch*
Rahim, A: *Social and Cultural History of Bengal (I & II Vol)*
Sastri, Haraprasad: *Discovery of Living Buddhism in Bengal*
Sarkar, Sunit: *The Swadeshi Movement in Bengal*
Sen, B. C.: *Some Asperts of History of Bengal*
Tarafdar, M. R. : *Hussain Shahi Bengal*
Wilson, C. R. : *Old Fort William in Bengal (Vol I & II)*

বাঙালি মুসলমানের বিবর্তনশীল মাতৃভাষা-চেতনাঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অতীত প্রেক্ষাপট

মোঃ আবুল কাসেম

বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা–চেতনা পর্যালোচনা করতে গেলে বাংলাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্মেষ ও মুসলিম সমাজের বিকাশ ধারা সংক্ষেপে আলোচিত হওয়া দরকার। বখতিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতকের সূচনা লগ্নে তাঁর সেনাবাহিনীর সদস্য কয়েক হাজার বহিরাগত মুসলিম দিয়ে এদেশে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তারও আগে থেকেই অবশ্য শুরু হয়েছিল পীর ওলী, দরবেশদের ধর্মান্তরকরণ তৎপরতা।[১] কিন্তু মসজিদ, মক্তব, খানকা ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে এমন একটি ইসলামী পরিবেশ তিনি গড়ে তুললেন, যার প্রভাবে বিভিন্ন উপায়ে এদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী দ্রুত বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। শ'দেড়েক বৎসরের মধ্যে সুলতানী আমলে প্রাথমিক পর্যায় নাগাদ বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়।[২] পন্ডিতদের অভিমত, এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গড়ে উঠেছে এদেশীয় বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠী থেকে।[৩]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশধারায় সুলতানী আমলের (১৩৫০–১৫৭৫) একটি গৌরবজনক ভূমিকা স্বীকার করা হয়। এ আমলের স্বাধীনতাকামী মুসলিম সুলতানরা দিল্লীর সুলতানদের পরাক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার অন্যতম উপায় হিসেবে এদেশের আপামর জনসাধারণকে নিজেদের পাশে রাখতে চেয়েছিলেন। এই কারণে মুসলিম সুলতানরা এদেশীয় হিন্দু অমাত্যদের উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করতেন।[৪] সম্ভবতঃ একই কারণে এরা এঁদেশীয় আপামর জনসাধারণের ভাষা ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষকতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।[৫] বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মুসলিম সুলতানদের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, এঁরা এদেশীয় হিন্দু কবিদের সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় ধর্মসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের প্রভাবে হিন্দু কবিদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্য রচনার জোয়ার এসেছিল।

বাংলা সাহিত্যচর্চার এ নতুন প্রাণোন্মাদনায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম কবিরাও সাড়া দিয়েছিলেন। এঁদের হাতেও সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শাস্ত্রকথা, সৃষ্টি তত্ত্ব, মুসলিম কাহিনী প্রেমোপাখ্যান, পদাবলী সাহিত্য ইত্যাদি বহু প্রকারের সাহিত্যকর্ম। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রচনার প্রথম ধারাবাহিক

আলোচনা ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭) গ্রন্থে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেকার প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলিম কবির ১২৫টি কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সংখ্যাকে খুব কম বলা চলে না। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ সহজ বিচরণ লক্ষ্য করে আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি বাংলাভাষা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সে সময়কার বাঙালি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি ইতিবাচক ছিল।

এছাড়া মুসলিম কবিদের রচিত বিপুল রচনা সম্ভারে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু উক্তির সন্ধান মেলে। এ সমস্ত উক্তি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ বাংলা ভাষাকে আরবী ফারসী ভাষার বিপরীতে 'হিন্দুয়ানী ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন।[৬] ইসলামী শাস্ত্রকথা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা কিংবা প্রচার করাও কারো কারো কাছে পাপকার্য বলে মনে হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সহজ মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার অপরিহার্যতার কথা ভেবে বাংলাকে যথার্থ গুরুত্ব দিতে তারা ভুল করেননি।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসার অনুভূতি ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত কয়েকটি ধ্রুপদ চরণেঃ

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন
(সৈয়দ সুলতান, ১৫৮৬)

যে সব বঙ্গেত জমি হিংসে বঙ্গবাণী,
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়
(আবদুল হাকিম, ১৭ শতক)[৭]

মুঘল আমলে (১৫৭৬–১৭৫৭) বাংলা ভাষা সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সুলতানী আমলের মতন ছিল না। এ সময় রাজকার্যে ফারসী ভাষার প্রভাব অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। দিল্লীর মুঘল সরকারের যে সমস্ত রাজ প্রতিনিধি সাময়িক প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে এদেশে আসতেন, এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কোন দায়িত্ব কিংবা অনুরাগ তাঁরা অনুভব করতেন না।[৭] এই পরিবেশে এদেশীয় অভিজাত মুসলিম উচ্চবিলাষীদের কাছে ফারসী ভাষাজ্ঞান হয়ে উঠেছিল সকল পুঁজির সেরা পুঁজি। তাছাড়া দীর্ঘ কালের মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকার্য এবং আইন আদালতের ভাষা হিসেবে ফারসী ভাষার বিকল্প তখন পর্যন্ত ছিল না। তাই ব্রিটিশ আমলেও ১৮৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত অফিস আদালতের বিকল্প তখন পর্যন্ত ছিল না। তাই ব্রিটিশ আমলেও ১৮৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত অফিস আদালতের ভাষা ছিল ফারসী ভাষাই। ফারসী ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলের সরকারী চাকুরীতে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন মুসলিম অভিজাতরা।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুসলিম আধিপত্য খর্ব হবার পর এদেশের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিরাট রকমের বিপর্যয় ঘটে। মুসলিম শাসনের অবসানে মুসলিম অভিজাতরা তাদের বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা তো হারালোই উপরন্তু কোম্পানী সরকারের কতিপয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাদের উপর কার্যকর হল বিরূপভাবে।[৯] এই অর্থনৈতিক দারিদ্র তাদের সর্বাঙ্গীন সামাজিক অধঃপতনের কারণ হল।। তাদের সকল উত্থান প্রচেষ্টা ব্রিটিশ শাসক এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘাতের জন্ম দিয়ে জাতীয় জীবনে তাদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিল।[১০] অপর পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় নতুন পরিস্থিতিকে চমৎকার ভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগালেন। মুসলিম আমলের শেষ দিকে রাজস্ব বিভাগের চাকুরীসমূহে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের মালিক হয়েছিলেন তাঁরা।[১১] ব্রিটিশ আমলে তাদের সে আর্থিক সচ্ছলতা শুধু বজায়ই রইলো না, তা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে উঠল।[১২] ইংরেজী রাজভাষা ঘোষিত হবার আগে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করে নিলো।[১৩] ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মানবতা ও যুক্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে তাদের একটা সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হল। তার প্রভাবে তাঁদের চিন্তাচেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল। ব্রিটিশ আমলে উদ্ভূত হিন্দু মুসলমান এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা-চেতনাকেও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্গদেশে হিন্দু সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের যুগ। এই সময় নব জাগ্রত দেশপ্রেম ও জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের প্রেরণায় দেশীয় ঐতিহ্য ও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। বিশেষ করে বাংলাভাষা এই সময়ে অসংখ্য প্রতিভাবান মনীষীর বহুমুখী উন্নত ও আধুনিক চিন্তাধারার বাহন হয়ে ওঠে। কি সাহিত্য সম্ভারে, কি আঙ্গিকে তাদের হাতে বাংলা ভাষা হয়ে উঠে অভিনব। প্রাচুর্যে ও গভীরতায় বাংলাভাষা তাঁদের হাতে অসামান্য সমৃদ্ধি অর্জন করে। পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতে এই সময় বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের একক আধিপত্য কায়েম হয়। এই সময়কার সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের চেহারায় সমসাময়িক হিন্দু মানসের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে। শব্দবন্ধ, বাগধারা, উপমারূপক ইত্যাদিতে সর্বত্র হিন্দু পুরাণ থেকে আহৃত ভাবের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্নার্থক হয়ে ওঠে।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থবিরতা ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করে। এই সময় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। তাদের মধ্যেও বিকাশ লাভ করতে থাকে নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী।[১৪] মধ্যশ্রেণীর স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাদের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ, অবস্থাসচেতনতা ও অধিকার সচেতনতা জাগ্রত হলেও[১৫] দূর্ভাগ্যবশত মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাদের তেমন শ্রদ্ধাবোধ দেখা গেল না। তৎকালীন

মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পাঠক্রমে বাংলাভাষার গুরুত্বহীনতাই সম্ভবতঃ এর জন্য সব চাইতে বেশী দায়ী।[১৬] ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের সুবাদে এরা ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চ পদে চাকুরী লাভ করতেন।[১৭] এরা বাংলাকে হিন্দুর ভাষা মনে করতেন।[১৮] এঁদের মননশীলতার বাহন হয়েছিল ইংরেজী ও ফারসী ভাষা।[১৯] আবদুল লতিফ (১৮২২ – ১৮৯৬), দেলওয়ার হোসাইন আহমদ মীর্জা (১৮৪০ – ১৯১২), আবদুল ওয়ালি (১৮৫৫ – ১৯২৬), সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮ – ১৯২৩), আবদুল জব্বার (১৮৩৭ – ১৯১৮), সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২ – ১৯২২), আবদুর রসুল (১৮৭০ – ১৯১৭) প্রমুখ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। আর এক শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান বাংলা পত্র–পত্রিকা সম্পাদনায় ও সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। এঁরা ছিলেন সাধারণ মক্তব–মাদ্রাসা পাশ ও মুন্সি শ্রেণীর।[২০] লোক ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনই ছিল এঁদের বাংলা ভাষা চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য।[২১] তাই এঁদের রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ইসলামী শাস্ত্র কথা, নীতিকথা এবং সমাজ চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে।[২২] বাংলা ভাষার লেখক হয়েও এঁরা কি করে বাংলাভাষাকে হিন্দু ভাষা বলেন, মুসলমানদের জাতীয় ভাষা বাংলা হতে পারে না–এমন মত প্রকাশ করেন তার জবাব এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।[২৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের মাতৃভাষা–চেতনার ধারাবাহিকতায় সবচাইতে আলোড়নমুখর সময়। এই সময় একশ্রেণীর মুসলিম মধ্যবিত্তের চেতনায় বাংলা ভাষার সাথে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতাবোধের অবসান ঘটে। আবার অন্য একটি শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত হয় উর্দু ভাষা– প্রীতি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা পরিবর্তনে দু'জন বাঙালি মনীষীর গবেষণাকর্ম ও চিন্তাধারার বিশেষ অবদান আছে বলে মনে হয়। এদের একজন বিশিষ্ট মুসলিম পুঁথি–সংগ্রাহক মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, অপরজন প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১২৯৭ সাল থেকে ১৩১২ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তার আবিষ্কৃত হাজার খানেক কলমী পুঁথির বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই তালিকায় বহু মুসলিম কবির পুঁথিও অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাহিত্য–বিশারদের প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ডঃ দীনেশ সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৮৯৬) গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সুলতানী আমলের মুসলিম শাসকদের অনন্যসাধারণ অবদান রয়েছে।[২৪] পরবর্তীকালে প্রকাশিত দীনেশ সেনের অপর একটি গ্রন্থে লোক সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেন–

এখানে মুসলমান দীনবেশে বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষুদ্র কোণে জায়গা পাইলেই কৃতার্থ হইবেন না, এখানে তাহারা সিংহবিক্রমে সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছেন।[২৫]

এই সময়ে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত জানতে পারে বাঙলা ভাষার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। এই সময়েই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫ – ১৯৬৯), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০ – ১৯৫৩) প্রমুখ শিক্ষিত তরুণরা সক্রিয়ভাবে বাংলা ভাষা

ও সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন। ১৯১১ সালে গঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির ন্যায় নিখিল বঙ্গ ভিত্তিক মুসলিম সাহিত্য সংগঠন। বিগত শতকের আশির দশকে উত্তর ভারতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী বনাম আরবী অক্ষরে উর্দূর দ্বন্দ্ব এবং প্রথমোক্তটির পক্ষে হিন্দু নেতাদের বাড়াবাড়ি স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক দর্শন পাল্টে দিয়েছিল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার ঢেউ বাংলাদেশে পৌঁছোয়নি। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা বাংলাদেশে তাকে আরও জোরদার করে। এই সময় স্বায়ত্তশাসিত ভারতের জাতীয় ভাষা তথা ভারতের 'লিঙ্গুয়াফ্রাংকা' কি হবে, সে বিষয়ে বাঙালি মুসলিম নেতারা সক্রিয়ভাবে ভাবতে শুরু করেন। রাজনীতিভাবাপন্ন মুসলিম নেতারা ধর্মের দাবী জোরদার করার জন্য বাংলাদেশে উর্দুকে জনপ্রিয় করার প্রচারণা শুরু করেন। রাজনীতিমনা সাহিত্যিকরাও এই প্রচারণায় শরীক হন।[২৬] এদের সাথে যুক্ত ছিলেন উর্দুভাষী এবং এক শ্রেণীর আভিজাত্য-প্রয়াসী উচ্চাভিলাসী বাঙালি। বাংলার মাটিতে উর্দু-বাংলা বিতর্কের এইটিই সবচাইতে জোরালো কারণ। উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষে বাঙালি মুসলমানদের বক্তব্যে বহুমুখী টানাপোড়েন ও মানসিক জটিলতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল।[২৭]

এই সময় মুসলিম ভাব প্রকাশের উপযোগী আরবী ফারসী শব্দ মিশ্রিত স্বতন্ত্র ধরনের বাংলা ভাষা সৃষ্টির আন্দোলন জোরদার হয়। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এই সময়কার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন একদিকে যেমন আধুনিক বাংলাভাষার সাথে মুসলিম মধ্যবিত্তের একাত্মতাবোধের পূর্ণতা ঘটায়, অন্যদিকে তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের সফল প্রয়োগ উপরোক্ত স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলিম লেখকদের মনে আত্মবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করে।[২৮] *শিখা*-গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখককে বাদ দিলে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই এই স্বতন্ত্র ভাষারই চর্চা করতে থাকেন। এই ধারার সবচাইতে সফলকাম কবি ফকরুখ আহমদের আবির্ভাব ঘটে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাক্কালে।

চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন চলা কালে ভাষার প্রশ্নে মুসলমানদের ভাষা-চেতনায় নুতন করে জটিলতা দেখা দেয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক আন্দোলনের প্রভাবে এই সময় নতুনভাবে উর্দুপ্রীতি দেখা দেয়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধ "পূর্ব পাকিস্তানের জবান" এ প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির[২৯] একাধিক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে না উর্দু হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় যদিও অধিক সংখ্যক সদস্য উর্দুর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু উর্দুর পক্ষে যাঁরা বলেছেন তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত উড়িয়ে দেবার মত ছিল না।[৩০] লক্ষ্য রাখতে হবে পাকিস্তানের সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার এক রাষ্ট্রভুক্ত হবার কথা তখনো আসেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে বাদ দিলে মুসলিম লীগ নেতারা বাংলার পক্ষে

কেউই খুব একটা উচ্চবাচ্য করেননি।৩১ গোলাম মোস্তফা, মুজিবুর রহমান খাঁ, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ রাজনীতিমনা কয়েকজনকে বাদ দিলে সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই বাংলা ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। লিপি পরিবর্তনের প্রশ্নে যাঁরা বাংলা লিপি অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে ছিলেন, তাঁদের অনেকে আবার বাংলালিপির সংস্কার চেয়েছিলেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এঁদের মধ্যে অন্যতম।৩২ আর পাকিস্তানী ভাবধারার উপযোগী স্বতন্ত্র বাংলাভাষা সৃষ্টির প্রশ্নটি এ সময়কার মুসলিম চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল, বলা চলে। দেশের তিন শতাধিক প্রতিনিধিত্বশীল আগ্রহী বুদ্ধিজীবীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পূর্ব বঙ্গ ভাষা কমিটি ১৯৪৮ যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে প্রস্তাব ছিল, বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ কমাতে হবে, তদস্থলে আরবী ফারসী ও লোকজ শব্দের অধিক ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সে বাংলা ভাষা হবে 'শহজ বাংলা' এবং তা হবে 'বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের প্রতিভা ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ'।৩৩

১৯৫২ সালের সফল ভাষা আন্দোলনে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের ভাষা সম্পর্কিত সকল মতভেদের ও জল্পনা কল্পনার অবসান হয়। বাঙালি মুসলিম মানসে বাংলা ভাষা মাতৃভাষার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নিয়ে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলাভাষার সাথে রক্তের বিনিময়ে বাঙালি মুসলমানের যে সম্পর্ক নির্মিত হয় তা নতুন জাতীয় চেতনার উজ্জীবন ঘটায় এবং পরবর্তীকালের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা তথা স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী করে।

তথ্য নির্দেশ

১। আবদুল করিম "বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ" *সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষা, ১৩৭০, পৃঃ ২৭-৮০।

২। আবদুল করিম "ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজবিস্তার," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১), পৃঃ ২ -৩।

৩। *Report on the census of India* 1901, vol, VI, Part I p p. 165-81.

কাজী আবদুল ওদুদ *শাশ্বতবঙ্গ* (ঢাকাঃ ব্র্যাক, ১৯৮৩), পৃঃ ১৭০-১৭৩।

৪। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃঃ ৪০৪।

৫। আহমদ শরীফ, *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), পৃঃ ৩০৬।

৬। *ঐ*, পৃঃ ৩০৯-৩১১।

৭। *ঐ*, পৃঃ ৩১১-৩১২।

৮। Rev. J. Long *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar* (Calcutta: Home Secretariate Press, 1968), Pp. 155, 156.

৯। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উভয় সম্প্রদায় সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নগদ অর্থের অভাবে জমিদারী ক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেনি।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৩), পৃঃ ৮০, ৮১।
লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী ছিল, দলিল সংরক্ষিত না থাকায় মুসলমানদের বহু লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।
উইলিয়াম হান্টার, *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস,* আবদুল মওদুদ অনূদিত (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃঃ ১৮১।

১০। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে তিনটি পৃথক পৃথক ধর্মসংস্কারান্দোলন (ফরিদপুরের শরীয়তুল্লাহর 'ফরায়েযী আন্দোলন', উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের 'তরীকায়ে মুহম্মদীয়া' এবং চব্বিশ পরগনার তিতুমীরের আন্দোলন) দেখা দেয়, সেগুলো লক্ষ্য ছিল মৌলিক ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার। রাইয়ত বিদ্রোহ সন্দেহে হিন্দু জমিদারদের যোগসাজশে ব্রিটিশ সরকার এ সকল আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করে। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতাঃ ডি. এন. বি. এ. ব্রাদার্স, ১৯৭২), পৃঃ ২২১।
বিহারীলাল সরকার, *তীতুমীর,* স্বপন বসু সম্পাদিত (কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮১), পৃঃ ৩৬, ৩৭।

১১। মোগল আমলের শেষের দিকে রাজস্ব বিভাগে হিন্দুরা একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুর্শিদকূলী খাঁ (১৭০৫ -১৭২৭) এবং নবাব আলীবর্দির (১৭৪০-১৭৫৬) আমলে রাজস্ব বিভাগে একমাত্র হিন্দুদেরকেই নিয়োগ করা হত। আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৫, ১৬।

১২। মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭ -১৯৪৭) (ঢাকা ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬), পৃঃ ৫১।

১৩। Fazlur Rahaman, *Bengali Muslims and English Education,* 1765-1835, (Dacca: Bengali Academy, 1973), P. 37, 488.

১৪। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা,* প্রথম খণ্ড (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃঃ ৪৭-৮৬।

১৫। Mahmud Shah Qureshi, "Seizure of Consciousness and Position: Role of Muslims in Bengal Renaissance". *Culture and Development* (Dhaka: Syeda Quamar Jabeen, 1982) Pp. 1-3.

১৬। Enamul Hoque, ed. *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents* (Dacca: Samudra Prakashani, 1968), p. 28.

১৭। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১০২-১৩৩।

১৮। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী-প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ আমীর আলী শিক্ষা কমিশনকে জানিয়েছিলেন- Urdu should be to Mahomedans, what Bengali is to the Hindus of Bengal.
Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity* (Delhi: Oxford University Press, 1981), p. 125.

১৯। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত।*

২০। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃঃ ১২।

২১। ঐ, পৃঃ ৫

২২। উনিশ শতকের মুসলিম পত্রিকা সম্পাদকগণের নিকট সাহিত্য ছিল অধঃপতিত মুসলিম সমাজের কল্যাণসাধনের অন্যতম মাধ্যম। *'আল এসলাম'* পত্রিকা গল্প, উপন্যাস, প্রেমমূলক কবিতা ইত্যাদি না ছাপিয়ে কেন শুধু প্রবন্ধাদি ছাপে, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে লিখেছিল-

'রোগী রুচিকর ঔষধ চাহিলেও চিকিৎসকের পক্ষে উপকারী তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থাদি না করিয়া উপায় নাই।' *আল এসলাম*, শ্রাবণ, ১৩২৩, সম্পাদকের টীকা।

উদ্বৃত আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র* (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃঃ ১৫৩।

২৩। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩১৩–৩২৮।
ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত* (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ১৪২।

২৪। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মধ্যযুগের মুসলিম কবি রচিত বহু পুঁথি আবিষ্কার এবং সমকালীন মুসলিম মনে তার প্রভাব সম্পর্কে ডঃ আহমদ শরীফের উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন–
এই ঋষিকল্প যোগী সাধকের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে দেশবাসী জানতে পারল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানগণ ভুঁইফোঁড় নয়।
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী, সম্পাঃ *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃঃ ৯২।

২৫। উদ্বৃত কাজী মোতাহার হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃঃ ৪২।

২৬। এসলামাবাদী 'বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দু সমস্যা', *আল এসলাম* (আশ্বিন ১৩২৪), পৃঃ ৩৩৩।

২৭। Rafiuddin, op. cit. Pp. 124, 125.
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩১৩–৩২৭

২৮। মোঃ আবুল কাসেম, *বাঙালী মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনাঃ বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তার প্রতিফলন (১৯৪২–১৯৭২)*, অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি অভিসন্দর্ভ (আই, বি, এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃঃ ৩৩–৩৮।

২৯। এই সংগঠনের জন্ম ১৯৪২ সালে কলিকাতার *দৈনিক আজাদ* অফিসে। তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতার মার্ক্সবাদী কিছু হিন্দু সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মোঃ আবুল কাশেম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪–৮৬।

৩০। *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৫০।

৩১। মোঃ আবুল কাসেম, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৩।

৩২। ঐ, পৃ, ১৯৪, ২০৬।

৩৩। Government of East Pakistan, Education Department, *Report of the East Bengal Language Committee*, 1949 (Dacca: Officer on Special Duty, East Pakistan Government Press, 1958) P. 102-104.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কারঃ ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

শর্মিষ্ঠা রায়

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে মানব দরদী বিদ্যাসাগরের প্রতিভা, ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি ঝোঁক এবং কর্মজীবনে সেগুলোর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা লাভ তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের একাধিক দিক রয়েছে। স্বল্প পরিসরে তাঁর বহুমুখী সংস্কারমূলক তৎপরতা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে–স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে নারী মুক্তি। এই দু'টি মুখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি যে সব পদক্ষেপ ও সংগঠনমূলক কৌশল গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন ঘাত–প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন তা কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে আমাদের নারী সমাজের বর্তমান অবক্ষীয়মান আর্থ–সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতার তাৎপর্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় মানবহিতৈষী, নির্ভীক, আপন মনোবলে অটুট এবং স্বাধীনচেতা যে মহামানবের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অবিভক্ত বাংলায় তিনি ছিলেন বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। তিনি একাধারে দয়ার সাগর, জ্ঞানের সাগর, হাস্যরসিক, খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, বলিষ্ঠ চেতনার অগ্রদূত হিসেবে আজও বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও স্বীয় প্রতিভা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি পৃথিবীর বরেণ্য ব্যক্তিদের মাঝে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এই প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মূল দু'টি বিষয় আলেচিত হয়েছে–নারীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহ প্রচলন। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্বে তাঁর প্রতিভা ও কর্মজীবন সম্পর্কে দু'একটি কথা উল্লেখ করছি।

বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও কর্মজীবন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মাত্র তিন বছরে তিনি পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করেন। পাঠশালায় শিক্ষাগুরু কালীকান্ত বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিমত্তা ও

ধী-শক্তি দেখে প্রায়ই বলতেন, 'এ বালক ভবিষ্যতে বড় লোক হবে'। পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করে মাত্র ন' বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তিনি অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা অল্প বয়সী ছিলেন। ব্যাকরণ বিদ্যায় তাঁর অস্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি ছিল। দ্বাদশ বর্ষে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাব্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তাঁর অদ্ভুত ধী-শক্তির পরিচয় পেয়ে অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হতেন। সংস্কৃত অনুবাদেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং অশ্রুতপূর্ব বাক্য বিন্যাস ক্ষমতা দেখে মোহিত হয়ে বলতেন, "এ বালক পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে"।[১] অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়ের সাথে তিনি সংস্কৃত কলেজে বার বছর বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কৃতিত্বের সাথে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে শিক্ষকমন্ডলী তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত হন।

ছাত্র জীবনের সফল সমাপ্তির পর ১৮৪১ সালে তিনি লাল দিঘির ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিত) পদে নিযুক্ত হলেন।[২] ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় চার বছর চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একটানা সেরেস্তাদারি করেন। তারপর প্রায় এক বছর তিন মাস (৬ই এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে ১৬ই জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত) সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার প্রায় এক বছর আট মাস (১লা মার্চ ১৮৪৯ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৫০ পর্যন্ত) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, একবার সংস্কৃত কলেজ, এইভাবে তাঁর প্রথম কর্মজীবন প্রধানত চাকুরীর টানাটানিতেই কেটে যায়। অবশেষে ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তার এক মাস কয়েকদিন পরেই (১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী) কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। এই সময় থেকেই তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নের শুরু। মধ্যের একুশ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত দশটি মূল্যবান বছর তিনি যে কেবল সরকারী চাকুরী করে অপচয় করেছেন তা নয়। বাইরের বৃহত্তর সমাজের পাঠশালায় তিনি তাঁর কর্মজীবনের শিক্ষানবীশি করেছেন।[৩]

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁর রচিত সাহিত্য তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। প্রথমে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পুরণের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। তাঁর লেখনী 'বর্ণ পরিচয়' থেকে যাত্রা শুরু করে, 'সীতার বনবাসে' গিয়ে উপনীত হয়। সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকের অভাব লক্ষ্য করেও তিনি সংস্কৃত উপক্রমনিকা এবং সংস্কৃত গ্রন্থের বিবিধ সংকলন করেন। শুধু তাই নয়, মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সূত্রপাত ও শব্দ সংগ্রহের চেষ্টার মূলেও রয়েছে তাঁর কার্যসম্পাদনী বুদ্ধি।[৪]

১৮৫৯ সালে তিনি চাকরী ছেড়ে দেন এবং মেট্রোপলিটান স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭২ সালে সেখানে একটি কলেজ বিভাগ খোলেন। ১৮৭৯ সালে তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে অধিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে এটিই 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত।

সমাজ সংস্কারমূলক তৎপরতা

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার ও সমাজ পূণর্গঠনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূলতঃ সমাজ বিপ্লবীর। টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় লালিত হয়েও বিদ্যাসগর শীর্ষস্থানীয় সমাজ সংস্কারক হিসেবে এদেশে পরিচিত হয়েছেন।[৫] তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। জগতকে মিথ্যা মনে করে, জগতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, জাগতিক কর্মকাণ্ডকে অকিঞ্চিৎকর ভেবে বাঙালী কখনও অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অচলায়তন ভেদ করে উন্নত জাতি হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবেনা- এ ছিল বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের জোরেই তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারা বেদান্তকে আঘাত করতে পিছ-পা হননি। তাঁর কাছে মানুষের জীবনই বড় এবং এ জীবনই সত্য, পরকালের অলীক মায়া নয়। এই জীবনবাদী চেতনাই তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করেছিল।[৬]

তিনি জাত-পাত সংস্কার মানতেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। তাই বলে তিনি কখনোই নাস্তিক ছিলেন না। সেকালের মনীষীগণের মতে তিনি ধর্ম সচেতন ছিলেন না। হর প্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বাল্যকালের একটি স্মৃতির বিবরণ দেন-

> একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়ে মহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে। ওমা এমনতো কখনো শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মাথাটা কেড়ে খেয়েছে। কেউ বলিল ঘোর কলি, কেউ বলিল সব একাকার হয়ে যাবে, কেউ বলিল জাত-জন্ম আর থাকবেনা। আমি মাকে জিজ্ঞেস করিলাম কে কেড়ে খেয়েছে? মা বললেন, জানিসনি . . . ? বিদ্যাসাগর।

এই হলো বিদ্যাসাগরের আসল চেহারা।[৭] তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে আলোকবর্তিকা হাতে এসে দাঁড়ান। সমাজে তাদের স্থান করে দেবার জন্য তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর সংস্কারমূলক তৎপরতার প্রধান দুটি দিক 'শিক্ষার মাধ্যমে নারী মুক্তি' ও 'বিধবা বিবাহ প্রচলন' সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

শিক্ষার মাধ্যমে নারীমুক্তি

এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান অতুলনীয়। তিনি বুঝেছিলেন, পরিবারের প্রাণ হচ্ছে নারী। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত সত্যাশ্রয়ী মাতাই সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে জেনেই শিক্ষা বিস্তারের কাজে তিনি নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেন।[৮] পরিবারই হলো একটি আদর্শ বিদ্যালয়। স্বাস্থ্য-পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষার উপায় ইত্যাদি

বিষয়ের শিক্ষা প্রধানত পরিবারেই সর্বপ্রথম দেওয়া হয়। আর সেই পরিবারের শিক্ষিকা হলেন মা। কাজেই মা যদি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হন তাহলে তিনি তার সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবেন। সর্বোপরি পুরুষ-শাসিত সমাজে শিক্ষিতা নারী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিদ্যাসাগর সে সময় নারী শিক্ষা প্রসারে অবতীর্ণ হন। সেই সময় মেয়েদের সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ছিল না। তারা ছিল অবহেলিত। বিদ্যাসাগর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই তিনি নারী-শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁর কার্যক্রমের দুটি স্তর লক্ষণীয়ঃ (ক) জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহকারী হিসাবে কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা ও (খ) গ্রামাঞ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার মাধ্যমে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের অক্লান্ত প্রয়াস।

ড্রিংকওয়াটার বেথুন এদেশে এসে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, নারী জাতিকে শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে এদেশবাসী কখনও কুসংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি পাবে না। তাই নারী শিক্ষা প্রচলনের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বেথুন নব্য বঙ্গের রাম গোপাল ঘোষ, জমিদার দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারের সহায়তায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে মাত্র ২১ জন বালিকা নিয়ে 'কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন।[৯] স্কুল প্রতিষ্ঠার পরেই বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার অবৈতনিক সম্পাদক রূপে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১০] সে সময় সমাজে নারী শিক্ষাকে ভাল চোখে দেখা হতো না। সর্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল নারীরা শিক্ষিত হলে বিধবা হবে, জাত থাকবে না ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর জানতেন শাস্ত্রের দোহাই না দিলে এদেশের জনগণকে কিছুই বোঝানো যাবে না। তাই বেথুন সাহেব যখন দূর থেকে ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করেছিলেন, সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর সেই গাড়ীর পাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" এই শাস্ত্র বচনটি খোদাই করে দেন। বাক্যটির অর্থ, পুত্রের মত কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে।[১১] কিন্তু মেয়েদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় হিন্দু নেতাদের নিকট থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। এ ব্যাপারে বেথুন সাহেব বড় লাট ডালহৌসীকে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে একখানি পত্র লিখেন। বেথুনের পত্রে সুফল ফলেছিল। বড়লাট ডালহৌসী ১লা এপ্রিল ১৮৫০ সালে বেথুনের বক্তব্য যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেন এবং নারী শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকারও করেন।[১২]

সারাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বা নারী শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ বিদ্যাসাগরের এত বেশী ছিল যে, এ ব্যাপারে সরকারের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতিকে তিনি কর্তৃপক্ষের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা বলে ভুল

করলেন। তাই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের 'এডুকেশন ডেসপ্যাচে' স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের আগ্রহকে সম্বল করে বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে নারী-শিক্ষা প্রসারের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই বর্ধমান জেলার জৌ-গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে ডি. পি. আই. কে জানালে তিনি বিদ্যালয়টির জন্য মাসিক ৩২ টাকা মঞ্জুর করেন। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি ও নদীয়া জেলায় ১টি, মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০ এবং এগুলো চালাতে মাসিক ধার্য হলো ৮৪৫.০০ টাকা।

সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে অনুমতি না নেওয়া ও সিপাহী বিদ্রোহজনিত অর্থাভাবের অজুহাতে সরকার বিদ্যালয়গুলোতে অর্থ মঞ্জুর করতে রাজী হলেন না।[১৩]

বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সমালোচনা করে বলেন যে স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের ব্যাপার হলে বিদ্যাসাগরের কোন জ্ঞানগম্যি থাকতোনা। বর্তমানটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠতো। ভবিষ্যৎ তিনি বিশেষ চিন্তা করতেন না। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সময়ও তিনি তাই করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন ছোট লাটের সমর্থনই যথেষ্ট। দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ যখন দেখা দিল তখন তিনি একেবারেই হতাশ না হলেও ব্যথিত হলেন। ১৮৫৮ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও নানা রকম দুর্ভাবনার মধ্যেও বিদ্যাসাগর তাঁর বালিকা বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হননি। স্কুলগুলো পরিচালনার জন্য তিনি একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে পাইক পাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চতম সরকারী কর্মচারী নিয়মিত চাঁদা দিতেন। ছোট লাট বিডন সাহেবও মাসিক ৫৫ টাকা সাহায্য করতেন। এইভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও বালিকা বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।[১৪]

১৮৬৫ সালে 'সোম প্রকাশ' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষা বা নারী শিক্ষার পাঁচটি অন্তরায় চিহ্নিত করা হয়। যেগুলো বিদ্যাসাগরকে নারী-শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ যুগিয়েছে বলা যায়। সেই পাঁচটি অন্তরায় নিম্নরূপঃ

১। এদেশের পুরুষরাই আজ পর্যন্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি। সুতরাং তারা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবে কি করে?

২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা বেশীদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না।

৩। অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না।

৪। ছেলেবেলায় স্কুলে যেটুকু লেখাপড়া শেখে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েরা তা ভুলে যায়। এদেশের জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণত উপযুক্ত পাত্রে মেয়েদের বিবাহ হয় না এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয় তা বৃথা হয়ে যায়।

৫। ইউরোপের মেয়েরা নিজেরা রান্না-বান্না করে না, হোটেলে খায়। সুতরাং তাদের লেখাপড়া করার অবসর আছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের যেহেতু গৃহকর্ম ও রান্না-বান্না করতে হয়, সেই কারণে তারা লেখাপড়ায় মন দেওয়ার সুযোগ পায় না।

'সোম প্রকাশের' এই পাঁচটি অন্তরায়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি প্রবল সামাজিক অন্তরায়। বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথা স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৫]

শুধু তাই নয় স্ত্রী শিক্ষা বা নারী শিক্ষার পক্ষে যাঁরা বড় বড় কথা বলতেন তাঁরা নিজেদের পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো দুরে থাক, গৃহে পর্যন্ত শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রধান অন্তরায় ছিল এদেশীয় শিক্ষিকার অভাব। মিস মেরী কার্পেন্টার এই অভাব দুর করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তিনি দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার জন্য বিদ্যাসাগরের সহায়তায় বঙ্গদেশে একটি স্ত্রী নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু যে সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া করাটাকেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হতো সেখানে ব্রাহ্মিকা মহিলা বা খ্রীষ্টান শিক্ষিকাদের নিকট মেয়ে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোর কথা সমাজপতিরা ভাবতেই পারতেন না। সমাজের সাধারণের ধারণা ছিল এদের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দিলে তারা জাত হারাবে। এই সমস্যা বাংলা সরকারের কাছে স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় পরিচালনার সময় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। 'স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়' স্থাপনে সরকারী সমর্থন পেলেও মিস ক্যার্পেন্টার জনগণের সহযোগিতা পাননি। অবশেষে 'নর্মাল স্কুল' উঠিয়ে দেওয়া হল।

কয়েক বছরের বাকযুদ্ধের অবসান হলো ১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাসে। বেথুন বিদ্যালয়ের কাজ আগের মতই চলতে থাকল ধীরে ধীরে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম যুবকরা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হলেন। এঁদের আন্দোলনের ফলে ১৮৭৮ সালে সর্ব প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হলঃ That the female candidates be admitted to the university examination subject to certain rules". স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির একটা বড় বাধা দূর হল। কুসংস্কারের তবে অন্তরায় দুর হতে আরো অনেকদিন সময় লেগেছিল।[১৬]

বিধবা বিবাহ প্রচলন

শুধু নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেই নয়, বিধবা বিবাহ প্রচলন ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রাচীন হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদা একেবারেই ভূ-লুণ্ঠিত ছিল। সতীদাহ প্রথা

উচ্ছেদের পর হিন্দু বিধবারা সহ মরণের হাত থেকে রেহাই পেলেও বৈধব্যের কঠোর জ্বালা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াটা পরম পুণ্য বলে বিবেচিত হতো। যার ফলে অল্প বয়সী মেয়েদের প্রায়শঃই অধিক বয়সী পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হতো। এই সমস্ত মেয়েরা বেশীর ভাগই যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে স্বামীকে হারিয়ে সারা জীবন বৈধ্যব্যের অভিশাপ বয়ে বেড়াত। অনেক বিধবাই আশ্রয় ও নিরাপত্তার অভাবে পরিবার ও সমাজের গলগ্রহ হয়ে উঠত, আবার অনেকেই জীবনের তাগিদে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতো।

বিধবা পত্নী কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করবে–এটাই ছিল সে সমাজের রীতি। বৈধব্যের যে কি জ্বালা তা সেকালের সমাজপতিরা অনুধাবন করতে না পারলেও বিদ্যাসাগরের প্রাণ তাদের জন্য কেঁদেছিল। তাদের কষ্ট তাঁকে আহত করেছিল। বিধবা বিবাহের প্রচলন কেন হলো সে সম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর স্বগ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয়কে যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত হলো–

'বীর সিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিলো। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসতেন। বালিকাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইলো? ইহাই তাহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার বাল্য সহচরী কিছু খায় নাই। সেদিন তাহার একাদশী, বিধবাকে খাইতে নাই। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব। যদি বাঁচি তবে যাহা হয়, একটা করিব।[১৭]

অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলেন যে এর একমাত্র উপায় হলো বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দান। এতেই তাদের মুক্তি। বিধবাদের বিয়ে হবে– সমাজ যেন তা অবলীলায় মেনে নিতে পারলো না। গোঁড়া হিন্দু সমাজ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরও হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। অদম্য সাহস বুকে বেঁধে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সেই সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল শাস্ত্র বচন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাই বিধবা বিবাহ প্রচলনের যথার্থতা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় নিলেন। তিনি জানতেন গোঁড়া হিন্দু সমাজ যুক্তি মানেনা, মানে শাস্ত্র। শাস্ত্রে আছে–

নষ্টে মৃতে প্রবজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যা বিধীয়তে।

অর্থাৎ পাঁচটি অবস্থায় হিন্দু নারীর পুনর্বিবাহ হতে পারে। এই পাঁচটি অবস্থা হলো–স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, যদি তার মৃত্যু হয়, যদি সে পরিব্রাজক হয়, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত বা নিখোঁজ হয় বা যদি সে ন–পুংসক হয় তখন স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ আইনগত।

বিধবা বিবাহের এটাই অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অবলম্বন করে তিনি লেখনী ধরলেন, ঘরে ঘরে আন্দোলন গড়ে তুললেন।[১৮] ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একখানি পুস্তিকা বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি পরাশরের স্মৃতি গ্রন্থের শ্লোক "(নষ্টে মৃত প্রবজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চ স্বাপৎস্ নারীনাং পরিরন্যো বিধীয়তে।") উদ্ধৃত করে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সংগত ও বৈধ প্রমাণ করেন। এটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে, বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, বিপক্ষেই জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। এর কয়েক মাস পরেই ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অধিকতর বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ করে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয়। যাঁরা বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সেই কারণে শত্রুতা করার জন্য তাঁকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন, তারাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন। তাদের অযৌক্তিক ও হীন আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেবার জন্য বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র সংহিতা স্মৃতি থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে অসাধারণ যুক্তিবুদ্ধির ব্যুহ রচনা করে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনে জড়িয়ে তিনি ঋণগ্রস্থ হয়েছেন, আত্মীয়দেরও স্নেহ ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, অনেক ধূর্ত ব্যক্তি তাঁকে প্রতারণা করে নিঃশেষ করেছে।[১৯] তাঁর আন্দোলনকে জাগিয়ে রাখার জন্য তিনি ছদ্মনামে পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে বৎসর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করেন সেই সময় হুগলী জেলার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে নিজ ব্যয়ে ১৫টি বিধবার বিবাহ দেন। অনেক পুনর্বিবাহিত বিধবাদের ভরণপোষণ এবং সংরক্ষণের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এর জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হন।[২০] সে সময় বিদ্যাসাগরের নাম হয়েছিল "বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর।"

শাস্ত্র, সামাজিক রীতি–নীতি, বিদ্যাসাগরের অনুকূলে কখনোই ছিল না। এগুলো লংঘন করা ছিল দুঃসাধ্য। তবুও এই সমস্ত রীতি–নীতি ভেঙ্গে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত জনমত গঠনে সক্ষম হন।[২১] বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে একাধিক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই আবেদনপত্রগুলি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল। অবশ্য রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদ পত্রও ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু আইন প্রণেতারা তা গ্রাহ্য করেননি। বিদ্যাসাগরের পক্ষে বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি–পণ্ডিত, বিচারপতি, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজপতি, ভূস্বামী সম্প্রদায় (বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজারা

বিদ্যাসাগরের বিশেষ সহায়ক ছিলেন) এই আবেদনপত্রে সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এটি ১৮৫৫ সালে ৪ঠা অক্টোবর ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়। গ্রান্ট সাহেব নিজে তৎপর হয়েছিলেন বলে বিরোধী পক্ষের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগরের পক্ষীয়দের অনুকূলে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই সভায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন ১৮৫৬ পাশ হয়।[২২] আইনের ধারা অনুযায়ী হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিজ পুত্রের সাথে বিধবার বিয়ে দিয়ে সমাজের জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

বিধবা বিবাহের যাবতীয় ঝুঁকি বিদ্যাসাগর একাকী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'বাবা করিবার পূর্বে ভাবা উচিৎ। ধরেছো ছেড়োনা, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও'। বিদ্যাসাগর তাই করেছিলেন। সর্বস্ব পণ করে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন। এই ব্যাপারে ৪০-৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি শেষ জীবনে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যতই বাধা পেয়েছিলেন ততই দৃঢ়তর বিক্রমে ছদ্মবেশী বন্ধু, প্রতিকূল শত্রু এবং মুঢ় দেশাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে প্রায় একাকী সংগ্রাম করে গেছেন।[২৩]

বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে সংস্কারমূলক কার্যক্রমের তাৎপর্য

একটি সমাজের যথার্থ ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তখনই যখন পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে সমানাধিকার প্রদান করা হয়, নারী সমাজকে অশিক্ষার অন্ধকারে ফেলে রেখে বা সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে আটক রেখে কখনই সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়- এ সত্য উনিশ শতকেই বিদ্যাসাগর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। পুরোহিত প্রাধান্য, কুসংস্কার শাসিত সমাজে ব্যক্তির অধিকার বিশেষ করে নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করে গেছেন। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের সময় তিনি দেখেছেন এবং প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, 'সংস্কার কুসংস্কার হলেও তা সংস্কার'। দু-চার পুরুষে বা দু-তিন শতাব্দীতেও কেবল বুদ্ধিগম্য একটা উন্নত আদর্শের জোরে তা উন্মূলন করা যায় না।[২৪] তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও তৎকালীন সমাজবোধ থেকে প্রাপ্ত বিদ্যাসাগরের বাস্তব ভবিষ্যৎবাণীর যথার্থতা আমরা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করতে পারছি। বিদ্যাসাগর সে যুগে সমাজ সংস্কারের দীপ্ত চেতনা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন তার থেকে সমাজ কিছুটা এগিয়ে গেলেও সত্যিই কি সেই সমাজ নারীর পুরোপুরি মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে? যদি তাই হতো তাহলে বাংলার মেয়েরা আজ এতখানি পিছিয়ে থাকতোনা। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করে গেলেন বটে কিন্তু আজ অবধি সমাজ কতটা বিধবা মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে তাদের স্বাদ-আহলাদ। কয়জন তরুণ এগিয়ে এসেছে বিধবার হাত ধরে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে? হাতে গোনা জনা-কয়েক

ছাড়া আজো আমাদের দেশে অসংখ্য বিধবা বৈধব্যের কঠোর জ্বালা নিয়ে কালাতিপাত করছে, তাদের অসহায়ত্ব বাধ্য করছে এক শ্রেণীর লোকের লালসার শিকার হতে। যারা বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বড় বড় বুলি আওড়ায় তারাই আবার লোক লজ্জার ভয়ে ব্যক্তিগত জীবনে বিধবাদের সেই হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পিছপা হয়।

শুধু বিধবা বিবাহ ক্ষেত্রেই নয়, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি প্রবল ছিল, কিছুটা শিথিল হলেও সেগুলোর অস্তিত্ব আজও আমাদের গ্রাম বাংলায় পরিলক্ষিত হয়। এদেশের মেয়েরা আজও রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে কিনা, অথবা কতটুকু পর্যন্ত শিখবে তা নির্ধারণের ভার অভিভাবকের উপর ন্যস্ত। পর্দা প্রথা, বাল্য বিবাহ এখনো মেয়েদের শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। তাইতো আমাদের দেশে মহিলার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্বেও শিক্ষা-দীক্ষায় তারা পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারেনি। এদেশে যেখানে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৩০.২ শতাংশ সেখানে নারী শিক্ষিতের হার মাত্র ১৯.২ শতাংশ (১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)২৫। এই রিপোর্টই প্রমাণ করে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে সমাজ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায় নারী মুক্তি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাদের মুক্তির পথ খুলে দিয়ে গেছেন।

বর্তমান অবস্থাই মনে করিয়ে দেয় নতুন করে নারী জাতির অবস্থার মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। তাদেরকে ন্যায্য অধিকার দিতে না পারলে জাতির উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। তাই সরকারের আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছাড়াও সর্বাগ্রে যে জিনিসটি প্রয়োজন তাহলো জনচেতনা। জনগণকে সংগঠিত করতে না পারলে, তাদের মধ্য থেকে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস দুর করতে না পারলে, সর্বোপরি পুরুষরা যদি প্রভুসুলভ মনোভাব পরিহার করতে না পারে তাহলে একা বিদ্যাসাগর যেমন পারেননি, তেমনি আর কারো পক্ষেই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়।

উপসংহার

'বীরসিংহের সিংহ পুরুষ বিদ্যাসাগর' এই একটি মাত্র চরণেই বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর সমাজ চেতনায় দীক্ষা লাভ করে আজ সমাজের প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিকে নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজ এই উপমহাদেশে তথা বাঙালী সমাজে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অহরহ নারী নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়। নারীর মুক্তি ছাড়া মানব জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কর্মের মধ্যে 'নারী শিক্ষা' ও 'বিধবা বিবাহ প্রচলন' সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুটি কার্যকরী উদাহরণ হিসাবে আজও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব এই আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করে নারী উন্নয়নের পথ উন্মোচন করা, যা দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা করবে।

পাদটীকা

১। বিহারী লাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশক, ১৯৯৫) পৃ. ৪০-৪৩।
২। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান, লিমিটেড, ১৯৭৩), পৃ. ১১০।
৩। *তদেব*, পৃ. ১১৮।
৪। প্রমথনাথ বিশী, *বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার* (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪), পৃ. ১১।
৫। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর*, (কলিকাতাঃ মন্ডল বুক হাউস, ১৯৭০), পৃ. ১৬৬।
৬। মকবুল আহমেদ, "মানব দরদী বিদ্যাসাগর," *শিক্ষাবার্তা*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯১, পৃ. ১১।
৭। বিশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।
৮। আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৯। খন্দকার সিরাজুল হক, "বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর", *পাণ্ডুলিপি*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, পৃ. ৮০-৮১।
১০। ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮।
১১। *তদেব*, পৃ. ২১৮।
১২। *তদেব*, পৃ. ২১৯।
১৩। হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫।
১৪। ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬।
১৫। *তদেব*, পৃ. ২২৮।
১৬। *তদেব*, পৃ. ২৩৬-৩৭।
১৭। সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।
১৮। *তদেব*, পৃ. ২২৩।
১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।
২০। সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।
২১। N. S. Bose *Indian Awakening and Bengal* (Calcutta: Firma KLM, 1976). P. 213.
২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।
২৩। দেব কুমার বসু, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, (কলিকাতাঃ মণ্ডল বুক হউস, ১৯৭০), পৃ. ৪৪-৪৫।
২৪। ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮।
২৫। BBS, *Bangladesh Educational Statistics*, 1991, (Dhaka, BBS, 1992) P. 185.

গ্রন্থ নির্দেশিকা

আহমেদ, মকবুল, ১৯৯১ ঃ "মানবদরদী বিদ্যাসাগর", *শিক্ষাবার্তা*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা,
ঘোষ, বিনয় ১৯৭৩ ঃ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড।
বসু, দেবকুমার ১৯৭০ঃ *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলিকাতাঃ মণ্ডল বুক হাউস।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, ১৯৭০ ঃ *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর*, কলিকাতাঃ মণ্ডল বুক হাউস।
বিশী, প্রমথ নাথ ১৯৬৪ঃ *বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার*, কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ।
হক, খন্দকার সিরাজুল, ১৯৭৩ঃ "বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর" *পাণ্ডুলিপি*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা সাহিত্য সমিতি চট্টগ্রাম।
সরকার, বিহারী লাল, ১৮৯৫ঃ বিদ্যাসাগর, কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশক।
BBS ১৯৯২ঃ *Bangladesh Educational Statistics 1991*, Dhaka, BBS
Bose, N. S. 1970 ঃ *Indian Awakening and Bengal*, Calcutta: Firma KLM Ltd.

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

চর্যাপদ থেকে বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর ধরলে তার ন'শো বছরই যে অতিবাহিত হয়েছে দেব-দেবীদের গুণ-কীর্তনে, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। মানব জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা, গভীর অনুভূতি অথবা নিগূঢ় ভাব -ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তিও কিছু কিছু রয়েছে এ সময়কার সাহিত্যে। এমন কি, মানুষ সেখানে একান্ত অসহায় ছিলো, তাও পুরোপুরি বলা যায় না। পুরুষের পৌরুষ, নারীর নারীত্ব সবই দৈবশক্তিতে আচ্ছন্ন ছিলো না। তাদের প্রবৃত্তির সৌন্দর্য এবং ব্যক্তি সত্তার সংগ্রামশীলতা সেখানে আকর্ষণীয় রূপ লাভ করেছে।

চর্যাপদে মানুষ আছে, সে-মানুষ যদিও প্রতীক আশ্রিত। চর্যাকারগণ তাঁদের বিভিন্ন পদে চোর, ডোম্বি, কাপালী, শবর, চন্ডাল, তাঁতী, ধুনুরী প্রভৃতি যে-সব মানুষের উল্লেখ করেছেন, আপাতঃদৃষ্টিতে তারা সাধারণ মানুষই, গৃহ্যার্থ যা'-ই থাক্।

এটা অত্যুক্তি হয়তো নয় যে, চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের মর্মালেখ্য। সে-সমাজ উচ্চবিত্তের নয়, মধ্যবিত্তের। সে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিলো শ্রমশীল। আজকের মতো সেদিনও তারা ছিলো শত দৈন্যের শিকার। তাঁত নির্মাণ, চাঙাড়ী বোনা, তুলা ধোনা, নৌকা বাওয়া ছিলো তাদের নিত্যদিনের পেশা। নগরবাসের সৌভাগ্য তাদের হয়নি। নগরের বাইরে ছিলো তাদের 'কুড়িআ'।[১] তাদের 'হাড়ীত ভাত নাহি' এবং তারা 'নিতি আবেশী'[২](উপবাসী)।

চর্যাপদে অন্ত্যজ শ্রেণীর শ্রমশীলতার এবং সংগ্রামময়তার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রতিকূল অবস্থায় পতিত জেলে, শবর, মাঝি, ধুনুরী, হরিণ ও হস্তী শিকারীদের যে গোষ্ঠীগত জীবন সংগ্রামের বিবরণ এখানে উপস্থিত, তা তার রূপক দেহ অতিক্রম করে রক্ত মাংসের মানুষেরই জীবিকার সাধারণ্যেকেই রূপায়িত করে।

চর্যার পরবর্তী আদি-মধ্যযুগের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, মধ্য-মধ্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' ও 'লায়লী মজনু'-তে অন্ত্যমধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহে, অনুবাদকাব্য শাখায় এবং রোমান্টিক কাহিনীকাব্যে সরাসরি সাধারণ মানুষ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব খন্ড কবিতায় ও রোমান্টিক কাহিনীকাব্যে যে প্রেমানুভূতি, তার মধ্যে 'লীলা' এবং 'এশ্‌ক্' এর অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু একথা ভাবাও অসঙ্গত হবেনা যে, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-মানবীর প্রেমানুভূতি ধর্মের আবরণে ব্যক্ত হতে চেয়েছে। আর এই প্রেমানুভূতি মানব-প্রবৃত্তির নিজস্ব সৌন্দর্যকেই প্রতিফলিত করছে।

বড়ুচন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'বংশীখণ্ডে' কুমার (কুম্ভার), তেলী, যোগিনী ('হাথে খাপর-ভিখ মাঙ্গএ যোগিণী') প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যথাক্রমে ভাঁড়ুদত্ত ও ঈশ্বরী পাটনীকে কাব্যে হয়তো রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষ হিসেবেই আনতে চেয়েছেন। এরা মধ্যযুগের চিরাচরিত কাব্য পরিমণ্ডল থেকে বাইরে আসার জন্য উদগ্রীব।

মুকুন্দরামের কালকেতু ও ফুল্লরা মর্ত্যজীবনে অসাধারণ মানুষ নন। দেবী চণ্ডীও হয়ে গেছেন লেওকিক দেবী। কবিকঙ্কণ উল্লেখযোগ্য যে-কাজটি করেছেন তা'হলো দেবীকে দিয়ে ভক্তের ভক্ত তোষণের কাজ। যদিও সেখানে সংশয়, সে সংশয় দেবীর নয়, কালকেতুর; যদি দেবী পিছন থেকে ধনপূর্ণ শেষ ঘড়াটি নিয়ে পালিয়ে যান।[৩] এতে প্রতীয়মান হয় দেবীর দেবীত্ব মানুষের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দেবীর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যতো না অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে, তার চাইতে মানুষের সাধারণ দোষ গুণের পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'মনসা-মঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসাও চাঁদ সওদাগরের অগত্যা পূজাতেই তুষ্ট হয়েছেন। এমনকি, 'চণ্ডী মঙ্গল'-এ মুকুন্দরাম পশুদের দ্বারা দেবী সমীপে যে অভিযোগ বাণী উপস্থাপনা করেছেন, সেখানেও নেউগী চৌধুরী প্রভৃতি বিত্তশালী মানুষের প্রতি বিধাতার অযৌক্তিক অনুকম্পা এবং অনভিজাত সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অসঙ্গত দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি যে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন অসাধু আমলাদের দ্বারা সংঘটিত হতো, তার বীভৎসতা স্বয়ং কবির স্বকীয় অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। স্মরণীয়, 'খিল-ভূমি' 'লাল' হিসেবে চিহ্নিত করা অথবা 'বিনা উপকারে' 'ধুতি' খাওয়ার মতো আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রকোপে পড়েই মুকুন্দরাম তাঁর পিতৃপুরুষের আবহমান কৃষি পেশা থেকে বিচ্যুত হন এবং বিতাড়িত কবি রাজদরবারের আশ্রয় লাভ করে অগত্যা চন্ডী প্রশস্তিমূলক পদ রচনায় নিয়োজিত হন। সে-কারণে সভাকবি হয়েও সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি তাঁর অনুকম্পার অন্ত ছিল না। সম্ভবতঃ এ-কারণেই দেবী কৃপা ধন্য ব্যাধ কালকেতু এবং ফুল্লরা তাঁর লেখনীতে নন্দিত হয়ে উঠেছে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা অপেক্ষা অনটনের চিত্র তাঁর তুলিতে ভাস্বর হয়েছে। যেমন-শিশু একমুঠো মাড়ভাতের জন্য ('ওদনের তরে') সর্বস্বান্ত ও অসহায় পিতামাতার কাছে নিষ্ফল ক্রন্দনে নিমগ্ন হয়, আর শিকার সংগ্রহ করার অসামর্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং নায়ক কালকেতু নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে-'হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার।[৪]

"ফুল্লরার বারমাস্যা"-তে মাস ভিত্তিক সবিস্তার দুদর্শার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে-

ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর তাল পাতার ছাউনি।।
ভেরেন্ডার খুঁটী তার আছে মধ্যঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ।।

কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ মায়।।

কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান।।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।

এ দুঃখগাথা শুধু ফুল্লরার নয়, সর্বযুগের সাধারণ মানুষের।

এই অসহায় রূপটি ছিলো মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের প্রায় ব্যতিক্রমহীন অবস্থার প্রতিনিধি। সে-ক্ষেত্রে ব্যাধবৃত্তি নয়, ভিক্ষাবৃত্তি নয়, সাধারণ মানুষের জন্য কৃষিবৃত্তিই ছিলো কিছুটা নিরাপদ। এজন্য 'শিবায়ন'[৬] এর কবি রামেশ্বর নায়ক শিবের ভিক্ষাবৃত্তিজনিত দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য সঙ্গতভাবেই চন্ডীর জবানীতে পরামর্শ দেন- 'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।[৭] লক্ষ্যণীয়, সাধারণ মানুষের জন্যে এ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ কৃষি পেশাটিও বিড়ম্বিত হয় মুকুন্দরামের আমলে প্রচলিত ভূমি জরিপে আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণ তৎপরতার ফলে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের (১৬৭৭-১৭৪৫) 'শিবায়ন' কাব্যের প্রধান কাহিনী শিবের দারিদ্রপীড়িত গার্হস্থ্য জীবন, কৃষিকার্য অবলম্বন ইত্যাদি।

কার্তিক, গণেশ দুই পুত্রকে নিয়ে শিব আহারে বসেছেন। অনু পরিবেশন করছেন পার্বতী। আহারের দৃশ্যে দেখা যায় ক্ষুধাতুর সাধারণ মানুষের ঔদরিক অভিব্যক্তি। এখানে দেবত্ব নেই, দীর্ঘদিন আহার বঞ্চিত ক্ষুধিতের অতৃপ্ত ভোজন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হরগৌরীর সংসারও যেনো বিত্তহীন মানুষের। সেখানে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে স্বামীর ভিক্ষাবৃত্তি। এই হীনবৃত্তিও তার ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের জ্বালা মেটাতে পারেনি-

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই।।
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে।।
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ।।[৮]

তবে, রাধানাথের 'পদ্মাপুরাণে' সাধারণ নারীর মতো পার্বতীও এক মুখরা রমণী। তার এ-মুখরাপনার উৎসমূল দরিদ্র স্বামী শিবের আর্থিক নিঃস্বতাঃ

আমার ঘরেতে নাই এক মুষ্টি দানা।
দেখিয়া শরীর পুড়ে তব কারখানা।।
ক্ষুধাতে না মিলে অন্ন পেট ভুকে মরি।
তোমার পাপেতে হৈনু জনম ভিখারী।।
দিবানিশি ঘুরি মর নাহি চিন বাড়ী।
মনে লয় বুড়াকালে পুড়ি দেই দাড়ী।।
সম্পদের মধ্যে সার ঝুলি আর কাঁথা।
খাইতে ধুতুরামদ্য আছয়ে যোগ্যতা।।
ভুকে মরে পুত্র দুটি তারে নাহি হের।
ইচ্ছামতে যথাতথা পড়ি গিয়া মর।[৯]

সাধারণ মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চবিত্ত সম্পর্কে এমন উক্তি মধ্যযুগে কমই উচ্চারিত হয়েছে। ঈশ্বরী পাটনী তখনো দেবীকে চেনেনি। কিন্তু হাড়ে হাড়ে চিনেছিল এদেশের কুলীন জাতিকে। শেষে দেবীকে যখন সে চিনলো, তখন 'বর' হিসেবে তার যে-চাওয়া, তা চিরদিন এদেশের সাধারণ মানুষেরই অন্তরের কথা-'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।[১০] মুসলমান কবিদের রোমান্টিক কাহিনীকাব্যে সাধারণ মানুষ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। দৌলৎ কাজীর 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্য'[১১] থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া যাক্-

ক. হেনকালে দ্বারী এক আসিয়া সত্বর।
প্রণামিয়া কহে বার্তা রাজার গোচর।। (পৃ, ৫৮)
খ. সুবর্ণ বরিখে যেন দরিদ্রের ঘরে।। (পৃ, ৫৮)
গ. তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা। (পৃ, ৬৫)
ঘ. দাসী হস্তে বিশেষ করিলুঁ ধাই-পনা। (পৃ, ৭৫)
ঙ. আনাইল রতনা মালিনী। (পৃ, ১১০)

এখানে দ্বারী, দরিদ্র, বেশ্যা, দাসী, ধাঁই, মালিনী সাধারণ মানুষ।
মধ্যযুগের অবসানে বাংলার সাথে আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের মিশ্রণে যে বর্ণনামূলক 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের সৃষ্টি হলো সেখানে অলৌকিকত্ব, অস্বাভাবিকত্ব ও স্থান বিশেষে অদ্ভুত কল্পনার পরিচয় থাকলেও মানবীয় অভিব্যক্তি দুর্লভ নয়। এ প্রসঙ্গে 'সোনাভানের কিস্‌সা', 'জয়গুনের কিস্‌সা', 'লায়লী মজনুর কিস্‌সা', 'ইউসুফ জুলেখার কিস্‌সা' ইত্যাদি স্মরণীয়। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন- শাহ্ গরীবুল্লাহ এবং সৈয়দ হামজা।

এই সময়ে কবিগানও বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলো। আয়োজিত কোনো আসরে শ্রোতা সাধারণের মাঝে দলগত প্রতিযোগিতায় 'চাপান' এবং উতোরের মধ্যে দিয়ে কবিওয়ালাদের কবিগানের সৃষ্টি। কবিগান যতো অশ্লীলই হোক, এর বিশেষ দিকটি হলো সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন। এই প্রকারের মনোরঞ্জনের জন্য সে সময়টা 'অশ্লীলতা' দোষের কালও ছিলোনা। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেনঃ "সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিলনা। যে-

ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যেগালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল।[১২] সুতরাং, অশ্লীলতা সত্ত্বেও কবিগানের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

কবিওয়ালাদের মধ্যে কেষ্টামুচি, রাসুনৃসিংহ, রমাপতি ঠাকুর, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্তঃ ১৭৪১-১৮৩৯), রঘুমুচি, হরু ঠাকুর, রামবসু, এন্টনী ফিরিংগি, নিতাই বৈরাগী অধিক উল্লেখযোগ্য। দোভাষী পুঁথিকার এবং কবিওয়ালাদের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেনঃ "ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে কবিওয়ালা ও দোভাষী পুঁথিকারগণই বহন করেছিলেন। সে সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশৃংখলার মধ্যেও এঁরা পরম নিশ্চিন্ততায় এক শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য আনন্দ পরিবেশন করছিলেন।"[১৩] সমালোচকের এ উক্তি যথার্থ।

এভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তী কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু যথার্থভাবে মানুষ স্বরূপে এবং প্রত্যক্ষভাবে এসেছে বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে আধুনিকযুগে। সেখানে প্রথমে এসেছে উচ্চবিত্তের মানুষ, তারপর মধ্যবিত্তের এবং শেষে সাধারণ মানুষ।

আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিক যুগের কবি হলেও কালের দিক থেকে তিনি এমন একটি যুগে অবস্থান করছেন, যেখানে মধ্যযুগের সাহিত্য-চেতনারও রেশ রয়ে গেছে। তবে, তাঁর কাব্য আধুনিকতার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আধুনিকতার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস্তবতা, আত্মভাবনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সমাজ-সচেতনতা, স্বাদেশিকতা, প্রকৃতি-প্রিয়তা, মানব-প্রীতি, বিশ্ববোধ ইত্যাদি প্রধান। আধুনিক কবিতায় ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি বিদ্যমান থাকে। উপরন্তু, আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যে নতুন সুরে নতুন কথাও বলে থাকেন। এই নতুন সুরে নতুন কথা বলার ক্ষেত্রে আধুনিক কবিরা প্রায়শঃই তাঁদের কবিতায় সাধারণ মানুষের ভূমিকাকেই প্রাধান্য দেন। অনুরূপ কাজটি ঈশ্বর গুপ্তও করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আত্মভাবনা, সমাজ-সেবা, স্বাদেশিকতা, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কবিতা আছে, - যেগুলোর অধিকাংশ যে চিত্র উপস্থিত তার নায়ক প্রধানতঃ সাধারণ মানুষই। তাঁর "দুর্ভিক্ষ" কবিতায় তার কিছু প্রমাণ মেলেঃ

ও ভাই! ততদিন তো খেতে হবে,
যতদিন এদেহ রবে।
এখন কেমন করে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে-ভেবে।
রোজ অষ্টপ্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুন জোড়েনা,

কেঁদে মরি হাহারবে।[১৪]

'অষ্টপ্রহর' কষ্টে ভোগা দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষদের এই 'হাহারব' আজো থামেনি।

ঈশ্বরগুপ্তের স্বাদেশিকতা এবং দেশবাসী-প্রিয়তা উল্লেখ করবার দাবী রাখে।

এ প্রসঙ্গে তাঁর "স্বদেশ" কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণীয়ঃ

মিছা মণিমুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরের কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।[১৫]

কখনো কখনো সাধারণ মানুষের প্রতি ঈশ্বরগুপ্তের বিদ্রুপবাণ নিক্ষিপ্ত হলেও তা ছিলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোর ইয়ারকি'[১৬] -র সামিল। এতদসত্বেও গুপ্ত কবি মানস 'সাধারণ মানুষ'- এর চিন্তা বহির্ভূত ছিলোনা। যেহেতু ঈশ্বরগুপ্ত নিজেকে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে দেখেছেন। এবং শ্রেণী অবস্থানের দিক দিয়েও এটি ছিলো তাঁর যথার্থ রূপ, সেজন্য তিনি যখনই আত্মভাবনামূলক কবিতা রচনা করেছেন, তখনই সেখানে তাঁর নামে উপস্থিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। যেমন, আমরা 'তপসেমাছ', 'পাঁটা', 'আনারস' ইত্যাদি কবিতায় যে উদরিক ব্যক্তিটির সন্ধান পাই, তার রুচি ও মানসিকতা সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের। তাই বলা চলে, তাঁর আত্ম ভাবনামূলক কবিতাসহ অপরাপর কবিতায় সাধারণ মানুষের যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের সমকালীন জীবন - আচরণকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

বিশ্বের সব সাহিত্যের সূচনা যে কবিতা দিয়ে একথা প্রমাণিত সত্য। সাহিত্যে গদ্য এসেছে অনেক পরে ব্যবহারিক জীবনের তাগিদেও উপযোগিতায়। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সেখানেই সাহিত্যিক-গদ্যের সূত্রপাত, এবং যদিও তা ছিলো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তবু, সেই মৃদু কলধ্বনি থেকেই আজ গদ্যের বিশাল বিস্তার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সমাজ-সচেতন গদ্যশিল্পী। তাঁর অনন্য দুলর্ভ সমাজ সচেতনতা, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা, অপরিমেয় পাণ্ডিত্য এবং অনুপম বলিষ্ঠ সাহিত্যিক-নির্মিতি দ্বারা তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হয়ে আছেন। তিনি অদ্যাবধি বাংলা গদ্যের অবিতর্কিত জনক। এবং "সকলের ওপরে তিনি মানতেন মানবর্ধম। মানবতাই তাঁর জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।"[১৬]

এই অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হয়েছিলো অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ –পণ্ডিতের ঘরে। সুতরাং সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন, একথা মনে করা সঙ্গত হবে না। তাঁর সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধাদি এবং রম্য রচনাবলীর মূল লক্ষ্য সমাজ ও সামাজিক মানুষ। এছাড়া তাঁর স্কুল-পাঠ্য ও সাহিত্য সংক্রান্ত রচনাসমূহের মধ্যে 'কথামালা'য় দরিদ্র মুসলমান বিধাবা, কৃষক, রাখাল প্রভৃতি সাধারণ মানুষের উল্লেখ রয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচনার কৃতিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) যাঁর ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বহুখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) যে 'আলালী বাংলা' ব্যবহৃত হয়েছে তা কলকাতা এবং তদপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। তিনি ছিলেন জীবন-ঘনিষ্ঠ শিল্পী। ফলে, তাঁর রচনায়-বিশেষতঃ 'আলালের ঘরের দুলালে' বিভিন্ন বিত্তের মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষও লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাচা, ঠকচাচী, মিয়াজান গাড়োয়ান, মুহুরি, তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, কলু, খিড়কিদার, দাস-দাসী, সেরেস্তাদার, অন্ধ, আতুর, দুঃখী-দরিদ্র প্রভৃতি স্মরণীয়।

প্রাক-রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে প্রথম বিপ্লবী কবি। বাংলা কাব্যের ভাব-ভাষা-ছন্দ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে তাঁর কুশলী হাতে। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ অঙ্গনে এবং বিচরিত প্রতিটি অঙ্গনেই তিনি রেখেছেন যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর।

মাইকেলের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' (১৮৫৯), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)- কোনো কাব্যেই বিষয়বস্তুর স্বার্থে সাধারণ মানুষ আসে না এবং আসেও নি। তবুও, মধুসূদন দত্ত সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতির জন্য যখনই উপমা, রূপক, প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তখনই উপমানের স্বভাবে তাঁর সমবেদনা বিকশিত হয়েছে। যেখানে সহানুভূতির সঙ্গে অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়েছে, সেখানেই চিত্রকল্প অভীষ্ট সত্যটি সুচারুরূপে উদ্ভাসিত করেছে। যেমন- 'বরজে সজারু যথা পশে বনস্থলে।' সজারু বরজে প্রবেশের ফলে বরজের যে বিপর্যয় ঘটে, তার অভিজ্ঞতা মধুসুদনের ছিল বলেই এই উপমার দ্বারা তিনি রাবণের লঙ্কাপুরীর বিপর্যস্ত রূপটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য, এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ একটি সাধারণ মানুষের জীবীকার অবলম্বনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিজাত বিপর্যয়ের সত্যকে ধারণ করেছে। অন্যদিকে অপর একটি চিত্রে রাবণের দুরাবস্থা উপমিত হয়েছে কাঠুরিয়ার পেশাগত প্রয়োজনে ছিন্নবৃক্ষের শাখাহীনতার সঙ্গে। যেমন-

বনের মাঝারে যথা শাখা দলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে হে বিধাতঃ, এ দূরন্ত রিপু
তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর।[১৭]

এই উপমায় কাঠুরিয়ার প্রতি কোনো অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়নি। কবি কখনো কখনো রাঘবের বিশেষণরূপে 'ভিখারী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণীর প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণা প্রকাশিত হয় না। তার মূল অবজ্ঞা নিক্ষিপ্ত হয় রাম চন্দ্রের প্রতি এবং তার মূলে থাকে তাঁর বানর বাহিনী সহযোগে পররাজ্য আক্রমণ প্রবণতা, ভিক্ষাবৃত্তি নয়। এমন কি, কাব্য সূচনায় চিত্রাঙ্গদার যে হাহাকারে, যথা –

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র– ধন – রক্ষণ রাজধর্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর, কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?[১৮]

– এ উক্তি কোনো রাজমহিষীর নয়, তা সর্বহারা শ্রেণীর মায়ের অসহায়তা প্রকাশ করে।

যুদ্ধ– যাত্রার প্রাক্কালে 'পিতৃ আজ্ঞা' লাভের পর মেঘনাদ যখন মা মন্দোদরীর কাছে আশীর্বাদ নিতে যায়, তখন মন্দোদরীর যে মানসিক বিপর্যস্ততা ও ব্যাকুলতা তাও সর্বকালীন মায়ের, কোনো রাজ–রাজেশ্বরীর নয়–

যাইবি রে যদি,
... কি আর কহিব?
নয়নের তারা হারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই।[১৯]

এ অভিব্যক্তি সর্বযুগের পুত্রহারা মায়ের পুত্রবধুর প্রতি চিত্তদীর্ণ হাহাকার। সীতা হারা রামের অসহায়ত্ব যেনো সাধারণ মানুষের মতোই –

... কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?[২০]

'বীরাঙ্গনাকাব্যে' দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা"–য় শকুন্তলার শৈশব স্মৃতিচারণে সহায়হীনা সাধারণ নারীর খেদোক্তিঃ

চির–অভাগিনী আমি। জনক জননী
ত্যাজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?

পরান্নে বাঁচিল প্রাণ- পরের পালনে।[২১]

"দশরথের প্রতি কেকয়ী" পত্রকাব্যে রাজা দশরথকে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর নির্বিকার মানসিকতা লক্ষ্য করে রাণী কেকয়ী যে - প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করতে চলেছেন তাতে উল্লিখিত সাধারণ মানুষ 'কাঙালে'র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়নি-

এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে-
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে -
'পরম অধর্মচারী রঘু-কুল-পতি।[২২]

ভাগ্য বিড়ম্বিত কবির নিয়তি-লাঞ্ছনার অপর চিত্র পাওয়া যায় অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'- এর কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনে। এমনকি, মধুসূদনের কাব্য জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)-তে এই বিড়ম্বনাজনিত হাহাকার উপস্থিত। তাঁর 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতায় দেখানো হয়েছে উর্ধশির রসাল-যা অভিজাত শ্রেণীর প্রতীক, সে-ই ভূপাতিত এবং বিধ্বস্ত হয়েছে প্রাকৃতিক বিচারে এবং টিকে থেকেছে নীচশির সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্বর্ণলতিকা। কবিতাটির শেষাংশে উদ্ধৃত আত্মবাণীটি কবিরই মর্মবাণী-

উর্ধ্বশির যদি তুমি কুলমান ধনে
করিওনা ঘৃণা তবু নীচশির জনে।[২৩]

তাঁর সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ 'সমাধি লিপি'-টিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে-

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।[২৪]

এখানে তিনি যার কাছে আত্ম পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন, সে অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর কেউ নয়, সে সাগরদাঁড়ী বাসী সাধারণ পথচারী 'পথিক বর' মাত্র। সে সাধারণ কৃষক, জেলে, তাঁতী, মজুর-ঐ পথের স্বাভাবিক যাত্রী। সুতরাং, একথা বলা যায় যে, মধুসূদনের প্রাথমিক জীবনের বিশিষ্ট সীমাবদ্ধতার জন্যেই সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কিছুটা অপরিচয় থাকলেও অবজ্ঞা ছিলো না

এবং তাঁর সাহিত্য কর্মের বিষয়বস্তুর স্বার্থে সাধারণ মানুষের ভূমিকা সংকুচিত হলেও অনুদার ছিলো না।

মধুসূদন প্রহসন রচনায়ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনদ্বয় একই সময়ে রচিত। প্রথম প্রহসনে রয়েছে ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার তরুণ যুবকদের প্রতি শাণিত রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় দারুণ কষাঘাত এবং দ্বিতীয়টিতে বুড়ো ব্রাহ্মণ সমাজপতির কুচরিত্র ও লাম্পট্যের রসাল বর্ণনা।

'একেই কি বলে সভ্যতা'-র সাধারণ মানুষগুলো হলো পয়োধরী ও নিতম্বিনী নামক দুই খেমটাওয়ালী, বৈদ্যনাথ (বোদে নামে উল্লেখিত), বৈষ্ণব বাবাজী, চৌকিদার, খানসামা, বেহারা, দারোয়ান (দরওয়ান), মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয় প্রভৃতি।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-য় আছে 'বড় কাঙ্গাল রাইৎ' হানিফ গাজি ও তার স্ত্রী ফতেমা, গদাধর, পুঁটি (যুবতী জোগানওয়ালী চরিত্রহীনা নারী-এ অনেকটা ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর মতো), ভগী (পীতেম্বরে তেলীর মাগ'), পঞ্চী (পীতাম্বরের মেয়ে) এবং আরো অনেকে। এরা সবাই সাধারণ মানুষ।

নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) সমাজ - জীবন - ঘনিষ্ঠতা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি তাঁর নাটক এবং প্রহসনের মধ্যে সাধারণ মানুষের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, বাংলা নাট্য সাহিত্যে তা নতুন - মাত্রার সংযোজন বলা চলে। তাঁর বহুখ্যাত নাটক 'নীল দর্পণ' (১৮৬০)[২৫] প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করে মাইকেল মধুসুদন দত্ত এবং এর প্রকাশক জেমস লঙ্ রাজরোষে পতিত হন। লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় এবং তিনি অর্থদন্ডে দন্ডিত হন। এ বিপদ থেকে তিনি পরিত্রাণ লাভ করে কালী প্রসন্ন সিংহের স্বতঃস্ফূর্তিক অর্থ-সহায়তায়।

'নীল দর্পণ' নাটকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র তোরাপ। এছাড়া রয়েছে সাধুচরণ, রাইচরণ, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদীময়রাণী, রাখাল। 'লাটিয়াল' পেয়াদা, প্রথম রাইয়ত, দ্বিতীয় রাইয়ত, তৃতীয় রাইয়ত, চতুর্থ রাইয়ত প্রভৃতি। দীনবন্ধু 'এ নাটকের মধ্যে সহজ ও সরল গ্রাম্য মানুষের যে পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাট্য - নাট্য সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন।[২৬]

সময়ের দিক থেকে দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণে'র প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। বাংলাদেশে দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় নীলকরদের নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যে আর্তনাদ তুলিয়াছিল, তাহাতে শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত যেন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 'নীলদর্পণে'ই তাঁহারা যেন সর্বপ্রথম প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন।[২৭]

'নীল দর্পণে'র নীচের সংলাপগুলিতে জীবন্ত সাধারণ মানুষ যেনো প্রত্যক্ষ করা যায়-

(১) রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবারে। মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মারলে। ... ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি।[২৮]
(প্রথম অঙ্কঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

(২) তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না- ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড় বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুইতো কখনুই পারবো না- জান - কবুল।[২৯]
(দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

দীনবন্ধুর সর্বপ্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)-য় সাধারণ মানুষের মধ্যে রভানাপ্‌তে, ঘটক, পেঁচোর মা এবং বৈকুণ্ঠ নাপিত স্মরণীয়। অপর প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)-র নিমচাঁদ এক অপূর্ব সৃষ্টি। সে একজন শহুরে শিক্ষিত মাতাল। সাধারণ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে দামা (অটলের ভৃত্য), কাঞ্চন (বেশ্যা), অযোধ্যা সিং ও রঘুবীর রায় নামে দুই দ্বারপাল, আরদালি, দাসী, বার-বিলাসিনী এবং পাহারাওয়ালা।

দীনবন্ধুর আর - এক সামাজিক নাটক 'লীলাবতী' (১৮৬৭)। 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ এবং নদের চাঁদ যেনো 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের ভ্রাতৃপ্রতিম। এ নাটকের রঘুয়া (উড়ে ভৃত্য), কনষ্টেবল, ঘটক ও দাস-দাসীর জীবন প্রভূ-নির্ভরশীল। তাঁর শেষ প্রহসন 'জামাই বারিক' (১৮৭২)- এ হাবার মা ও পাঁচী (জমিদার বিজয় বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়), জামাই, চোর, দাসী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি সার্থক সাধারণ মানুষ।

দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী মানস সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে খোন্দকার সিরাজুল হক যথার্থই বলেছেনঃ "দীনবন্ধু তাঁর সাহিত্য জীবনে' কর্মে ও কথায় সভ্য আত্মীয়তা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন 'মাটির কাছাকাছি'র শিল্পী। কিন্তু সরকারী চাকুরে দীনবন্ধু ব্যক্তি জীবনের সীমাবদ্ধতার ফলে তিনি এপথে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। তবু নাট্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ গণজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন বলেই 'নির্যাতিত জীবনের সহানুভূতিশীল বাণীকার'-রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"[৩০]

কালী প্রসন্ন সিংহ অনেক গ্রন্থ রচনা করলেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'-র জন্যই তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। সেখানে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মানুষের সাথে নিম্নবিত্তের ও বিত্তহীন মানুষের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ পথের ভিখারী, কেরানি, দোকানী, হাটুরে, মিশিদাঁতে রংদার, জুতো পায়ে নবীন নাগর প্রভৃতির কথা বলা যায়। বস্তুতঃ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' 'কলকে তাই চলতি বুলিতে' রচিত তৎকালীন কলকাতার এক বহুবর্ণ এ্যালবাম - যার পাতায় রয়েছে বিবিধ পেশার সব বিচিত্র মানুষ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮–১৮৯৪) দুর্লভ সাহিত্য– প্রতিভা মাত্রাতিরিক্ত সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন– মনুষ্যত্বের পুজারী। তাঁর সমাজ ও পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৬) এবং ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৯৭৫) ও 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৪)–এ সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূর্বে উল্লিখিত তিনিটি উপন্যাসের চেয়ে ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনা দু'টির সাধারণ মানুষ অধিক জীবন্ত। 'কমলাকান্তের দপ্তর' – এর 'মনুষ্যফল' এর ফয়জু খান সামা (লেখকের উক্তিঃ 'ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত') কুলীনের মেয়ে পদী পিসীর চেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র। কেননা, "যাহাদিগকে .... পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা।[৩১] এ গ্রন্থের "আমার মন" এর প্রসন্ন গোয়ালিনীও দোষ–গুণের সমন্বয়ে গড়া মানুষ।

মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত–এর হারান অধিকারী, বেহালাওয়ালা, ফেলু সেখ, চাপরাশী, ভজগোবিন্দ এবং জনৈক চাষীকে সাধারণ মানুষ বলতেই হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চাষী তথা কৃষক প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে 'বিবিধ প্রবন্ধে' – এর দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯২)। সেখানে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে নীতিবাদী বঙ্কিমকে বিদায় করে দিয়েছেন কৃষক–প্রেমিক মানবতাবাদী বঙ্কিম। এটা করতে গিয়ে 'জমীদার' নামীয় 'স্থুল মাংসপিণ্ড'–রা হয়েছেন তাঁর সমালোচনার শিকার। আর তাঁর সহানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে চিরকালীন মেহনতি মানুষ হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত, পরাণ মণ্ডল এবং রামধন পোদ–যাদের নিত্যদিনের ও চাষ–মৌসুমের কার্য–ফলের উপর দেশের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে আছে। অথচ তাদেরই জীবনে 'মঙ্গল' নেই। এ সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্রের উক্তিঃ হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, ... উপবাস– সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চসমা–নাকে বাবু। ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে।[৩২] কৃষিজীবী সম্পর্কে বঙ্কিমের এই অনুভব এবং অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেননা, এর জের আজো চলছে।

তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯)– তে ও আবার পরাণ মন্ডলকে হাজির করে তিনি প্রজা সাধারণের উপর তৎকালীন অত্যাচারী জমিদারের নিষ্ঠুর উৎপীড়ণের করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেনঃ জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য। বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।[৩৩]

এ- বঙ্কিম সাধারণ মানুষের বন্ধু।

অনুরূপ মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হেসেনের (১৮৪৭-১৯১২) মধ্যে। তাঁর 'জমিদার-দর্পণ' (১৮৭৩)- ও দরিদ্র প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচারী জমিদারের নির্মম উৎপীড়নের এক মর্মন্তুদ কাহিনী। এখানে দুশ্চরিত্র জমিদার হাওয়ান আলীর কুপ্রবৃত্তির শিকার প্রজা আবু মোল্লার যুবতী স্ত্রী নুরুন্নেহার। সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে নুরুন্নেহারের মৃত্যু এবং আবু মোল্লার উন্মাদ হয়ে গ্রাম ত্যাগ এই নাটকের ট্রাজেডীকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

মীর মশাররফ হোসেনের তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আছে তাঁর 'উদাসীন- পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) এবং 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯)-তে। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র কালোরায় কটা লাহিড়ী, আলকাতরা সান্যাল, ঘরভাঙ্গা স্যানাল, মাথা পাগলা রায়, মোক্তার ধিনতা-ধিনা বাবু, ধামাধরা সরকার, ধড়িবাজ ঠাকুর, উনপাঁজুড়ে ঘোষ প্রভৃতি মধ্যবিত্তের মানুষ হলেও আচার-আচরণে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত এবং নামেই এদের পরিচয় দেদীপ্যমান।

সাধারণ মানুষের প্রতি মীর মশাররফ হোসেনের সহানুভূতি লক্ষ্য করবার মতো। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন গভীরভাবে। তাই, মানুষের জীবন রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণতা, হীনতা ও মলিনতার উর্ধে থেকে প্রকৃত শিল্পীর ন্যায় 'সাহিত্যের অমরাবতী' সৃষ্টি করে গেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য মাইকেলের পরবর্তী স্মরণীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। তিনি গীতিকবিতার প্রথম স্রষ্টা। তাঁর অধিক পঠিত এবং আলোচিত কাব্য 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬) এবং 'সাধের আসন' (১২৯৫-৯৬)- কাব্য বিচারে 'জীবন বর্জিত এক সৌন্দর্য ধ্যান' বলে মূল্যায়িত হলেও তাঁর অন্যান্য কাব্য সম্পর্কে ভিন্নতর মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে।

কবি নগরের 'গর্ব্বভরা অট্টালিকা'-ময় পারিপার্শ্বিকতার কোটরে আর আবদ্ধ থাকতে চান না। সেজন্য স্বস্তি ও শান্তির অন্বেষায় যা ভেবেছেন, সেটা সাধারণ মানুষ প্রীতির এক ছন্দোময় দলিলঃ

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম-ধাম সকল লুকাই।
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
... বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।[৩৪]

মিষ্টিক কবির এ –চাষীপ্রীতি উল্লেখের দাবী রাখে।

'দুখীর বালক' এর প্রতি কবির সহানুভূতি–

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ।
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন–বুক।৩৫

কবির দৃষ্টিতে 'প্রসাদ' এবং 'কুটীর', 'বাবুরা' ও 'চাষীরা'–

বটে প্রাসাদের মুখ
করে করে টুকটুক,
প্রান্তরের কুটীরেরো
অল্প শোভা নয়।
বাবুরা ঘুমের ঘোরে
অচেতন শয্যা–পরে,
চাষীরা নতুন মনে
চাষে রত হয়।৩৬

এখানে ঘুম–ঘোরে অচেতন বাবুদের চেয়ে নিত্য 'নতুন মনে'র কর্মরত চাষীদের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্যণীয়।

তাই, একথা বলা যায়, বিহারী লাল শুধু রোমান্টিক ও মিষ্টিক কবি ছিলেন না, তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষও আছে এবং তিনি তাদেরকে দেখেছেন তাদের অবস্থান ভূমি থেকে।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'গুরু' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উন্মেষকালের কাব্যে কিছুটা হলেও তাঁর প্রভাব পড়েছিলো।

তথ্য নির্দেশঃ

১। Muhammad Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs.* Dacca: Bengali Academy, 1966. Text-10, Page 30.

২। প্রাগুক্ত। Text 33,P. 93. পুরোপংক্তি- "হাড়িত ভাত নাহি ণিতি আবেশী।"

৩। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২। 'ধনঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী', পৃ. ২৮৯।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

৫। নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। *কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* ২য় সংস্করণ। এলাহাবাদঃ ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ১৯২১, পৃ. ৪৯-৫০।

৬। কাব্যটির পুরো নাম *শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন,* কবি রমেশ্বর ভট্টাচার্য্য। এটি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

৭। ঐ । যোগিলাল হালদার সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭, পৃ. ২১৬।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)। "হরগৌরীর বিবাদ সূচনা", 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ৩য় সংস্করণ। কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৯, পৃ. ৫৬।

৯। রাধানাথ রায় চৌধুরী। *পদ্মাপুরাণ* ২য় সংস্করণ। শ্রীহট্টঃ ১৩৩৭, পৃ. ৩২।

১০। *ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী* প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫৯।

১১। মযহারুল ইসলাম মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পাদিত)। *সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী,* ২য় সংস্করণ। ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩।

১২। বঙ্কিম-রচনাবলী। *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-ভূমিকা,* কলকাতাঃ তুলি-কলম, ১৩৯৩, পৃ. ৮৫৩।

১৩। "দোভাষী পুঁথি, কবিগান, বাউল" মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ),* ৫ম সংস্করণ। ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৮৫, পৃ. ৮৫৩।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। "দুর্ভিক্ষ", 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব'। কলিকাতা, ১২৯২, পৃ. ১২৩।

১৫। *বঙ্কিম রচনাবলী।* 'ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-ভূমিকা'। কলকাতাঃ তুলি-কলম, ১৩৯৩, পৃ. ৮৫৯।

১৬। ঐ, পৃ. ৮৫১।

১৭। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) *মেঘনাদবধ কাব্য,* প্রথম সর্গ। কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৫ম মুদ্রণ, ১৩৭১, পৃ. ৩১।

১৮। *প্রাগুক্ত।* প্রথম সর্গ, পৃ. ৪১।

১৯। *প্রাগুক্ত।* পঞ্চম সর্গ, পৃ. ১৪৯।

২০। *প্রাগুক্ত।* ষষ্ঠ সর্গ, পৃ. ১৫৫।

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)। "দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা", *বীরাঙ্গনাকাব্য* ষষ্ঠ মুদ্রণ। কলিকাতাঃ বঙ্গীয়- সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮, পৃ. ১৪।

২২। *প্রাগুক্ত।* " দশরথের প্রতি কেকয়ী"। পৃ. ৩০।

২৩। "রসাল ও স্বর্ণ- লতিকা", 'বিবিধ-কাব্য'। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬২, পৃ. ২০।

২৪। 'সমাধি লিপি' 'বিবিধ কাব্য'। ঐ, পৃ. ৪১।

২৫। এ গ্রন্থে দীন বন্ধুর নামোল্লেখ ছিলো না। 'আখ্যাপত্র' হতে গ্রন্থটির পরিচয় পাওয়া যায়। তা এরুপ–নীল দর্পন / নাটক / নীলকর–বিষধর– দংশনকাতর– প্রজানিকর/ ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রনীতং। ঢাকা/ শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক / বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন।

২৬। "বাংলা নাটকঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ", *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), ৫ম সংস্করণ। মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান। ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৮, পৃ. ৩৩৮।

২৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)। *দীনবন্ধু–গ্রন্থাবলীঃ নীলদর্পন* ৫ম মুদ্রণ। কলিকাতাঃ বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ,১৩৬৬, পৃ. ৪।

২৮। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮।

২৯। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৬।

৩০। খোন্দকার সিরাজুল হক (সম্পাদিত) *দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ* কলিকাতাঃ ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৫, পৃ. ১৪।

৩১। 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মনুষ্য ফল'। *বঙ্কিম–রচনাবলী*, কলকাতাঃ তুলি–কলম, ১৩৯৩, পৃ. ৫৪।

৩২। 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' (১ম পরিচ্ছেদ)। *ঐ*. পৃ. ২৮৮।

৩৩। 'বঙ্গদেশের কৃষক', "জমীদার" (২য় পরিচ্ছেদ)। *ঐ*, পৃ. ২৯১–২৯২।

৩৪। "উপহার", *বিহারী লালের কাব্য সংগ্রহ;* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২। পৃ. ১৬–১৭

৩৫। "নারী বন্দনা", *ঐ*, পৃ. ৩০।

৩৬। 'সঙ্গীত শতক' *ঐ*, পৃ. ১৯০–১৯১।

ইসলামী শিক্ষার অনুষঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য

এ. কে. এম. নুরুল আলম
মুহাম্মদ আফাজউদ্দীন

ইসলামী শরীয়তের চারটি স্বীকৃত উৎসের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয়। নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রমুখাৎ বাণী, কাজ-কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন, তার নীরব সমর্থন আচার-ব্যবহার এক কথায় তাঁর নবুয়তী জীবনের গোটা আলেখ্যই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। অন্যভাবে তাঁর সম্মানিত সাহাবী (যাঁরা তার দর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁর দীনের দাওয়াত কবুল করেছেন) এবং তাবেয়ীগণের (যারা মুসলিম অবস্থায় কমপক্ষে একজন সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন) কথা-কাজ, সমর্থন ও মৌন সমর্থনকেও 'উসুল-ই-হাদীস' (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি) এর পরিভাষায় হাদীস বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে রাসুলের (সঃ) কথা (কওল), কাজ (কে'ল) ও মৌন সমর্থনের (তাকরীর) ন্যায়ই সমধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে সংকীর্ণ অর্থে সাধারণভাবে নবী করীম (সঃ) এর বাণী, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস বা সুন্নাহ বলে গণ্য করা হয়। অন্ততঃ হাদীস চর্চা সংক্রান্ত প্রাপ্ত লেখকগণের উপস্থাপনা থেকে এ ধরনের ধারণাই জন্ম লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা ও হাদীস সাহিত্যের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এ সম্পর্কে লেখালেখি ও পুস্তকাদির সংখ্যাও কম নয়। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ এসহাক লিখিত, *Indias Contribution to the study of Hadith Literature* শীর্ষক পুস্তকখানি এতদসংক্রান্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উন্নতমানের দলিল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে নির্ভরযোগ্য প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত সেহেতু বঙ্গদেশ প্রেক্ষিত তাঁর আলোচনায় এসেছে গৌণভাবে। আমরা মনে করি, বঙ্গভূমিতে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য, আর লালন এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে পৃথকভাবে গবেষণা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণার কাজ অদ্যাবধি সমাপ্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রেক্ষপটে হাদীস প্রসঙ্গে গবেষণার কিছু সম্ভাব্য দিক নিয়ে

সংক্ষিপ্ত (এবং অপূর্ণাঙ্গ) আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। অবহেলিত অথচ সম্ভাবনাময় এদিকটির প্রতি আগ্রহী গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান নিবন্ধের মূল।

পবিত্র কুরআন ইসলামের প্রধান উৎস আর হাদীছ তার বিশ্লেষিত ভাষ্য। কুরআন ওহী-এ-মাত্‌লু- প্রত্যক্ষ ওহী, আর হাদীছ ওহী-এ-গায়র মাত্‌লু বা পরোক্ষ ওহী। কুরআন উপলব্ধির জন্যই হাদীছের অবতারণা। পবিত্র কালামে ঘোষিত হয়েছে, 'তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়ে দেবার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[১]

রাসুলের (সঃ) শিক্ষা, কথা, কাজ, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর চরিত্র, প্রকৃতি ও চরিত সম্পর্কিত যাবতীয় বর্ণনাই হাদীছের অন্তর্ভূক্ত।[২] ইসলামের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক আবেদনের তথ্যানুসন্ধান হাদীছের সূত্র ব্যতীত অসম্ভব। কুরআনের অনুসরণ তথা ইসলামী জীবনবোধ ও ধারা উপলব্ধির জন্য হাদীছের অনুশীলন অপরিহার্য। একজন মুসলিম তার প্রাত্যহিক কর্ম থেকে শুরু করে সর্বপর্যায়ের জীবন জিজ্ঞাসার তথ্য ও তত্ত্বের নির্দেশনা লাভ করে ইল্‌মে হাদীছ থেকে। এ কারণে হাদীছের চর্চা, অনুশীলন, অধ্যয়ন, প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করার জন্য মহানবী (সঃ) নিরন্তর উপদেশ, নির্দেশ ও প্রেরণা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, "আমার থেকে একটি বাণী হলেও প্রচার কর"।[৩] তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখোজ্জ্বল করবেন যে, আমার কথা শুনে মুখস্ত করে সঠিকরূপে স্মরণ রাখে এবং এমন ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয় যে তা শোনেনি"।[৪] "যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীছ কণ্ঠস্থ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ফকীহ্ হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন এবং আমি নিজে কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হব"।[৫] মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের বাণীতে লক্ষ নেতার সামনে হাদীছ প্রচারের গুরুত্ব তুলে ধরে ভাষণের শেষাংশে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট (আমার বাণী) প্রচার করে"।[৬] হাদীছ চর্চা ও প্রচারের এ গুরুত্ব মুসলিম মনীষা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। রসুলের (সঃ) মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের জন্য তাঁর কর্মপদ্ধতি, জীবনাচার ও যুগজিজ্ঞাসার সদুত্তর অবগত হওয়ার জন্য একদল আত্মোৎসর্গকারী সাহাবা পার্থিব জীবনের যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ করে অনুক্ষণ রসুলের (সঃ) সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করেন। হাদীছের পঠন অনুশীলন, প্রচার ও প্রসারে মুসলিম মনীষীদের শ্রম, সাধনা ও ঐকান্তিকতা সত্যই অতুলনীয়। রসুলের (সঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহাবাগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিদায় হজ্জে মহানবীর নির্দেশ লাভের পর সাহাবাগণের অনেকেই জন্মভূমি ত্যাগ করে এশিয়া-আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। রসুলের (সঃ) ওফাতের পরে হাদীছ বিশেষজ্ঞ সাহাবাগণ কেবল হাদীছের অনুশীলন ও প্রচারের জন্য মক্কা, মদীনা, কুফা, বাসরা, হিমস, দামিশ্‌ক, মিশর, বাগদাদ, নিশাপুর প্রভৃতি স্থানে হাদীছ চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।[৭]

বাংলায় কখন কিভাবে হাদীছ চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমরের (রাঃ) শাসনামলে (৬৩৫-৪৩ খ্রীঃ) সাহাবাদের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন হয়েছিল বলে জানা যায়।

উপমহাদেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। প্রাক ইসলামী যুগ থেকেই ভারতের উপকূলীয় বন্দরসমূহে আরবদের বাণিজ্য পোতগুলি নোঙ্গর করত। আরব-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল অতি গভীর।

মহানবী (সঃ) ভারত উপমহাদেশে ইসলামের অভিযান প্রেরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তিনি ভারত বিজয়ের জন্য উম্মতকে প্রেরণা দান করে বলেন, "আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি ভারত আগমনকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের (আঃ) সহযোগী সেনাদল।"[৮]

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "রসুল (সঃ) আমাদেরকে ভারত বিজয়ের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই, সে সময় আমি জীবিত থাকেল তাতে আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হব না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হব আর যদি আমি সহিসালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি দোজখ মুক্ত।[৯]

মহানবী (সঃ) কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল সাহাবা হযরত উমারের খিলাফত কালেই (৬৩৫-৪৩ খ্রীঃ) নৌ ও স্থল পথে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত 'আসিম ইবনে আমর', হাকাম ইবনে আমর তাগলিবী, আব্দুল্লাহ ইব্নে উত্বান এবং সুহাইল ইব্নে আদী (রাঃ) সিন্ধু উপত্যকায় ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেন।[১০] বাহরায়ন ও ওমানের গভর্ণর উছমান ইবনে আবিল 'আস-এর সহোদর আল হাকাম ভারতের বন্দর নগরী বোম্বাইয়ের সন্নিকটে তানাহতে অভিযান পরিচালনা করেন।[১১] এ ছাড়া, পরবর্তী খলিফাদের সময়েও কতিপয় সাহাবা ভারতে আগমন করেন। রসুলের (সঃ) এসব সাহাবা সর্বপ্রথম ভারতে হাদীছের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ) মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ৭১১ সালে সিন্ধু বিজয় করেন। ফলে, সিন্ধু প্রদেশ সরাসরি ইসলামী খিলাফতের নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়। এ সময় মুলতান, মানসুরা, আলোর, দেবল, সিন্দান, কাস্দার, কান্দাবীল প্রভৃতি স্থানে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এসব স্থানে বহু ইসলামী শিক্ষাবিদ বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এখানে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২] অভিবাসিত শিক্ষাবিদদের মধ্যে হাদীছ চর্চায় বিশেষভাবে অবদান রাখেন, মুসা ইব্নে ইয়াহ্ইয়া আল খাকাফী, ইয়াযিদ ইব্নে আবি কাব্শা আল দিমাশ্কী (মৃত্যুঃ ৭১৫ খ্রীঃ), মুফাদ্দাল ইব্নে মহাল্লাব (মৃত্যুঃ ৭২১ খ্রীঃ), আবু মুসা ইসরাইল ইব্নে মুসা আল বাসরী (মৃত্যুঃ ৭৭১ খ্রীঃ), আমর ইবনে মুসলিম আল বাহিনী (মৃত্যুঃ ৭৪০ খ্রীঃ), আল রাবী ইব্নে সাবীহ আল সাদী আল বাসরী (মৃত্যুঃ ৭৭৬ খ্রীঃ) প্রমুখ।[১৩]

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় সুলতান মাহমুদের (৯৯৮–১০৩০) ভারত আক্রমণ ও সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর (১১৭৪–১২০৫) উত্তর ভারত বিজয়ের মধ্য দিয়ে।[১৪] ঘুরীর ভারত বিজয়ের পর এদেশে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে শুরু হয়। ফলে, হিজাজ, ইরান, খুরাসান, বুখারা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিছ ভারতে আগমন করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীছ চর্চার বড় বড় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কেন্দ্রের মধ্যে দিল্লী, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালওয়া, খানদিশ, সিন্ধু, লাহোর, ঝাঁসী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, জৌনপুর, বিহার ও বাংলা সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এসব কেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অসংখ্য মুহাদ্দিছ ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীছের আলো ছড়িয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুহাদ্দিছগণের উত্তরসুরীগণও হাদীছ চর্চায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফলে, ভারতীয় হাদিছবেত্তাগণ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে মিশরীয় পণ্ডিত আল্লামা রশিদ রিযা বলেন, "বর্তমান বিশ্বে ভারতীয় মুসলমানগণ হাদীছ চর্চায় নেতৃত্ব প্রদান করছেন। প্রকৃত পক্ষে, ভারতীয় মুসলমানদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার বলে হাদীছ বিজ্ঞান পুণরুজ্জীবন লাভ করেছে।[১৫]

ভারত উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার সূচনাকাল ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা থাকলেও বাংলায় কখন, কিভাবে কাঁদের মাধ্যমে হাদীছ চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল কিংবা কখন এদেশে ইসলাম প্রবেশ করেছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য– উপাত্ত পাওয়া যায় না, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে সাধারণতঃ জনশ্রুতি, অনুমান ও এদেশে আগত ওলীগণ সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে এর উপরই আমাদের সমধিক নির্ভর করতে হয়। সাহাবাদের যুগেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল বলে কথিত আছে। ডঃ হাসান জামান উল্লেখ করেন, "উমরের (রাঃ) খিলাফতকালে (১৩–১৪ হিঃ) কয়েকজন প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের নেতা ছিলেন মামুন ও মুহায়মিন। এ যুগেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন হামীদুদ্দীন, হুসায়মুদ্দীন, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব। এ রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বই–কিতাব থাকত না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও লইতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁরা এ দেশের চলিত ভাষা শিখে এর মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক খাঁটি মুসলমান তৈরী করে তাঁদের সাহায্যে ইসলাম প্রচার করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে সফর করে প্রচারকার্য চালাতেন। এরপর আরো পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য হতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের বলা হত আবিদ। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে খান্‌কাহ বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেন।[১৬]

ডঃ হাসান জামানের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হযরত উমারের (রাঃ) খিলাফতকালে মামুন, মুহায়মিন, হুসায়মুদ্দীন, আব্দুল্লাহ, আবু তালিব ও হামীদুদ্দীনের নেতৃত্বে যে সকল প্রচারক বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁরা অবশ্যই সাহাবা অথবা প্রথম স্তরের তাবেয়ী ছিলেন। তাঁরা নিঃসন্দেহে রসুলের (সঃ) হাদীছ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ছিলেন। মহানবী (সঃ) এর বাণী প্রচারের নির্দেশ

পালনের উদ্দেশ্যে নব দীক্ষিত মুসলমানদের নিকট তাঁরা যে হাদীছ প্রচার করতেন, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে মিশর ও পারস্য থেকে আরো পাঁচটি দল বাংলাদেশে আসেন যাঁরা নিজ পাণ্ডিত্য ও কর্মগুণে আবিদ খ্যতি লাভ করেছিলেন তাঁরাও হাদীছ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই প্রচারক ও আবিদগণ নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামী তাহ্যীবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তাঁদের জীবন প্রণালীতে সুন্নাহর অনুসরণ নিশ্চিত করতে এবং ইসলামের মৌল উৎস কুরআন হাদীছের জ্ঞান প্রচার করার উদ্দেশ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে হাদীছও শিক্ষা দিতেন। তখন অবশ্য ব্যাপকভাবে হাদীছ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় ঐ সময়ের প্রচারকবৃন্দ মৌখিকভাবে হাদীছ শিক্ষা দিতেন। আর এভাবেই বঙ্গদেশে হাদীছ চর্চার সুত্রপাত হয়।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এদেশে ইসলাম প্রচার তথা হাদীছ চর্চার ইতিহাস অনেকটা তমসাচ্ছন্ন। বাংলায় হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে মূলতঃ সুফী, ওলী ও দরবেশগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। নূর মোহাম্মদ আজমী মনে করেন, যে সকল পীর আওলিয়া এখানে ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব, ইরাক, ইরান ও খোরাসান প্রভৃতি পশ্চিমী অঞ্চল থেকে আগত, সেখানে তখন ইল্‌মে হাদীছের বহুল প্রচার ছিল, আর তৎকালে পীর-আওলিয়াগণই করতেন বেশীরভাগে হাদীছ চর্চা। সুতরাং তাঁদের কেউ হাদীছ জানতেন না বা এখানে হাদীছ চর্চা করেননি। এরূপ ধারণা করা তাঁদের প্রতি অবিচার বৈ আর কিছুই নয়।[১৭]

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে সকল সুফী খ্রীষ্টীয় নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে আগমন করেন তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন হচ্ছেনঃ (১) শাহ সুলতান বল্‌খী (২) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (৩) বাবা আদম শহীদ (৪) মখদুম শাহদৌলা শহীদ (৫) শেখ জামাল উদ্দীন তাবরেযী (৬) শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুভশিকন (৭) শাহ মখদুম রুপোশ প্রমুখ।[১৮]

উল্লেখিত সূফীগণ যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন সে সব অঞ্চল হাদীছ চর্চার কেন্দ্র হিসেবে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাই স্বভাবতঃই ধারণা করা যায় যে, ঐ সুফীগণও হাদীছ শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে মহানবীর (সঃ) হাদীছও প্রচার করতেন।

বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে বঙ্গদেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীছ চর্চা শুরু হয়। মুসলিম শাসনের গোড়া থেকেই এদেশের সকল সুলতান ও আমীর উদারভাবে শিক্ষা প্রসারের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে এন, এন, ল'র মন্তব্য প্রণিদানযোগ্য। তিনি বলেন,

"The Muhammadan invasions of India marked the beginnings of momentous changes not only in the social and political spheres but in the domain of education and learning."[১৯]

মুসলমান শাসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্, সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ – এঁদের প্রত্যেকের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহও ঐ যুগের একজন বড় আলেম ছিলেন।[২০] এসকল বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী শাসকদের অর্থানুকূল্যে ও বদন্যতায় এদেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক বখতিয়ার খলজী বিজীত অঞ্চলসমূহে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্‌কাহ নির্মাণ করেন এবং তাঁর আমীর ও প্রশাসকদের প্রচেষ্টায়ও ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১] তারপর, সুলতান গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মণাবতী, দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন রাজশাহীর দরসাবাড়িতে, হোসেন শাহ গৌড়ে এবং শায়েস্তাখান ঢাকাতে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[২২] আবুল হাসানাত নদভী বাংলাদেশের অনেকগুলি মাদ্রাসার নামোল্লেখ করেছেন।[২৩] এগুলো হলোঃ (১) মাদ্রাসা-ই-রংপুর (২) মাদ্রাসা-ই-গিয়াসউদ্দীন (৩) মাদ্রাসা-ই-উমরপুর (৪) মাদ্রাসা-ই-টিলা (৫) মাদ্রাসা-ই-হুসেন শাহ (৬) মাদ্রাসা-ই-শায়েস্তা খান (৭) মাদ্রাসা-ই-মসজিদ ফয়দুল্লাহ (৮) মাদ্রাসা-ই-কাটরা (৯) মাদ্রাসা-ই-শীলাপুর (১০) মাদ্রাসা-ই-সদরউদ্দীন।

বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজধানী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও মুর্শিদাবাদ ছাড়াও মাহিসন্তোষ, সাতগাঁও, মান্দারন, বাঘা, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি স্থানে ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত মাদ্রাসাগুলি ছাড়াও আরো মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা ও ব্যক্তিগত ভবন শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। "মুসলিম শাসনামলে তিন স্থান থেকে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া হতো- মক্তব ও মাদ্রাসা, মসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি। এই শিক্ষারীতি ছিল তিন ধরনের (১) আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাঠক্রমসহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা (২) মাধ্যমিক শিক্ষা যা উচ্চ বিদ্যালয় ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে লাভ করা যায় (৩) মৌলিক জ্ঞানসহ প্রাথমিক শিক্ষা।"[২৪]

প্রাক ব্রিটিশযুগে মুসলিম শাসিত বঙ্গে যে সব মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও হাদীছ চর্চায় অবদান রেখেছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ আজো টিকে থাকলেও অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এন, এন, ল, যথার্থই বলেছেন, "Like Jaunpur, many a great Muslim University has now ceased to exist, leaving behind only a memory of its former glory. The days are past when the Indian Musalman universities, as also those of Dimashq, Baghdad, Nishapur, Cairo, Kairawan, Seville, Cordova were thronged by thousands of students, when a professor had often hundreds of hearers, and when vast estates set apart for the purpose maintained both students and professors."[২৫]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গীস খানের মধ্য এশিয়া আক্রমণের পর সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতে মুসলিম রাজারা তাঁদের গুনিজনের মর্যাদা ও সম্মান দেন, ফরে, কবি, স্থপতি, পণ্ডিত, সুফী প্রভৃতির দ্বারা ভারতের সুলতান, নবাব ও সম্রাটদের রাজসভা অলংকৃত হতে থাকে।[২৬]

বহিরাগত মুসলমান পণ্ডিতদের অনেকেই বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁরা বাংলার শাসকশ্রেণী কর্তৃক অকুণ্ঠ ও উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মীনহাজের বর্ণনা থেকে বলা যায় যে, গিয়াস উদ্দীন আওয়াজ খলজী- মাওলানা জালাল উদ্দীন গজনবীকে দরবার কক্ষে একটি ভাষণ দানের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা উপহার দেন। তিনি আমীর উমরাহকেও উদারভাবে উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করার নির্দেশ দেন।[২৭]

বঙ্গদেশে আগত পণ্ডিতদের অনেকেই ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মুহাদ্দিছ। বহিরাগত ও দেশীয় মুহাদ্দিছগণের প্রচেষ্টায় এবং রাজানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীছের পঠন-পাঠন ও চর্চা গৌরবজনকভাবে প্রসার লাভ করে। উল্লেখ্য আবশ্যক যে, ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হতো। লৌকিক বিজ্ঞাসমূহের সাথে সাথে কুরআন, হাদীছ, ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ্, ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয়গুলো পাঠ্যসূচীর আন্তর্ভূক্ত ছিল।[২৮] প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কুরআন, হাদীছ ও ফিকহ্ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রাগ্রসর বা উচ্চ স্তরের পাঠ্যসূচীতে কুরআনের তাফসীর ও হাদীছের তাশরীহ্ অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২৯] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভারতের দিল্লী, মানের, মুলতান, উচ্ প্রভৃতি শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে হাদীছের পাঠ্যসূচীতে আল্লামা সাগানীকৃত 'মাশারিফুল আনওয়ার' 'সুনানে আবী দাউদ', বাগাবীকৃত 'মাসাবীহ্ আল-সুন্নান', 'সহীহ বুখারী', 'সহীহ্ মুসলিম', 'সুনানে আরবায়া', 'সুনানে বায়হাকী', আল-মুস্তাদরাক', তাহাবীকৃত 'শরহ্ মায়ানী আল-আছার', 'মিশকাত আল-মাসাবীহ্', 'মুসনাদ আবু ইয়ালা', প্রভৃতি গ্রন্থ অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৩০] প্রাক্ ব্রিটিশ বঙ্গের মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্য তালিকায়ও উপযুক্ত হাদীছের গ্রন্থাবলী অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ১৩০০ খ্রীঃ) সোনারগাঁয়ে প্রথম সহীহানএর পাঠদান শুরু করেন।[৩১] মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযদান বখ্শ্ একডালায় সহীহ বুখারীর ৩ খণ্ডে অনুলিপি প্রনয়ন করেন।[৩২] মখদুম-উল-মূলক শেখ শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া মানেরী ইলম তা'বিল আল- হাদীছ, ইল্ম রিজাল আল-হাদীছ, ইলম মুসতালাহাত আল-হাদীছ ইত্যাদি হাদীছের সমস্ত শাখায় গম্ভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৩৩] তিনি সোনারগাঁয়ের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ বাইশ বছর অতিবাহিত করেন।[৩৪] এতে প্রমানিত হয় যে, সোনারগাঁয়ে হাদীছের সকল শাখায় শিক্ষাদান করা হত। এছাড়া গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মাদ্রাসায় 'মাশারিকুল আনওয়ার' ও 'সুনানে আবু দাউদ' পাঠদান করা হতো।

বঙ্গের মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিকস্তর থেকে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা পর্যায়ের সিলেবাসে হাদীছ শাস্ত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছিল এবং সকল শিক্ষার্থীকেই তা অধ্যয়ন করতে হতো। ফলে সে সময় বাংলাদেশ হাদীছ চর্চায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে।

প্রাক ব্রিটিশ বঙ্গের কয়েকটি প্রখ্যাত হাদীছ চর্চা কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা গেল।

লক্ষণাবতীঃ

মোহাম্মদ বখতিয়ার বঙ্গরাজ্য অধিকার করে লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং সেখানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫] তাঁর এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী শাসনকর্তাগণও অনুসরণ করেন। ফলে, লক্ষ্মণাবতী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বর্হিদেশেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা গেল।

১। কাযী রুকন উদ্দীন সমরকন্দী

কাযী রুকনউদ্দীন সমরকন্দী বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সমরকন্দের বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন। হাদীছ ও ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। হানাফী মযহাবের ফিকহ্ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি আলী মার্দান খলজীর সময়ে (১২১০-১২১৩ খ্রীঃ) বাংলায় আগমন করেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল ইরশাদ' ও 'আল-খিলাফ ওয়াল জাদাল' গ্রন্থদ্বয় বেশ প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে তিনি স্বদেশ বুখারায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৬১৫ হিঃ ১২১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই ইনতিকাল করেন।[৩৬]

মীনহাজ-ই-সিরাজ

তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় ছিল কাজী উল-কুজ্জাত, সদর-ই-জাহান আবু উমর ওয়া মীনহাজ-উদ-দীন ওসমান বিন সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ আফস্যাহ-উল-আজম উজবাত-উজ-জামান ইবন-ই-মীনহাজ-উদ-দীন আল জোজজানী। তিনি কাজী মীনহাজ নামে সমধিক পরিচিতি।[৩৭] মীনহাজ-ই-সিরাজ জন্মগ্রহণ করেন ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ইতিহাসসহ ইসলামী শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কাজীর পদ এবং বড় বড় মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। উচ্, ফিরোজীয়া ও দিল্লীর নাসিরিয়া মাদ্রাসায় তিনি দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মীনহাজ ১২৪২-১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান করেন।[৩৮] ইতিহাস সংক্রান্ত তবকাত-ই-নাসিরী তাঁর অনবদ্য রচনা। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে সুনানে আবু দাউদ থেকে হাদীছের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল কত গভীর।[৩৯] মীনহাজ ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

এঁদের ছাড়া, খ্যাতনামা পণ্ডিত জালালউদ্দীন গজনবী, কাজী আসীর ও অন্যান্য হাদীছ বিশারদদের আগমনে লক্ষণাবতীর জ্ঞান পিপাসুগণ পরিতৃপ্ত হন।

সোনারগাঁওঃ

ইসলামী শিক্ষাসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ভারত ছাড়াও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হাদীছ ও ফিক্‌হ চর্চার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠানটি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে। এখানে যাঁরা হাদীছের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা গেল।

১। মাওলানা শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা আল বুখারী

শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ ইত্যাদি ইসলামী শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান অর্জন ছাড়াও রসায়ন, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য।[৪০] সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বের প্রারম্ভে (১২৬০ খ্রীঃ) তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বিহারের মানের নগরীতে উপনীত হন। তারপর সেখান থেকে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি ১২৭৪ থেকে ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন।[৪১]

শেখ আবু তাওয়ামা বাংলাদেশে সর্ব প্রথম সোনারগাঁয়ে সহীহান অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর শিক্ষা দান করেন।[৪২] এদিক দিয়ে আবু তাওয়ামাকে বঙ্গে হাদীছ চর্চার পথিকৃৎ বলা যায়।

আবু তাওয়ামার জ্ঞান-গরিমা বাংলা ভারত অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানানুরাগীর দল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমাতে থাকে। তাঁর অসংখ্য কৃতি ছাত্রের মধ্যে শেখ শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া মানেরী, শেখ বদরুদ্দীন যাহেদয়ইন ইরাকী ও ইব্রাহীম দানেশবন্দ এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মহান মনীষী ১৩০০ খ্রীঃ সোনারগাঁয়ে ইন্‌তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্ত করা হয়।

২। মখদুম-উল-মুলক শেখ শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া মানেরী

শেখ শরফউদ্দীন আহমদ মানেরী ছিলেন আবু তাওয়ামার মানস সন্তান এবং জামাতা। তিনি বিহারের মানের নগরীতে ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইয়াহইয়া এবং মাতার নাম রাবেয়া। তিনি মাত্র পনর বছর বয়সে আবু তাওয়ামার ছাত্র হয়ে সোনারগাঁয়ে আসেন এবং দীর্ঘ পনর বছর এখানে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে বুখারী মুসলিম সহ হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইলমে তাবিল আল-হাদীছ, ইলমে রিজাল-আল হাদীছ, ইলমে মুসতালাহাত আল-হাদীছ প্রভৃতি হাদীছের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। সহীদ্বয় ও মুসনাদে আবু ইয়ালা সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। তিনি তাঁর রচনাবলীর অসংখ্য স্থানে বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আবু ইয়ালা, শরহ মাসাবীহ্ এবং মাশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থ থেকে প্রচুর হাদীছ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শরফুদ্দীন মানেরী ব্যাপক দেশভ্রমন করেছিলেন। তিনি মানেরী নগরীতে হাদীছ চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্ব প্রথম তিনিই বিহার রাজ্যে বুখারী, মুসলিম শরীফের দরস প্রদান করেন।[৪৩] তিনি ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে মানেরে ইনতিকাল করেন।

৩। তকিউদ্দীন ইব্নে আয়নুদ্দীন

তিনি ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা নসরত শাহের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হাদীছ ও ফিক্হশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সোনারগাঁয়ে ৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪৪] তকিউদ্দীন হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান রাখতেন যে, তিনি 'কুদওয়াতুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন' উপাধিতে ভুষিত হন।[৪৫]

এঁদের ছাড়া, যয়নুদ্দীন, ইব্রাহীম দানেশমন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আবু তাওয়ামার ইনতিকালের পর ইব্রাহীম দানেশমন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

পাণ্ডুয়াঃ

নানা কারণে পাণ্ডুয়া এ উপমহাদেশে বিখ্যাত হয়ে আছে। ইলিয়াস শাহ, জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ, রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ও জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের মত শিক্ষিত ও জ্ঞানী মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল এই পাণ্ডুয়া। এই স্থানটি সে সময়ে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেযী, শেখ আখী সিরাজউদ্দীন উছমান, শেখ আলাউল হক, শেখ নূর কুতুবুল আলম শেখ জাহিদ এবং আরো বহু সূফী মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও পণ্ডিতদের কার্যাবলীর কেন্দ্র ছিল এই পাণ্ডুয়া। এই কেন্দ্রের কয়েকজন হাদীছবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া গেল।

১। শেখ আখী সিরাজ উদ্দীন উছমান পাণ্ডুবী বাঙালী (মৃত্যুঃ ১৩৫৭ খ্রীঃ)

আখী সিরাজ পাণ্ডুয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী সন্তান।[৪৬] ইলমে মারেফত লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীতে নিযামউদ্দীন আওলিয়ার দরবারে গমন করেন। নিযাম উদ্দীন তাঁকে প্রথমে কুরআন-হাদীছ অধ্যয়নের নির্দেশ দিলে তিনি প্রখ্যাত তর্কবাগিস, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছ ফখরুদ্দীন জাররাদ (মৃত্যুঃ ১৩৪৭ খ্রীঃ) এর নিকট দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেন। ফখরুদ্দীন একজন নামকরা পণ্ডিত ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। প্রসিদ্ধ হাদীছের গ্রন্থ মাশারিকুল আনওয়ার তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এতে প্রতিয়মান হয় যে, আখী সিরাজ ফখরুদ্দীনের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেছেন।[৪৭] তিনি রুকনউদ্দীনের নিকট কাফিয়া, মুফসসল, কুদুরী, মাজ্মা-আল-বাহ্রায়ন প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পাণ্ডুয়াতে প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীসহ একটি মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৮] আখী সিরাজ সর্ব জনমান্য দরবেশ ছিলেন। নিযাম উদ্দীন আওলিয়া তাঁকে মহাসম্মান-সুচক 'আয়নহ হক্ক হিন্দুস্থান' বা ভারত দর্পন উপাধি প্রদান করেন।[৪৯] ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন।

উচ্চের প্রখ্যাত সুফী ও মুহাদ্দিছ মখদুম-ই-জাহানিয়ানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর উদ্দেশ্যে বিহার গমন করেন। সেখান থেকে তিনি পাণ্ডুয়াতে আসেন। তিনি এখানে চার বছর অবস্থান করেন। জাহাঙ্গীর একজন বড় ধরনের আলেম, সূফী ও পর্যটক ছিলেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, আকায়েদ, তাসাউফ, ব্যাকরণ, সিরাত প্রভৃতি বিষয়ের উপর তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে দেয়া গেল।
(১) মুখতাসার ফী উসুলুল ফিক্হ (২) শরহ আওয়ারিফিল মা'য়ারিফ (৩) আশরাফুল আনসাব (৪) কাওয়ায়েদ আল-আকায়েদ, কান্য-আল-দাকায়েক, এছাড়া, তাঁর রচিত আরো গ্রন্থ মালফয়াত ও মাকতুবাত রয়েছে। তিনি ৮০৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁকে উচ্চেতে সমাহিত করা হয়।[৫৭]

৬। শেখ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযদান বখ্শ

শেখ মুহাম্মদ ইয়াযদান বখশ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) সমকালীন একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। খাজাগী শিওয়ানী নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আজরাবাইজানের অধিবাসী। তৎকালীন বাংলার রাজধানী একডালায় বসে তিন খণ্ড সহীহ বুখারীর অনুলিপি প্রস্তুত করেন।[৫৮] ৯১১ হিজরীর ২রা জমাদী আল-আওয়াল অর্থাৎ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তিনি এই প্রতিলিপি তৈরীর কাজ সমাপ্ত করেন।[৫৯]
পাটনার বাকীপুর ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে এটা আজো সংরক্ষিত আছে।

বাঘাঃ

বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাঘাতে একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা ছিল। এখানে আবাসিক সুযোগসহ ছাত্রদেরকে পর্যাপ্ত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা শাহ মুয়ায্যম ওরফে শাহদৌলা, তাঁর পুত্র হামিদ দানিশমন্দ ওরফে হাওদা মিয়া ও মাওলানা শের আলী প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বাঘার এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীছ ও ফিকহসহ ইসলামী অভিজ্ঞানের সকল বিষয়ের উপর পাঠদান করা হত। বাংলার ও বর্হিবাংলার শিক্ষার্থীগণ উচ্চতর ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করতেন।[৬০]

মাহিসন্তোষঃ

রাজশাহী জেলার মাহিসন্তোষ তৎকালে ইসলামী শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল। এখানে ইলমে দীনের বিভিন্ন শাখায় ও মারিফাত তত্ত্বের উপর চর্চা হতো। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত তাকীউদ্দীন ইব্নুল আরাবী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। বিখ্যাত হাদীছবিদ শরফুদ্দীন আহমদ মানেরীর পিতা ইয়াহইয়া মানেরী এখানে শিক্ষালাভ করেন।[৬১]

নাগোরঃ

পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার নাগোর ছিল হাদীছ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। হাদীছের বিশিষ্ট গ্রন্থ আনীসুল গুরাবা-এর রচয়িতা শেখ নূর কুতুবুল আরম এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ এখানে অধ্যায়ন করেন।[৬২]

২। শেখ নুরুল হক কুতুবুল আলম

নূর কুতুবুল আলম পাণ্ডুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তিনি হামীদুদ্দীন নাগোরীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন এবং সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। বহুগ্রন্থ ও রাসায়েল প্রণেতা শেখ নুর কুতুবুল আলম 'আনীসুল গুরাবা' নামে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ একটি হাদীছের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৫০] তাঁর তত্ত্বাবধানে পাণ্ডুয়া একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। রফিকুল আরেফীনের লেখক হুশাম উদ্দীন মানিকপুরী, লাহোরের শেখ কাকু, আজমীরের শামসুদ্দীন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ পাণ্ডুয়া কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ফসল।[৫১] তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতনৈক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে তিনি ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

৩। মখদুম-ই-জাহানিয়ান

মখদুম-ই-জাহানিয়ান সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন হুসাইন ইবনে আহমদ আল-হুসইনী আল বুখারী ১৩০৭ খ্রীঃ উচ্চে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ শহর উচ্চেতে কাযী বাহাউদ্দীন উচ্চী ও মুহাদ্দিছ জালাল উদ্দীনের নিকট শিক্ষা লাভ করার পর বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি আল্লামা সাগানীর সংকলিত বিখ্যাত হাদীছের গ্রন্থ মাশারিকুল আনওয়ার ও মাসাবিহ আল-সুনান অধ্যয়ন করেন। তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সুফী ও মুহাদ্দিছ ছিলেন।[৫২] তিনি ব্যাপক দেশ ভ্রমন করে ব্যপদেশে পাণ্ডুয়াতে আগমন করেন। পাণ্ডুয়াতে তিনি বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তিনি পাণ্ডুয়ার স্বনামধন্য পণ্ডিত ও সুফী আলাউল হকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান এবং স্বয়ং ইমামরূপে জানাজা সম্পন্ন করেন।[৫৩] মখদুম-ই-জাহানিয়ান ১৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে উচ্চে সমাহিত করা হয়।

৪। শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেযী

শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেযী সালতানাত যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে পাণ্ডুয়াতে আগমন করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত সুফী ও পণ্ডিত। প্রথমে আবু সাঈদ তাবরেযীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাঈদ তাবরেযীর মৃত্যুর পর তিনি বিখ্যাত সুফী ও মুহাদ্দিছ বাগদাদের শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষাকেন্দ্রে সাত বছর অতিবাহিত করেন।[৫৪] জালাল উদ্দীন তাবরেযী ভারতের অন্যতম শ্রষ্ঠ সুফী ও মুহাদ্দিছ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর সতীর্থ ছিলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁরা একসঙ্গেই ভ্রমন করতেন।[৫৫] বাহাউদ্দীন যাকারিয়া হাদীছ অধ্যয়নের জন্য মক্কা-মদীনা, খুরাসান, বুখারা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।[৫৬] সঙ্গতঃ কারণেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জালাল উদ্দীন তাবরেযী হাদীছশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

৫। শেখ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী

সাইয়্যেদ আল্লামা আশরাফ ইবনে ইব্রাহীম আল-সিমনানী সিমনানের রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। অল্প বয়সে সাত কিরাতসহ পবিত্র কুরআন হিফয্ করেন। জ্ঞানের অন্বেষায় রাজকার্য পরিত্যাগ করে ভারতে আগমন করেন। তিনি

শেখ হামীদুদ্দীন নাগোরী, শেখ আলী নাগোরী ও শেখ ফরীদুদ্দীন মাহমুদ নাগোরী এই কেন্দ্রে হাদীছ চর্চা ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৬৩]

বুহারঃ

বর্ধমান জেলার বুহার হাদীছ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। লক্ষ্মৌর বিখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল আলী বাহরুল উলুম (মৃত্যুঃ ১২২৬ হিঃ) সম্ভবতঃ ১১৭৮ হিজরীতে এখানে হাদীছের দরস প্রদান করতেন। তিনি উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আরকানে আরবায়া' হাদীছশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক।[৬৪]

এছাড়া ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মঙ্গলকোট, সাতগাঁও ইত্যাদি স্থানে হাদীছের চর্চা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা অব্যাহত ছিল।

ঢাকার শেখ ফরীদ বাঙালী[৬৫] (৯৩৬-১০১৪ হিঃ) ও শাহনুরী বাঙালী[৬৬] খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন। শাহ্নুরী অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে ঢাকার শায়েস্তা খান মাদ্রাসার একজন কৃতীছাত্র ছিলেন।[৬৭]

মাওলানা মাজ্দুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন শাহ্ জাহানপুরী ছিলেন বঙ্গে মুসলিম শাসনের পতন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতাতে যে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।[৬৮]

খায়বার ও গোমাল গিরিপথ দিয়ে আগত মুসলিম বিজেতাগণ ভারতে স্থায়ীভাবে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ফলে এদেশের বিভিন্নস্থানে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিষয় ইল্মে হাদীছের ব্যাপক গবেষণা, প্রকাশনা, অধ্যয়ন, অনুশীলন ও প্রচারে উপমহাদেশের অন্যান্য রাজ্যের মত বঙ্গদেশেও গৌরবাত্মক ভূমিকা পালন করে। বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলিম শাসকদের ঔদার্যে এবং বহিরাগত সুফী-পণ্ডিতদের আন্তরিকতায় এখানে অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সিলেবাসে হাদীছের পঠন-পাঠন আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদীছ চর্চার কেন্দ্র-দিল্লী, উচ্, মুলতান, নিশাপুর, সমরকন্দ, বুখারা, বাগদাদ প্রভৃতির সাথে সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, লক্ষাবতী, বাঘা ইত্যাদি বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামান থাকায় এগুলি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং এসব শিক্ষাকেন্দ্রে বর্হিবিশ্বের অসংখ্য ছাত্রসহ অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য আগমন করেন। এখানকার দরগাহে বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ, মুসনাদে আবি ইয়ালা, মিশ্কাতুল মাসাবীহ, মাশারিকুল আনওয়ার প্রভৃতি হাদীছের গ্রন্থাবলী পড়ানো হতো। হাদীছ শাস্ত্রের সকল শাখায় এখানকার ছাত্ররা বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হতো।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসাসমূহের অনুসঙ্গে বড় বড় লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক বৃটিশযুগে এদেশে হাদীছ চর্চার এত অগ্রগতি হয়েছিল যে, মুহাদ্দিছগণ এ সময়ে বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতসহ হাদীছের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আবু তাওয়ামা, মখদুম-উল-মুলক শরফুদ্দীন, মখদুম জাহানিয়া, মুহাম্মদ ইয়াযদান বখ্‌শ প্রমুখ বহিরাগত মুহাদ্দিছগণের সাথে সাথে আখী সিরাজ, নুর কুতুবুল আলম, শেখ ফরদী, আব্দুল হামীদ, শেখ শাহনুরের মত দেশীয় মুহাদ্দিছবৃন্দও হাদীছ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন।

বস্তুতঃ এদেশে পবিত্র হাদীছের চর্চা ও অনুশীলনের ইতিহাস ইসলামের আগমনের সূচনা লগ্নের ইতিহাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। হাদীস চর্চার ইতিহাসকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। এদেশে ইসলামের প্রাথমিক শুভাগমনের প্রকৃত ইতিহাস যেদিন রচিত হবে সেদিনই এদেশে হাদীস চর্চার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের দ্বারও যথাযথরূপে উন্মোচিত হবে। বঙ্গদেশে বৃটিশ অধিকারে আসার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ছিল মুসলিম শাসনাধীন। মুসলিম শাসকগণ ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রসারে যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মুসলিম শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আরব, পারস্য ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত মুসলিম প্রচারক, মুহাদ্দিছ ও পীর-মাশায়েখগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা পবিত্র হাদীস চর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সে ঐতিহ্যের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে- এ আশাবাদ পোষণ করার কারণ এদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

টীকা ও তথ্য নির্দেশঃ

১। *আল-কুরআন,* সূরা আল-নহল, আয়াত ৪৪।

২। ডঃ মুহাম্মদ ইজাজ আল-খতীব, *আস সুন্নাহ কবলাত তাদবীন,* (আবদীনঃ মাকতাবা ওয়াহ্‌বা, ১৯৬৩), পৃঃ ৬, ডঃ উমর ইবনে হাসান, *আল ওয়াদ'উ ফিল হাদীছ,* ২য় খণ্ড, (দামেশ্‌কঃ মাকতাবাতুল গাযযালী, ১৩৯৫ হিঃ), পৃঃ ৩৭, মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* (ঢাকাঃ কুতুব খানায়ে রিশিদিয়া, ১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৩।

৩। *মিলকাত আল-মাসাবীহ,* (করাচীঃ আসাহহুল আতাবি অ.বি.) পৃঃ ৩২।

৪। ঐ, পৃঃ ৩৫।

৫। ঐ, পৃঃ ৩৬।

৬। *সহীহ বুখারী,* ২য় খণ্ড, (দিল্লীঃ আসাহহুল মাতাবি, ১৩৫৭ হিঃ), পৃঃ ৬৩২।

৭। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৬), পৃঃ ১৬৩-৭৫।

৮। *সুনানে নাসাঈ,* ২য় খণ্ড, (দিল্লীঃ মাকতাবা রহিমিয়া তা. বি.) পৃঃ ৫২।

৯। ঐ, পৃঃ ৫২।

১০। ডঃ এসহাক, *ইণ্ডিয়ান কন্টিবিউশন টু দি ষ্টাডি অব হাদীস লিটারেচার,* (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৭৬) পৃঃ ৫।

১১। বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান* (বৈরুতঃ দারওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮), পৃঃ ৪১৬।

১২। ডঃ এসহাক প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।

১৩। ঐ. প্রাঃ ২৩-২৭।

১৪। ঐ. পৃঃ ৪৩।

১৫। ঐ, পৃঃ ৯; মুহাম্মদ ফুয়াদ *মিফতাহ্‌কানুনুস্ সুন্নাহ,* (কায়রোঃ ১৯৩৪) পৃঃ মুকাদ্দিমা, ৩ থেকে উদ্ধৃত।

১৬। ডঃ হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭) পৃঃ ২১২।

১৭। নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস,* (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী,১৯৮৬) পৃঃ ২৫৯।

১৮। আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম,* (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃঃ ৬৪। 'মুসলমানদের বিজয়ের আগে যে সব সুফী এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন - ডঃ আব্দুল করিম, *বাঙলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত),* বংগানুবাদ মোকাদ্দেসুর রহমান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃঃ ১৩০-১৭৫, আব্দুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ,* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ২০-২১, ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, *হিস্টোরি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন-ইন-বাঙলাদেশ,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১০-১১।

১৯। এন. এন. ল. *প্রমোশন অব লারনিং ইন ইন্ডিয়া,* (লন্ডনঃ লংম্যানসগ্রীন এণ্ড কোং, ১৯১৬, পৃ xiv

২০। ডঃ এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃঃ ১৮।

২১। মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী,* আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনুদিত, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃঃ ২৯।

২২। ডঃ এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃঃ ৪৭–৫২; ডঃ মুঃ সিকন্দর আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত বর্তমান,* (ঢাকাঃ জাকিয়া পাবলির্শাস, ১৯৯১। পৃঃ ২৪।

২৩। আবুল হাসানাত নদভী, *হিন্দুস্তান কি কাদীম ইসলামী দরসগাহী,* (আজমগড়ঃ ১৯৩৬), পৃ. ৫৩–৩০

২৪। এস এম জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা,* রশীদ আল ফারুকী কর্তৃক অনুদিত, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৮, পৃ. ৯

২৫। এন. এন. ল. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৫–১০৫

২৬। দীপক কুমার রায়, *ভারতের মুসলিম যুগের সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা,* কলিকাতাঃ নবজাতক প্রকাশনা, ১৯৮৭), পৃ. ১১।

২৭। মীনহাজ–ই–সিরাজ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৬–৫৮।

২৮। ডঃ এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২১–২২, মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭), পৃ. ৩৫।

২৯। ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২–৫৭।

৩০। ডঃ এসহাক *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৫–৭৯।

৩১। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ৪।

৩২। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৬।

৩৩। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৭।

৩৪। ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২; ডঃ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪ , ডঃ এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৭।

৩৫। মীনহাজ–ই–সিরাজ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯।

৩৬। ডঃ এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯০–৯১। কাযী রুকন উদ্দীন সমরকান্দীকে বুখারার প্রখ্যাত হানাফী আইনবিদ সমরকন্দের অধিবাসী কাযী রুকন উদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ আল আমাদী বলে কেউ কেউ সনাক্ত করে থাকেন। কামরুপের (আসাম) জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত 'অমৃতকুন্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি তিনি আরবীতে (এবং ফার্সীতেও) অনুবাদ করেছিলেন বলে ধারনা করা হয়। দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ পৃঃ ৩৮৮, মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্টোরি অব দ্যা মুসলিমস অব বেংগল,* খণ্ড ১ বি, (রিয়াদঃ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৫) পৃ. ৮৪৪।

৩৭। মীনহাজ–ই–সিরাজ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৫।

৩৮। ঐ পৃ. ২৪৬।

৩৯। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২।

৪০। এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৩।

৪১। ডঃ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী–সাধক, (ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭), পৃ. ২৫৯, এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৫।

৪২। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪।

৪৩। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬–৬৯, মুফতী আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪, ডঃ এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬–১১৭।

৪৪। আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, (হায়দ্রাবাদঃ দায়েরাতুল মায়ারিক আল–উছমানিয়া, ১৯৬৮). পৃ.

৪৫। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৪৬। ড. এম এ রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০–২১, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৮।

৪৭। নূর মোহাম্মদ আজমীঃ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১।

৪৮। এস এম জাফর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৮, ডঃ এম, এ, রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২০–১২৫।

৪৯। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, *বংগে সুফী প্রভাব*, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃঃ ১০৮।

৫০। আব্দুল হই, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮।

৫১। ডঃ এম, এ, রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৯।

৫২। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪।

৫৩। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৫৪। ডঃ এম, এ, রহিম *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৫৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ* (ফেনীঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৯), পৃ. ২৭১, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৫৬। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৫৭। আব্দুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪–৩৬।

৫৮। ডঃ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

৫৯। শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, (কলিকাতাঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৮), পৃ. ৩৫১।

৬০। ডঃ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০–৫১।

৬১। ডঃ এ. এম. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫; ডঃ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৬২। গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ–উস সালাতিন*, বাংলা অনুবাদ–বাংলার ইতিহাস, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), পৃ. ৮৫; আব্দুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮।

৬৩। নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

৬৪। আব্দুস সাত্তার, *তারিখ–ই–মাদ্রাসা–ই–আলিয়া*, মোস্তফা হারুন অনূদিত–আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮০) পৃ. ৩২, নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬।

৬৫। নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

৬৬। মুফতী আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪; নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

৬৭। আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯–৩১।

৬৮। আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮–৪১; নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

বলকান যুদ্ধে 'দি কমরেড' পত্রিকার ভূমিকা (১৯১২-১৪)

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠিত উসমানীয়া[১] রাজ্য কালক্রমে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের নিউক্লিয়াস হিসাবে কাজ করেছিল জেনিসারী সৈন্য বাহিনী। খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ দখলে আনার পর খ্রীষ্টান বালকদের ধর্মান্তরিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। ইউরোপে উসমানীয় এলাকাসমূহ ছিল খ্রীষ্টান অধ্যুষিত। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পর এই সব অঞ্চলে স্বাধীনতার স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে গ্রীস ১৮৩২ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। অন্যদিকে বলকান অঞ্চলের বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে। ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি সমুহ তুরস্ককে সমর্থন করে এবং রাশিয়াকে পরাজিত করে। তা সত্ত্বেও রাশিয়া আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার না করে তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী তুর্কী খিলাফত রক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ১৮৮০ র দশকে তুরস্ক–রাশিয়া সংঘর্ষের সময়ে কলিকাতা থেকে কিছু সংবাদ – সাময়িকী প্রকাশিত হয়। যেগুলো প্যান–ইসলাম ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়।[২] এইগুলোর মধ্যে ছিল *মুহাম্মদী আখবার* ও *আখবারে এসলামিয়া।* এই সাময়িকীগুলো তুর্কী খিলাফতের সমর্থনে জনমত সংগঠন করে এবং যুদ্ধের খবরাখবর পরিবেশন করে। নব্য তুর্কী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯০৮ সালে তুরস্কে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও জামাল পাশার সমন্বয়ে যে মন্ত্রী সভা কাজ করে সেটি ছিল মূলতঃ যুদ্ধংদেহী মনোভাব সম্পন্ন। বলকান রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা স্পৃহা ও রাশিয়ার প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় বলকান যুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪–১৮) শুরু হওয়ার পূর্বে তুরস্ক জার্মানীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের ফলে নব্য তুর্কী সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় সহমর্মিতা প্রদর্শন করে। ১৯১২–১৩ সালে সংঘটিত দুটি বলকান যুদ্ধে তুরস্ক তার প্রতিবেশী বলকান শক্তির কাছে অধিকাংশ ইউরোপীয় ভূখণ্ড হারায়।[৩] এই শক্তিগুলো ছিল বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো। বলকান সংকটের সময়ে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮–১৯৩১) *দি কমরেড* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তুর্কী সরকারের জন্য জনমত সংগঠিত করেন। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

এই পত্রিকাটি বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বলকান যুদ্ধের উদ্বাস্তু ও আহতদের জন্যে অর্থ সংগ্রহের প্রচারণা চালায়। এই প্রবন্ধে *দি কমরেড* পত্রিকা বলকান সংকটে যে ভূমিকা পালন করেছিল তার মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পত্রিকাটির ভূমিকা মূল্যায়নের পূর্বে *দি কমরেড* সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

মওলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের[৪] মধ্যে অধিক খ্যাতিমান। সেই সময়ের বিখ্যাত আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে মোহাম্মদ আলী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। অগ্রজ শওকত আলীর প্রেরণায় তিনি ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেন এবং একজন উদ্যমী, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভারতে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।[৫] দেশে মোহাম্মদ আলী বরোদার গায়কোয়াড় এর অধীনে চাকুরী নেন। কিন্তু সাংবাদিকতা শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরী ছেড়ে দেন। সাংবাদিকতায় ঝুঁকে পড়ার কারণ হিসাবে তিনি লিখেন, "Mr. Lovat Fraser* had first invited me to contribute. The reason which so irresistibly impelled me to take up journalism has that the affairs of my community just at that juncture made it the only avenue through which I could hope to reach a place."

১৯১০ সালে মওলানা আলী কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতি সহমর্মিতা এবং সমর্থন দানের উদ্দেশ্যে *দি কমরেড* সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত পত্রিকাটি প্রসঙ্গে মওলানা আলী লিখেন, "I had been dreaming for some time dreams of a united faith of India. The Comrade- 'Comrade of all and partisan of none'----- was to be the organ that was to voice views, and prepare to Musalmans to make their proper contribution to territorial patriotism without abating a jot of the fervor of their কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী থাকার কারণে এই নগর থেকেই তিনি সাপ্তাহিক *দি কমরেড* প্রকাশ করেন। বলকান অঞ্চলে তুর্কীদের সামরিক বিপর্যয় মোহাম্মদ আলীকে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "My feeling during the disastrous war in the Balkans were at one time so overpowering that I must confess I even contemplated suicide." পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মওলানা আলী *দি কমরেড* এর মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের জন্য জনমত গঠন, অর্থ সংগ্রহ এবং যুদ্ধের খবরাখবর পরিবেশন করে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাংবাদিকতা সরকারের কাছে সুখকর ছিল না। কারণ *দি কমরেড* ছিল বৃটিশ বিরোধী। এই বিরোধীতার কারণে সরকার *দি কমরেড* কে বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিল। 'Come over to Macedonia and help us' শীর্ষক ইশতেহার প্রকশের জন্য সরকার *দি কমরেড* এর উপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নেয়। তা সত্ত্বেও মওলানা মোহাম্মাদ আলী ধৈর্য চ্যুতি না ঘটিয়ে *দি কমরেড* এর মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের জন্য প্রচারণা অব্যাহত রাখেন।

* মিঃ ফ্রেসারের "Times of India" তে "Thoughts on the Present discontent" ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং তদানিন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোর প্রশংসা লাভ করে।

দি কমরেড ভারতীয় মুসলমানদের থেকে তুর্কী রিলিফ ফাণ্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহের সাম্প্রতিক হিসাব প্রকাশ করতে থাকে। বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সারা ভারতের মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ চলতে থাকে। এলাকা ভিত্তিক এজেন্ট এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়। *দি কমরেড* পত্রিকা বিভিন্ন সংখ্যায় অর্থ সংগ্রহের সংবাদ পরিবেশিত হত। এই ধরনের একটি সংবাদ ছিল নিম্নরূপ[৯]ঃ

স্থানের নাম	অর্থ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান	অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ	তুরস্কে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম ও ব্যক্তি	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
করাচী	শেঠ হাজী আবদুল্লাহ্ হারুন	৬৯৫ ৮ আনা	–	–	২২৪০	জানুয়ারী ১৩ তারিখ ১৯১২ তে সমাপ্ত সপ্তাহে প্রাপ্ত অর্থ
লক্ষ্মৌ	মজলিস -ই-মোয়া য়েপ উল ইসলাম	–	–	১৯১১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তুরস্কের গ্রাণ্ড উজীরের কাছে প্রেরিত।		

অর্থ সংগ্রাহক হিসাবে করাচীতে শেঠ হারুন, রেংগুনের হাজী আহমদ দাউদ সাহেব প্রমুখ অগ্রগণ্য ছিলেন। তুরস্কে টাকা পাঠানোর পর *দি কমরেড* পত্রিকা ঘোষণার মাধ্যমে তা পাঠকের কাছে পৌছে দিত। পত্রিকার ঘোষণার ভাষা ছিল[১০]----

"We are glad to announce that our first installment of Rs. 6000/- had been forwarded to the Grand vizier of Turkey. A Demand Draft for £400 starling of the Deutsch Asiatich Bank of Calcutta on the Deutsche Bank Filialo of Constantinople has been sent for us by the Bank of Bengal, Calcutta to the Imperial Ottoman Bank with instructions to pay the money to H. E. the

Grand vizier for the war sufferers. Lists of subscribers are sent regularly to the Grand vizier.

যে ব্যাংকটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরিত হয়েছিল সেটি ছিল জার্মান ব্যাংক। বলকান যুদ্ধের আগে ও পরে জার্মানী ছিল তুরস্কের মিত্র। সেই সুবাদে তুরস্কে জার্মান ব্যাংক কাজ করছিল।

দি কমরেড ভারতীয় মুসলিমদের যে কোন উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। বলকান যুদ্ধের ফলে আহত এবং উদ্বাস্তুদের জন্য প্রেরিত মেডিকেল মিশনের কার্যকলাপ এমনকি তাদের যাত্রা সম্পর্কেও পত্রিকাটি ফলো আপ নিউজ করেছে। 'দি অল-ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশন' নামে একটি চিকিৎসক দল তুরস্কে যাত্রা করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন খ্যাতনামা মুসলিম নেতা ডাঃ এম, এ, আনসারী।[১১] এই মেডিকেল মিশন সমুদ্র পথে তুরস্ক রওয়ানা হয়। সমুদ্র পথে এই দলের দৈনন্দিন কার্যাবলী ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত। ডাঃ আনসারী দলের লোকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সকাল ৮টা থেকে মেডিকেল প্রশিক্ষণ শুরু হত এবং শেষ করা হত সন্ধ্যা ৬টায়। দলের অন্যান্য চিকিৎসকরা ছিলেন ডাঃ ফাইজী, ডাঃ মোহাম্মদ উল্লাহ, ডাঃ নাইম, ডাঃ বারী। জাহাজ থেকে চিঠির মাধ্যমে ডাঃ আনসারী *দি কমরেড* পত্রিকায় মেডিকেল টিমের দৈনন্দিন কার্যাবলী অবহিত করতেন। *দি কমরেড* ডাঃ আনসারী লিখিত চিঠি ছাপিয়ে পাঠকদের অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১২]

বলকান যুদ্ধের সময় ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও ইউরোপ প্রবাসী মুসলিমগণ সক্রিয় ছিলেন। তুর্কী খিলাফত এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদের সাহায্যের জন্য লণ্ডন ভিত্তিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সকলের প্রতি আহ্বান জানায়। এই সোসাইটির আবেদনটি 'দি কমরেড' প্রকাশ করে। 'বৃটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'স আপিল' শিরোণামে *দি কমরেড* লিখে[১৩]---... The British Red Crescent Society has already sent to Turkey one Hospital under the direction of colonel Surtees, C. B. Mvo, Dso. Consisting of two surgeons, three dressors, six lady nurses and four orderlies; and proposes to send another as soon as funds permit, to attend to the sick and wounded and to relieve to some extent the general distress and destitution.

The undersigned on behalf of the society, Messers coutts and co. 4440, Strand W. C. or to the honorary Treasurer Mr. A. S. M. Anik 2, Fenchurch Avenue E. C.

2, Cadogan Place, S. W.

Lamington
Aga Khan
M. Abbas Ali Baig
Ameer Ali.

উক্ত আবেদনে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বর্তমান প্রয়াসের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি সাহায্যের আবেদনও লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে ভারতেও কিছু কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যে গুলো একই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। এই ধরনের একটি সংগঠন ছিল 'বোম্বাই পুওর মোসলেম্‌স মেডিক্যাল মিশন।' এই মিশনটি ডা. আনসারীর নেতৃত্বাধীন মিশন থেকে স্বতন্ত্র ছিল। *দি কমরেড* এই প্রসঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করে লিখে যে কনষ্টান্টিনোপল* থেকে বোম্বে 'পুওর মোসলেমস্ মেডিকেল মিশন' চাতাল্‌জা যুদ্দক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যাবে।[১৪] রিলিফ ফাণ্ডের জন্য সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে কনষ্টান্টিনোপল পাঠানো হত এবং এই নগরী থেকে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ সম্পর্কে *দি কমরেড* পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করত। এই ধরনের একটি সংবাদ[১৫] -- "We are asked to state that orient Bank of India Ltd. Lahore have now received the formal receipt from constantinople for the sums Rs. 24000/- and 25,909 which was enabled to Turkey on behalf of the Zamindar Turkish relief fund and Peshwar Muslims respectively'. একই সংখ্যায় 'লেডী লোথারস্ ফাণ্ড' সম্পর্কেও সংবাদ রয়েছে। এই সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখে, 'আমরা আনন্দের সাথে এই ফাণ্ডের অবৈতনিক সম্পাদক মি. টডের (ভাইসরয়ের এ. ডি. সি.) নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশ করছি।' এতে দেখা যায়, ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৩ সালে এই তহবিলে ২৬,৪৬০ টাকা ১৪ আনা জমা পড়ে। পূর্বে এই তহবিলে সংগৃহীত হয়েছিল ৫২,৯৯৮ টাকা ৬ আনা।[১৬] এই ফাণ্ডটি ছাড়াও 'লেডি হার্ডিঞ্জ রিলিফ' ফাণ্ড নামের আরও একটি তহবিল ছিল। *দি কমরেড* এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থের সংবাদ পরিবেশন করে। এই তহবিলে যাঁরা অর্থ দান করেন তাদের মধ্যে ছিলেন একাধিক রাজ্যের মহারানী, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মহিলাবৃন্দ, ইংরেজ কর্মকর্তা, এবং ১০৯ নং পদাতিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।[১৭] অপর দিকে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুসলিম ইউনিটসমূহ বলকান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও অর্থ সাহায্য করে তাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে। বৃটিশ বাহিনীতে কাজ করেও এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাওয়া ছিল ঝুকিপূর্ণ। তাই *দি কমরেড* সকল ইংরেজ অফিসারকে উদারতা প্রদর্শন করার আহবান জানায়।[১৮] বলকান যুদ্ধের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ সাহায্য উসমানীয় প্রশাসনে আন্তরিকভাবে গৃহীত হয়। ডা. আনসারীর নেতৃত্বে মেডিক্যাল মিশনটি যুদ্ধাহত ও উদ্বাস্তদের জন্য কাজ করে। ডা. আনসারী *দি কমরেড* পত্রিকার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর চিঠিতে লিখেন, '.... Do not forget to send *(The Comrade)* even if it is in line, as a letter from the father of the Mission would be cheering and reassuring to his children in Turkey.'

---

*বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল।

ডা. আনসারী মেডিক্যাল মিশনের কর্মতৎপরতা নিয়ে চিঠি লিখতেন, *দি কমরেড* সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আলী এই চিঠি সমূহ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। এই ধরনের চিঠিতে তুর্কী কর্মকর্তাদের আবেদন লক্ষ্য করা যায়। ডা. আনসারীর বন্ধু ও সহযোগী আহমেদ ফুয়াদ এই ধরনের আবেদনে বলেন যাতে ভারতের সদাশয় মুসলিমগণ তুর্কী উদ্বাস্তদের সাহায্য করেন। স্যালোনিকা থেকে তুর্কী কনসাল জেনারেল একটি চিঠিতে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে উদ্বাস্তদের সংখ্যা উল্লেখ করেন।[২০] এই সকল উদ্বাস্তদেরকে সাহায্য করার জন্য আহমদ ফুয়াদ বলেন, "We are sure that the generous Moslem Indians will step forward for the help of these innocent refugees in due time."

এরপর আরও একটি আর্থিক ব্যবস্থার সংবাদ *দি কমরেড* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ব্যবস্থাটির নাম ছিল 'টার্কিশ ট্রেজারী বণ্ড' এই বণ্ড ক্রয়ের মাধ্যমে তুর্কী ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। এই সম্পর্কে আগা খান ট্রেজারী বণ্ড নিয়ে দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেন এবং বণ্ড ক্রয়ের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি আহবান জানান।[২১] অপরদিকে অটোমান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জন্য ভারতীয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন শহর শাখার মাধ্যমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে। চাঁদা দাতাদের নাম এবং পরিমাণ *দি কমরেড* এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।[২২] এছাড়া বলকান যুদ্ধের আহত ও উদ্বাস্তদের সাহার্যার্থে *দি কমরেড* পত্রিকার নিজস্ব উদ্যোগে শিবির প্রতিষ্ঠা করে। 'ক্যাম্প হসপিটাল' নামের হাসপাতালে *দি কমরেড* পত্রিকার পাঠকদের দেয়া চাঁদা ব্যয় করা হত। এই ব্যয়ের হিসাব *দি কমরেড* এ প্রকাশিত হত।[২৩]

দি কমরেড কলিকাতা থেকে ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লীতে* স্থানান্তরিত হয়। তা সত্ত্বেও বাংলা অঞ্চলে পত্রিকাটির প্রভাব অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী যে কোন আন্দোলনে বাংলার জনসাধারণ অংশ নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বলকান যুদ্ধের বিরুদ্ধেও এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। *দি কমরেড* পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত চাঁদা দাতাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বাঙালী মুসলমানও রয়েছেন। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও রিলিফ ফাণ্ডে অর্থদান করার উদাহরণ পাওয়া যায়।[২৪] তাছাড়া অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশনে বাংলার দুইজন সদস্য কাজ করেছেন।[২৫] এরা ছিলেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী** ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী।*** বাংলা অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মত হিন্দু সমাজও বলকান যুদ্ধের জন্য গঠিত ফাণ্ডে চাঁদা প্রদান করে। ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দুরা কদাচিৎ সাড়া দিলেও বাংলা অঞ্চলের হিন্দুরা এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। পাবনা, কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দু ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লেখযোগ্য হারে অর্থ দান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন.....

*১৯১২ সালে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। এই কারণে 'দি কমরেড' দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

**আবদুর রহমান সিদ্দিকী আলীগড় কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবেই তিনি মেডিকেল মিশনে কাজ করার সুযোগ পান। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পরে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন।

***সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১) সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে রেয়াজউদ্দীন মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক গ্রন্থে অধ্যয়ন করে জামাল উদ্দিন আফগানীর স্বাধীন চিন্তা ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ১৮৯৫ সালে তুরস্ক যাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু অর্থাভাবে যেতে পারেননি। ১৯১২ সালে তা আনসারীর মেডিকেল মিশনে কাজ করার সুযোগ পান। ১৯১৩ সালে তুরস্কের সুলতান সিরাজীকে 'গাজী' উপাধি প্রদান করেন।

নাম		অর্থের পরিমাণ
বাবু নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর	–	১০০/-
ঠাকুর এষ্টেট*	-	২৫/-
মুকুন্দ নাথ সেন	–	২৫/-
বাবু শিরিশ চন্দ্র রায়	–	২৫/-
রমনী মোহন সরকার	–	৩০/-
দীনেশ চন্দ্র রায়	–	৫/-
সিতানাথ সেন	–	৫/-
পুর্নচন্দ্র সাহা	–	৫/-
বাবু রাজ কান্ত রায়	–	২/-

প্রমুখ[২৬]

এতে বাংলার হিন্দু সমাজের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে রাজনৈতিক সচেতনতা। বংগভঙ্গের কারণে এবং রদ হওয়ার ঘটনায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল বলকান যুদ্ধের ঘটনায় তা যেন মিলেয়ে যায়। রিলিফ ফাণ্ডে অর্থ প্রদানের বিষয়টি দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বাবু সুরেন্দ্র নাথের বক্তব্য *দি কমরেড* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজে প্রচারণার জন্য *Near East* পত্রিকা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২২৭৫/- টাকা বরাদ্ধ করে। এর তীব্র প্রতিবাদ করে মিঃ রায় বক্তব্য রেখেছিলেন।[২৭] বলা বাহুল্য বলকান যুদ্ধে বৃটিশ নীতির পক্ষে উক্ত পত্রিকাটি কাজ করছিল।

'অটোমান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র জন্য বাংলা অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা হয়। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কলিকাতা, শ্রীরামপুর, নোয়াখালী ও বরিশাল শাখার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহিত হয়। এই ফাণ্ডে দানকারী ব্যক্তিদের* নাম ও অর্থের পরিমাণ *দি কমরেড* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৮] এই প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আঞ্জুমান-ই-মোহাম্মদ উল ইসলাম, কলিকাতা, মোহামেডান এসোসিয়েশন- বগুড়া আলাদাভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগৃহীত অর্থ টার্কিশ রিলিফ ফাণ্ডে দেয়া হয়।[২৯] উক্ত বিবরণে দেখা যাচ্ছে যে *দি কমরেড* বাংলা অঞ্চলের মুসলিম ও হিন্দু সমাজে বলকান যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯১২-১৩ সালে সংঘটিত বলকান যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বিবাদমান দেশ সমূহ তুরস্ক, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস, মন্টিনিগ্রো অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে যে ক্ষতি হয় তা *দি কমরেড* লণ্ডনের *দি ডেইলী এক্সপ্রেস* পত্রিকা সংগ্রহ করে প্রকাশ করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ[৩০]

---

* কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এষ্টেট।

* চাঁদা দাতাদের মধ্যে বিখ্যাত মুসলিম নেতা আবদুল করিম গজনভী এবং নোয়াখালীর খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আবদুর রশীদ খানও ছিলেন।

দেশের নাম	নিহতের সংখ্যা	আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ
তুরস্ক	১০০,০০০	৮০,০০০,০০০
বুলগেরিয়া	৮০,০০০	৬০,০০০,০০০
সার্বিয়া	৩০,০০০	৩২,০০০,০০০
গ্রীস	১০,০০০	১৪,০০০,০০০
মন্টিনিগ্রো	৮,০০০	৮০,০০০,০০০
	২,২৮,০০০	১৮৬,৮০০০,০০০

এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখি যে, তুরস্ক এককভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর্থিক ক্ষতির সাথে লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হয়েছে ও নিহত হয়েছে। যুদ্ধে এই ধরনের বিপর্যয় থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্য যুব তুর্কী সরকারকে ভারতীয় মুসলমানেরা নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন ফাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও মেডিকেল মিশন প্রেরণের মাধ্যমে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। তুর্কী রিলিফ ফাণ্ড এককভাবে ১৯১৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৯৯,৯২১ টাকা ৬ আনা ৬ পয়সা সংগ্রহ করে। এই অর্থের পরিমাণ হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তুর্কী মুসলমান তথা সাম্রাজ্য ও খলিফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাহায্য করার প্রচেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে *দি কমরেড* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করেও ভারতীয় মুসলমানেরা *দি কমরেড* এর মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং একাগ্রতা প্রদর্শন করে।

যুদ্ধের সময়ে ও পরে *দি কমরেড* তুর্কী খিলাফতের খবরা-খবর প্রকাশ অব্যাহত রাখে। 'দি কনস্টান্টিনোপল লেটার' নামে ১৯১৪ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় পত্রিকাটি তুরস্কের খবরা-খবর পরিবেশন করে। অতঃপর "দি চয়েস অব দি টার্কশ" (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ায় *দি কমরেড* পত্রিকার উপর আবারও সরকারী নির্যাতন নেমে আসে। এই পর্যায়ে মওলানা মোহাম্মদ আলী আর্থিক ঝুঁকি না নিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন এবং *দি হামদর্দ* নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৩১] বলকান যুদ্ধের সময় *দি কমরেড* ভারত বর্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর সম্পাদক হিসাবে মওলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন আপোষহীন এবং কর্মদ্যোগী। তাঁর বৃটিশ বিরোধী অবস্থান তাঁকে আরও খ্যাতিমান করে তোলে। পরবর্তীতে খিলাফত আন্দোলনে মওলানা মোহাম্মদ আলী অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে মুসলিম সমাজকে নেতৃত্ব দেন।

সূত্র নির্দেশ

১। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান থেকে 'উসমানিয়া' 'Ottoman', 'Osman', 'Porte' ইত্যাদি নামে সাম্রাজ্যটি (১২৯০-১৯২৪) পরিচিত ছিল।

২। *দ্রষ্টব্য,* R. Ahmed, *Bengal Muslims, Quest for identity* OUP, Delhi, 1981, (1871-1905)

৩। Lenczowsky Gorge, *The Middle East in World Affairs,* Cornell University Press, thaca and London, 7th edition, 1971, p. 287.

৪। মওলানা শওকত আলী ছিলেন মোহাম্মদ আলীর অগ্রজ।

৫। R.A.J. Nadvi, *Selections from Muhammad Ali's Comrade,* M. A. Academy, Lahore, 1965, p. 37

৬। *ঐ,* পৃ.-৩৯।

৭। *ঐ*

৮। *ঐ,* পৃ-৪০

৯। *দি কমরেড,* ২০ জানু ১৯১২। এই ধরনের সংবাদ *দি কমরেড* এর ১৯১২-১৩ এর বিভিন্ন সংখ্যায় পাওয়া যায়।

১০। *ঐ*পৃ- ৬১

১১। *ঐ,* ৮ জুন, ১৯১২, পৃ-৫৯৯।

১২। দ্রষ্টব্য, *ঐ,* ১৯১২ সালের জুন, জুলাই, অগাষ্ট এবং ১৯১৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যা সমূহ।

১৩। *ঐ,* ১১ জানুয়ারী, ১৯১৩, পৃ-৪০।

১৪। *ঐ,* ১১ জানু, ১৯১৩, পৃ-৩০

১৫। *ঐ,* ১৮ জানুয়ারী, ১৯১৩, পৃ-৫০

১৬। *ঐ*

১৭। *ঐ,* ১লা ফ্রেবু, ১৯১৩, পৃ-৯৩।

১৮। *ঐ,* ১৫ মার্চ, ১৯১৩। এই সংখ্যায় 'The Turkish relief fund and the soldiers' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। এতে *দি কমরেড* লিখে, "We have recieved a cheque for Rs. 550/- from officer commanding, 15th Lancers.... We think we know the temper of our people better, and we can confidently say that such action as colonel Johonsfon's would increase matter than diminish the loyalty of our toroops." P. 221.

১৯। *ঐ,* ১লা ফেব্রু, ১৯১৩, পৃ-৯২।

২০। *ঐ,* ২৯শে মার্চ, ১৯১৩, পৃ. ২৪০-৪১।

২১। *ঐ,* ১লা মার্চ ১৯১৩, পৃ. ১৮৩।

২২। *ঐ,* ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় চাঁদা দাতাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে।

২৩। *ঐ,* ২৯শে মার্চ, ১৯১৩, পৃ. ২৪১।

২৪। *দ্রষ্টব্য, ঐ,* মে-৪, ৮ জুন, ১৯১২ ও ১১ জানু, ২৫শে জানু, ৮ ফেব্রু, ১৩ ফেব্রুও ১লা মার্চ, ১৯১৩।

২৫। A. A. Khan, 'The Balkan War: Its Rapercussions in India.' in *Rajshahi University Studies,* Vol. V. 1973, p. 123.

২৬। *দ্রষ্টব্য, দি কমরেড,* ২৫শে জানুঃ ও ১৫ই মার্চ সংখ্যা, ১৯১৩।

২৭। *ঐ,* ২৯শে মার্চ, ১৯১৩। পৃ. ২৪৩।

২৮। *দ্রষ্টব্য, ঐ,* ১লা মার্চ ও ২৯শে মার্চ, ১৯৯৩।

২৯। *ঐ*

৩০। *ঐ,* ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩, পৃ. ১৩৩।

৩১। আবুল হাসান শামসুদ্দীন অনূদিত, *মোহাম্মদ আলীঃ* আত্মজীবনী; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ-৬৫।

বাংলাদেশে দারিদ্র ও দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টা; একটি পর্যালোচনা

প্রিয়ব্রত পাল

ভুমিকা ও সারমর্ম

দারিদ্র শব্দটি অপ্রীতিকর এবং পীড়াদায়ক। ব্যক্তি বা দেশ হিসেবে দরিদ্র হওয়া কারোর জন্য কাম্য নয়। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতিবিদগণ দারিদ্রের কারণ হিসাবে বিভিন্ন মতামত রেখেছেন। কারো মতে দারিদ্র ভাগ্যের লিখন, কারো মতে এটা ব্যক্তিগত চেষ্টার অভাব, আর কারো মতে এটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। যে দেশে দারিদ্রের প্রকোপ যত বৃদ্ধি পাবে সে দেশের আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা তত বিপন্ন হবে এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। অতএব কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি হলে প্রথমেই দারিদ্র দূরীকরণের প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে। এখানে দারিদ্র বলতে আমরা মূলতঃ অর্থনৈতিক দারিদ্রকে বুঝিয়েছি, নৈতিক কিংবা কৃষ্টির দারিদ্রকে নয়। এই প্রবন্ধের সীমিত আওতায় বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে তার উন্নতি সাধনের যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশের দারিদ্র অবস্থা

বাংলাদেশ-বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। বিপুল জনগোষ্ঠী, সীমিত সম্পদ, শ্রেণী বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের ৬০% এর বেশী জনগণ দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থল এর মতো মৌলিক চাহিদাগুলোর অনেকাংশ তাদের নাগালের বাইরে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রায় আটলক্ষ প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশী হিসেবে শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। কৃষিতে প্রতি বছর মাত্র ৭০ হাজারের মত শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। বিভিন্ন ধরনের শিল্পে শ্রম কর্ম সংস্থানের পরিমাণও অত্যন্ত সীমিত, শহরে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকর্মে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিমাণ বাৎসরিক ২ থেকে ৩ লক্ষের মত। বাকীরা উদ্বৃত্ত থাকছেন।

অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ অর্থাৎ বাসগৃহ, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, অফিস ও কর্মস্থল প্রভৃতির আনুপাতিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীল জমির সংকোচন অব্যাহত থাকছে। বর্তমানে

জনপ্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.২ একরেরও কম নেমেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ায় কৃষি জমি বিভক্ত হচ্ছে, ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর হয়ে প্রান্তিক চাষীতে পরিণত হচ্ছে।

১নং টেবিল হতে বিষয়টি স্পষ্টতঃ যে ১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৫.৪৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৪.০৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে কৃষিক্ষেত্রের আয়তন ও একইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭৭ এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ছোট, মাঝারী এবং বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ও আয়তনের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই সময়ের মধ্যে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র ৯.৪৩ শতাংশ থেকে কমে ৪.৯৪ শতাংশে, মাঝারি কৃষিক্ষেত্র ৪০.৮৫ শতাংশ থেকে ২৪.৭২ শতাংশে কমে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে ছোট কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৭২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ কৃষি হচ্ছে অর্থনীতির সর্ববৃহৎ খাত। এই খাত হতে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৩৭.৬ ভাগ আসে যেখানে শিল্পখাত হতে আসে মাত্র ৮.৪ ভাগ। এই খাতে মোট কর্মজীবী জনসংখ্যার ৭৩.৮ শতাংশ নিয়োজিত। তৎমধ্যে নারী ৯০.৩ শতাংশ। অর্থাৎ অকৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা মাত্র ৯.৭ শতাংশ। (টেবিল-২ দেখুন)

টেবিল-১

১৯৭৭ এবং ১৯৮৩-৮৪ সালের শুমারীর মধ্যে পারিবারের কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ও আয়তনের পরিবর্তনের হারঃ

কৃষিক্ষেত্রের আয়তন	কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা		কৃষিক্ষেত্রের আয়তন	
	১৯৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৭৭	১৯৮৩-৮৪
মোট কৃষিক্ষেত্র	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
.০৫-.৪৯	৫.৪৭	২৪.০৬	০.৫০	২.৭৪
.০৫-.৯৯	১০.৩৬	১৬.৩৭	২.১৫	৫.০৮
১.০০-২.৪৯	৩৩.৮৯	২৯.৯১	১৬.১০	২১.১৬
ছোট কৃষিক্ষেত্র	৪৯.৭২	৭০.৩৪	১৮.৭৫	২৮.৯৮
২.৫০-৪.৯৯	২৯.২৫	১৭.৯৮	২৯.১৫	২৭.০৫
৫.০০-৭.৪৯	১১.৬০	৬.৭৪	১৯.৭৫	১৭.৬৪
মাঝারি কৃষিক্ষেত্র	৪০.৮৫	২৪.৭২	৪৮.৯০	৪৫.০৯
৭.৫০-২৪.৯৯	৭.৫৬	৪.০৮	২১.২৬	১৭.৭৬
২৫.০০ ও তার বেশী	১.৮৭	০.৮৬	১১.০৯	৮.১৭
বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র	৯.৪৩	৪.৯৪	৩২.৩৫	২৫.৯৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৯২

টেবিল-২

মূল অর্থনৈতিক খাতে নিয়োগের হার

বৎসর	জনসংখ্যা	কৃষিখাত	অকৃষিখাত
১৯৭৪	পুরুষ	৭৭.৫	২২.৫
(শুমারী)	নারী	৬৯.৮	৩০.২
	মোট	৭৭.২	২২.৮
১৯৮১	পুরুষ	৬৩.০	৩৭.০
(শুমারী)	নারী	২৮.০	৭২.০
	মোট	৬১.৩	৩৮.৭
১৯৮৯	পুরুষ	৬২.১	৩৭.৯
(জরীপ)	নারী	৯০.৩	৯.৭
	মোট	৭৩.৮	২৬.২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৯২

টেবিল-৩

বাংলাদেশে কর্মজীবী জনসংখ্যার অংশগ্রহণের স্বরুপঃ

কর্মজীবীদের পদমর্যাদা	সমগ্র দেশে	শহরে	গ্রামে
মোট কর্মজীবী জনসংখ্যা	১০০.০	১০০.০০	১০০.০০
স্বনিয়োজিত	৭৫.৪	৫৬.৬	৬৭.৭
কর্মচারী	৯.৫	৩৪.৮	৬.৪
দিনমজুর	১৫.১	৩.৫	১৫.৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৯২

টেবিল-৩ হতে স্পষ্টত যে, মোট কর্মজীবী সংখ্যার ৭৫.৪ শতাংশ স্বনিয়োজিত, কর্মচারী ও দিনমজুর নিয়োগের হার মাত্র ক্রমান্বয়ে ৯.৫ শতাংশ ও ১৫.১ শতাংশ। বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত হওয়াতে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামে অকৃষিখাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ কম বলে গ্রামে কর্মচারী নিয়োগের হার মাত্র ৬.৪ শতাংশ। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ কর্মসূচীর ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গ্রামে দিনমজুরের এবং স্বনিয়োজিত কর্মজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণ কর্মসূচীর আওতায় শহরেও স্বনিয়োজিত কর্মজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের বেশীরভাগ কর্মজীবীরাই বৎসরের অনেকটা সময় কাজ না পেয়ে পরিবারের ভরন-পোষণের জন্য খাদ্য উৎপাদক না হয়ে খাদ্য সংগ্রাহক এবং রিলিফের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে জমি হচ্ছে এই সেক্টরের আয়- উৎপাদনের একমাত্র উৎস। আর এই জমির মালিকানায় রয়েছে দারুন ভারসাম্যহীনতা। জমির মালিকদের সর্ববৃহৎ ১০% ব্যক্তি ভোগ করছেন মোট জমির ৪৯% আর নিম্নবিত্তের ১০% মানুষের মালিকানা রয়েছেমাত্র ২% জমি। বাংলাদেশে জমির তুলনায় অত্যাধিক জনসংখ্যার দরুন (ফার্মের) খামারের গড় আকার খুবই ছোট। ১৯৮৩-৮৪ সালের শুমারি অনুযায়ী এদেশে খামারের গড় আয়তন মাত্র ২.৩ একর। তৎমধ্যে ছোট খামারের গড় আয়তন ০.৯ একর, মাঝারি খামারের আয়তন ৪.১ একর ও বড় খামারের গড় আয়তন ১১.৯ একরের মত। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭৭ সালে খামারের গড় আয়তন ছিল ৩.৫ একর। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি খামারের গড় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের কোটি কোটি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রধানত সম্পূর্ণ গৃহস্ত বা ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবনধারণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাই বর্তমানে পাঁচশালা পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশে দারিদ্রবিমোচনের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী

বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী জনগণ ভূমিহীন ও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এককভাবে এত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দুরুহ ব্যাপার। বাংলাদেশের সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

স্বাধীনতার পূর্বে দেশে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা কার্যকর ছিল। স্বাধীনতার পর বেসরকারী সংস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। প্রথমে তারা দুঃস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ দ্রব্য বিতরণ এবং পুর্ণবাসন কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত ছিল। তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীতে উপলব্ধি করতে পারল যে ত্রাণ তৎপরতার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের দুঃখ দুর্দশা সাময়িকভাবে লাঘব করা যায় কিন্তু স্থায়ীভাবে দূর করা সম্ভব নয়। তাই ক্রমে ক্রমে তারা দানধর্মী তৎপরতার বদলে উন্নয়নমূলক, শ্রমমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে থাকে। বিগত দশ বছরে দেশে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনে কর্মপ্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সরকারী প্রকল্পগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, (বি.আর.ডি.বি) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (উরডেপ), পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এছাড়া কিছু বেসরকারী সংস্থা দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন অঙ্গনে অবদান রাখছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থা হল- গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর

বাংলাদেশ, ব্র্যাক, প্রশিকা, আর-ডি-আর এস ইত্যাদি। বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে নিম্নে উল্লেখিত কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় গৃহীত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করা হল যা থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টার বিস্তার ও সাফল্য সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ধারণা পাওয়া যাবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পি.কে.এস.এফ)

এটি সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতিতে পরিচালিত। এর মূল লক্ষ্য হলো পল্লী এলাকায় ছোট ছোট কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিত্তহীন-ভূমিহীনদের আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা অথবা উৎসাহিত করা। দারিদ্রের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ফাউণ্ডেশনের পক্ষে যথোপযুক্ত কাঠামো বিস্তার করা দুঃসাধ্য বিধায়, দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'সহযোগী সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করে, তাদের মাধ্যমে কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়ায় কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেদিক থেকে এটি এক ভিন্নধর্মী মডেল। ১৯৯১ সালের জুন মাস নাগাদ ১২৯৩ টি সংস্থার সাথে ফাউণ্ডেশনের প্রাথমিক সংযোগ ঘটেছে, তবে এ পর্যন্ত ৩২টি প্রতিষ্ঠান 'সহযোগী সংস্থা' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে- যাদের সংগঠিত বিত্তহীন সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। পরিকল্পিতভাবে এই সদস্যদের আয় বর্ধক কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ, ঋণচাহিদা নির্ধারণ ও ঋণ প্রদানের কাজ চলছে।

উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (উরডেপ)

উরডেপ একটি সরকারী উদ্যোগ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় এ প্রকল্প পরিচালিত হয়। গ্রামের ভূমিহীন-বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়। একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে একটি দলে সবাই অনাত্মীয় সদস্য হতে হবে এবং পুরুষ মহিলাদের আলাদা দল হবে, কিন্তু উরডেপ ঋণ দেয় পরিবারের ভিত্তিতে। সেজন্য একটি পরিবার একটি দল গঠন করে। এর একটি সুবিধা হলো সবাই যেহেতু একই পরিবারের সদস্য সকলের ঋণ একত্রিত করে একটি বড় ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে পারে। উরডেপের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান দলনেতা হন। দরিদ্র পরিবারে সদস্যদের নিকট অর্থ সরবরাহ করে আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামে দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক বন্ধন, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধরে রাখাও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। উক্ত প্রকল্প ইতিমধ্যে অনেকটা সাফল্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রকল্পে ঋণ আদায়ের হার ১০০%। তবে সুদের হারের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের সাথে উরডেপের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলো গ্রুপ ফাণ্ডের অর্থ সংক্রান্ত। গ্রামীণ ব্যাংক মোট ঋণের ৫% গ্রুপ ফাণ্ডের জন্য রেখে দেয় এবং কোন সদস্য কখনই তা ফেরৎ পায় না। সেজন্য কার্যকরী সুদের হার ২০% এর উপর হয়ে যায়। কিন্তু উরডেপের কোন সদস্য ঋণ কর্মসূচী থেকে চলে যেতে চাইলে তার গ্রুপ ফাণ্ডের টাকা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে সুদের হার ১৮%ই

থাকে। যার অর্থ দাঁড়ায় উরডেপের ঋণ বিত্তহীনদের জন্য তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা। ঋণদান ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান ও বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি উরডেপের অংশ।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

বিভিন্ন উন্নতদেশ ও বিশ্বব্যাংক হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশে দরিদ্র্য জনসাধারণের মধ্যে রিলিফ হিসাবে বিতরণ না করে কাজের বিনিময়ে বিতরণ করা হয়। বিদেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্য দেশের দরিদ্র জনগণের মধ্যে কাজের বিনিময়ে বিতরণ করার প্রক্রিয়াকে বাংলাদেশে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। ১৯৭৪ সনে দেশের চরম খাদ্য সংকটের সময় এই কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে শীতকালে জল সেচের জন্য নতুন খাল খনন এবং পুরাতন খাল সমুহের সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়, মূলধনের অভাবে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হয় এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজ চালানো হয়। এছাড়াও এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের হাজা-মজা পুকুরগুলির সংস্কারের সাধন করে মাছের যোগান বৃদ্ধি করা হয়। খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা হয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করা হয় এবং খাদ্য দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক

যেখানে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং কৃষি ব্যাংক বিত্তহীনদের মাঝে ঋণ প্রদান করতে অক্ষম সেখানে গ্রামীণ ব্যাংক প্রথম তাদের ঋণ দানে এগিয়ে আসে। এই ব্যাংক ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে যে, দরিদ্র জনগণকেও ঋণ দেয়া যেতে পারে এবং তারা অন্য যে কোন বিত্তবান ঋণ গ্রহীতাদের চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার ৯৮% এর মত। এ পরিস্থিতিতে সম্পদ বন্ধকের পরিবর্তে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে গ্রুপ ভিত্তিতে। বিত্তহীন ভূমিহীনগণ নিজেদের পছন্দমত ৫ জনের একটি দল গঠন করে এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সঞ্চয় করে ও দলীয় মিটিং-এ উপস্থিত হয়। যদিও ঋণ পাবে দলের সদস্যগণ এককভাবে কিন্তু ফেরৎদানের দায়িত্ব সকলের। যদি কোন ঋণ গ্রহীতা কোন কিস্তি আদায় না করে অন্য সদস্যরা তা আদায়ে বাধ্য এবং সে অঙ্গীকার দেওয়ার পরই ঋণ পেয়ে থাকে। এই দলগত দায়িত্ব বা চাপ সম্পদ বন্ধকের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৪% ভাগ ঋণ গ্রহীতাই মহিলা। অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, মহিলাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস অনেক বেশী, ঋণের ব্যবহার, ঋণ ফেরৎদানের ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন ও নিয়মানুবর্তী। তাছাড়া মহিলারা আয় বাড়লে সংসারের জন্য স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির এবং সন্তানদের কল্যাণের দিকে বেশী নজর দেন। সার্বিকভাবে মহিলাদের ঋণ দিলে ঝুঁকি কম থাকে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়। সর্বোপরি ব্যাংকের ঋণের টাকা মাঠ কর্মীগণ গ্রহীতাদের বাড়ী গিয়ে (কেন্দ্রের মিটিং এ) আদায় করে। তার অর্থ হলো ঋণ গ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে আসে না, বরং ব্যাংক তার সেবা

নিয়ে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট যায়। ১৯৯১ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮৫০টি শাখার মাধ্যমে গ্রামীণব্যাংক ২১,১১৪ টি গ্রাম ৩৬,৩০০টি কেন্দ্রে মোট ৯,১০,৮৪২ জন ভূমিহীন বিত্তহীনকে সর্বমোট ৮২৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দান করেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৪৫০টির মতো আয় বর্দ্ধক অকৃষিকর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রুপ ফাণ্ডে বিত্তহীন-ভূমিহীনদের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৯.৮০ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে গ্রুপ ফাণ্ড হলো ঋণ গ্রহীতার মোট ঋণের ৫%, যা ব্যাংকের নিকট জমা থাকে। এর উপর ব্যক্তির কোন একক এখতিয়ার থাকে না, এটা দলের নিজস্ব ফাণ্ড। বিভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনে দলের সদস্যরা এই ফাণ্ড থেকে ঋণ নিতে পারে। অবশ্য এতে করে ঋণ গ্রহীতাদের সুদের হার ২০% চেয়ে বেশী হয়ে যায়।

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সংস্থা হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে ব্র্যাক তার প্রাথমিক কাজ শুরু করে ত্রাণ এবং পুর্নবাসন কর্মসুচী নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে, যেমনঃ সাধারণ পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্প্রসারণ কর্মসূচী ইত্যাদি। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ব্র্যাক বিত্তহীন-ভূমিহীনদের ঋণ দিয়ে থাকে। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক এর পদ্ধতির ভিতর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাহলো গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য, অন্যান্য কর্মসূচী সহায়ক হিসাবে আসে। অন্যদিকে ব্র্যাক ঋণ প্রদান করে অন্যান্য কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এবং সাধারণতঃ সবার পরে।

ব্র্যাক ভূমিহীনদের দলবদ্ধ করে ট্রেনিং প্রদান করে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করে। সাধারণতঃ একবছর সময় পর ঋণ প্রদান করা হয়। ব্র্যাক ৫ জনের দল করে না। সাধারণতঃ প্রতি গ্রামে দুইটি দল, একটি মহিলাদের এবং একটি পুরুষদের দল করা হয়। এসব দলে সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৭০ জন সদস্য থাকে। ব্র্যাক একটি মৌলিক বিষয় ধরে কাজ করে। তাহলো দরিদ্র ভূমিহীন জনগণের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি না তারা গ্রামীণ এলিটদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছেদ না করে। ব্র্যাক ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১,৪৭১ মিলিয়ন টাকা পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ও পল্লী ঋণ কর্মসুচীর আওতায় ১৪০ ধরনের আয় ও নিয়োগ বর্দ্ধক কর্মকাণ্ডে বিতরণ করেছে।

রংপুর দিনাজপুর পল্লী সংস্থা (আর. ডি. আর. এস)

এই সংস্থা ১৯৭১ সাল হতে তার প্রাথমিক কাজ শুরু করে ত্রাণ এবং পুর্নবাসন কর্মসূচী নিয়ে। পরবর্তীতে এই সংস্থা বিত্তহীন ভূমিহীনদের মাঝে ঋণ দিতে শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে ঋণ একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসুচীর অংশ হিসেবে এসেছে। গ্রুপ গঠন, সঞ্চয় অভ্যাস, শিক্ষা ইত্যাদি ধাপের পর আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৭-১৫ জন হতে পারে। পুরুষ মহিলাদের আলাদা দল হয় এবং একই গ্রামে অনেক দল থাকতে পারে। একটি

উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রস্তাবিত ঋণের কম পক্ষে ২৫% বিত্তহীন-ভূমিহীন সদস্য / সদস্যাকে সরবরাহ করতে হয়। যার ফলে আর.ডি.আর.এস. এর ঝুঁকি কমে এবং প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডে একজন সদস্যের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নিবিড় হয়। এই ঋণ প্রকল্প ও অত্যন্ত ভালভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় এবং সুদের হার প্রচলিত ব্যাংকের হারের (১৬%) সমান। এই সংস্থার কর্মকাণ্ড হতে উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬০ লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছে। এই ৬০ লক্ষ লোকের ৭৫% ভাগ হল ভূমি হীন ও প্রান্তিক কৃষক যাদের কৃষি জমির পরিমাণ এক একরেরও কম।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ (এস.বি.)

দেশ ব্যাপী পল্লী অঞ্চলে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানে এটি একটি ব্যাতিক্রমধর্মী বড় ধরনের উদ্যোগ। ১৯৮১ সনের জানুয়ারী মাস থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় স্বনির্ভর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। স্বনির্ভর কর্মীরা প্রথমে পাঁচজনকে নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরী করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং পরবর্তীতে তাদেরকে কোন একটি ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯০ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৪৮৯ টি ব্যাংক শাখার মাধ্যমে ৬৯৬টি গ্রামের মোট ৫,১৫,৬২৩ জন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৩২,৪০৫ জন মহিলা। মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সনের শেষে ৯১ কোটি টাকার উপর দাঁড়িয়েছে। ঋণ আদায়ের হার বর্তমানে ৭৬%।

৩. দেশের দারিদ্র অবস্থা ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর মূল্যায়ন ও সুপারিশ সমুহঃ

৩.১ মূল্যায়ন

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি দিন দিন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। এই সমস্ত জমিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যথাসময়ে এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ না পাওয়ায় এবং ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিবৎসরই ভূমিহীন-বিত্তহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা অন্যের জমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে বলেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তেমন উৎসাহী নহে। অন্য দিকে কৃষিতে বিনিয়োগ করে বর্তমান অবস্থায় যতটা লাভ করা সম্ভব তার চাইতে অনেক বেশী হারে লাভ করা যায় দুস্থ কৃষকদের ঋণ দান করে বা ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা খাটিয়ে। ফলে ধনীকৃষকেরা কৃষি কাজে টাকা খাটাতে নারাজ। এ সব কারণে কৃষিতে সেই কর্মজীবী জনসংখ্যার প্রায় ৭৪% নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও কৃষির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। এই খাত হতে মোট দেশজ উৎপাদনের ৩৭% ভাগ আসে যেখানে শিল্পখাত হতে আসে মাত্র ৮.৪% ভাগ। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে আরও অনুন্নত।

দেশের ভূমিহীন-বিত্তহীনরা চরম দারিদ্রতার কারণে দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন। তাদের সংঘবদ্ধকরে গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মূল্যবোধ এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা অর্জনে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রাম পর্যায়ে প্রসার লাভ করছে। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। এবং বিভিন্ন গবেষণার তথ্যানুযায়ী ভূমিহীন-বিত্তহীনদের সংখ্যা প্রতিবছরে বেড়েই চলেছে।

বৃহৎঋণদানকারী সংস্থাসমূহ বছরের পর বছর ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে এবং সর্বোচ্চ কতবার ঋণ প্রদান করা হবে তার কোন সীমা নেই বলে একজন গ্রহীতা বার বার ঋণ গ্রহণ করছেন। সেজন্য ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে তিনি তার আয় সংরক্ষণ করতে পারবেন কিনা বলা মুস্কিল। দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচী চালানোর জন্য এই সংস্থাসমূহ সরকার কিংবা বিদেশী অর্থ সংস্থান সংস্থার কাছ থেকে অতি সহজশর্তে ঋণ পেয়ে থাকে।

৩.২ সুপারিশসমূহ

প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম এমন হওয়া উচিত যেন ভূমিহীন-বিত্তহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং ঋণ সংস্থার উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভর হতে পারে অর্থাৎ ঋণ আদায়ের হারের পরিবর্তে কোন সংস্থা কি পরিমাণ ভূমিহীন-বিত্তহীন পরিবারকে ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছে, তা সংস্থার কার্যক্রমের মূল্যায়নের মাপকাঠি হওয়া উচিত।

প্রতিটি বেসরকারী সংস্থাকে প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে তার কার্যক্রমের অগ্রগতির রির্পোট প্রকাশ করতে হবে। এবং এই রিপোর্টের তদন্তের ভিত্তিতে তাদের আনুপাতিক হারে ঋণ সরবরাহ করতে হবে।

পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাতেই বিনিয়োগ ও উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে সার্বিকভাবে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনে বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা কমাতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বনির্ভরতার অভাব থাকলে, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব নয়। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে প্রাপ্ত সাহায্যের সর্বোত্তম উৎপাদনমুখী ব্যবহার করতে হবে।

ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিবর্তে ন্যায্যমূল্যে ও যথা সময়ে কৃষি উপরকরণ সরবরাহ করা উচিত। এবং কৃষিজাত দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা গঠন করতে হবে।

উপসংহার

দেশে দারিদ্র সমস্যা এত ব্যাপক যে তা এককভাবে সরকারের সীমিত সম্পদ দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাকে নিয়ে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা উচিত।

তবে প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে সরকারকে প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমকে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে মূল্যায়ন করা উচিত।

কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার এত স্বল্প যে শুধু বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই দেশের দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দরিদ্র জনগণের কিয়দংশ মুরগী বা ছাগল পালন করে বা রিক্সা, গরুরগাড়ী চালিয়ে বা কুটির শিল্পের সামান্যতম সম্প্রসারণের মাধ্যমে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অতএব উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ফসল ফলানো ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র দূর করা উচিত।

পরিশেষে এই মন্তব্য করা যায় যে, আমাদের মত দেশের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, পরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে দেশের দারিদ্রাবস্থা দূর করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী

দীপাল চন্দ্র বড়ুয়াঃ "পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা", *ব্যাংক পরিক্রমা,* ভলিউম-১৭, ১৯৯২ ঢাকা।

স্বনির্ভর বাংলাদেশঃ স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী নীতিমালা। ঢাকা।

আলমগীর দে.আ.হা.ঃ *দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা,* ১৯৯৩, ঢাকা।

BRAC/RDP: *Half yearly Report,* 1994. BRAC, Dhaka.

Choudhuri Nurul Islam A. H. M. & Saha Bandana "Rural Development and NGOs in Bangladesh "*Bank Parikrama* vol. XVII. 1992, Dhaka.

GOB: *The Fourth Five year plan* (1990-95); Planning commission, Ministry of Planing, 1990, Dhaka.

Partners in Rural Poverty Allevialtion NGO Cooperation, United Nations, New Yourk. 1992.

PKSF, *Annual Report 1990-91*; Dhaka.

Paul: P. B.: *Role of NGOs in Human Resource Development of Bangladesh in Human Resource* Development: Bangladesh Aspect, 1995. Seminar volume of BETA.

Task Force (1991): *Managing Development, Vol. 2* UPL. Dhaka.

The world Bank Annual Report, 1993.

Hossain, Mahbub. *The Impact of Grameen Bank on Women's Involvement in Productive Activities.* Grameen Bank, 1986. Dhaka.

UNDP Human Development Report 1991.

Upazila Resource Development and Employment Project (URDEP) credit Manual of Urdep Directorate of Youth, Ministry of Sports & youth, GOB. Dhaka.

Yunus M: *Strategy for the Decade of Nineties.* Grameen Bank, 1989. Dhaka.

গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামতঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ ছাদেকুল আরেফিন

১.১ ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে গ্রামভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত সত্তরের দশকের শেষভাগে এনজিও কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং কৃষি উন্নয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি লাভ করে শিক্ষা, সমবায়, কুটির শিল্প, আয় বৃদ্ধি, নারী উন্নয়ন, আইন সহায়তা, সামাজিক বনায়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক ক্ষেত্রে। আর এ কারণেই সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিও'র উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশীদার হিসাবে দাবীদার হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ পর্যায়ে এনজিও'র সংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া এদেশে কর্মরত এনজিও সমূহের উন্নয়ন এবং ত্রাণ ও পূনর্বাসন বাজেটের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক তথ্যে জানা যায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে বলেন যে, দেশের এনজিও সংগঠণ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন কাজে গত '৯১-'৯২ অর্থ বছরে মোট ৪৮৬ কোটি ৬৫ লাখ ৮০ হাজার ১১৪ টাকা ব্যয় করেছে।[১] এমনিভাবে এনজিওগুলো গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের কার্যক্রম ও ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেশের উন্নয়ন তথা গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সমূহের কার্যক্রম ও ব্যয়বরাদ্দের বিষয়টি জাতীয় চাহিদার সাথে কতখানি সম্পর্কিত। কেননা এনজিও'র কার্যক্রম ও বাজেটের অঙ্কের পরিমাণ নিয়ে নানা মহলে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে কৌতুহল, সন্দেহ ও আগ্রহ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও মহল থেকে মতামতের সমীক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। বিশেষ করে এনজিওগুলোর কার্যক্রম যে এলাকার জন্য গুরুত্ব পাচ্ছে (গ্রাম উন্নয়নে) সে এলাকার জনগণের মতামতগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে এরকমই একটি বিশেষ শ্রেণীর মতামত নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে তার আগে বাংলাদেশে এনজিও ও তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে কিছুটা মৌলিক ধারণার অবতারণা করা প্রয়োজন।

১.২ বাংলাদেশে এনজিও ও তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

আক্ষরিক অর্থে এনজিও হচ্ছে 'নন গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন' অর্থাৎ যে কোন বেসরকারি সংস্থাকে এনজিও বলা যায়। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে সে অর্থে বোঝানো হয়নি। এক্ষেত্রে এনজিও বলতে বোঝানো হয়েছে সে সব সংস্থাকে যেগুলো এদেশে আর্থ-সামাজিক, সেবামূলক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোন না কোনভাবে জড়িত। সে অর্থে এনজিওগুলোর সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা নেয়া দরকার। বলা হয়ে থাকে "ননগভর্ণমেন্টাল অরগানাইজেশন" বা বেসরকারি সংস্থা শব্দটি প্রথম অনুমোদিত হয়েছিল জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের অধীনে ২৮৮ (x) ধারায় ১৯৫০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সেখানে বলা হয়েছিল যে, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি আন্তঃসরকারের শর্তাধীনে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেটা একটা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে।[২] এনজিও'র সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন কথা বলেছেন। এনজিও'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্যাড্রন বলেন, এনজিও হতে পারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প ও বণিক সমিতি, যুব সংগঠনধর্মী প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ নাগরিক সমিতি, ভ্রমণকারী দল, প্রাইভেট ফাউণ্ডেশন, রাজনৈতিক দল, অর্থ যোগানকারী ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থা এবং বেসরকারী প্রকৃতির অন্য যে কোন সংগঠন।[৩] ডঃ মিজানুর রহমান শেলীর মতে, "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (হালে যাদেরকে ঢালাওভাবে এনজিও নামে ডাকা হয়) বলতে অনেকেই কেবল বিদেশী অথবা বিদেশী সাহায্যনির্ভর বেসরকারী সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান বোঝেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা বেসরকারীভাবে সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়ন (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় জাতের উন্নয়ন) কর্মে নিয়োজিত সংগঠনসমূহ সকলেই এনজিও"।[৪] এমনিভাবে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। যেমন-খাজা সামছুল হুদা এবং আজফার হোসাইন[৫] ছয় ধরনের এনজিও'র কথা বলেছেন। (১) রিলিফ এবং কল্যাণমূলক এনজিও (২) সেবা প্রদানকারী এনজিও (৩) অর্থ যোগানদানকারী এনজিও (৪) প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তাদানকারী এনজিও (৫) যোগাযোগ/সমন্বয়কারী এনজিও এবং (৬) উন্নয়ণমুখী এনজিও। এছাড়া আনু মুহাম্মদ[৬] এনজিওগুলোকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন-প্রথমত, আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেগুলো অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নিজেরা সরাসরি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় এনজিও, যেগুলো জাতীয় ভিত্তিতে নিজেদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। তৃতীয়ত, স্থানীয় এনজিও এবং চতুর্থত, সেবা প্রদানকারী এনজিও।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এনজিও বলতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ও সেবামূলক কর্মে নিয়োজিত সে সমস্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহকে বোঝানো যায়। এবং যেগুলোর স্পষ্ট তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক বা বিদেশী এনজিও। এই এনজিওগুলির প্রধান কার্যালয় বিদেশের কোন উন্নত দেশের যেখান থেকে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশ ও অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ

জাতীয় পর্যায়ের এনজিও। এই এনজিও'র মূল কেন্দ্র দেশের ভিতরে যে কোন স্থানে অবস্থিত হয়ে থাকে এবং এদের কর্মকর্তা ও মানব সম্পদের যোগান দেশের ভিতর থেকেই সরবরাহ হয়ে থাকে। তবে অর্থের অধিকাংশই বিদেশের কোন ডোনার বা এজেন্সি পেয়ে থাকে। যদিও এরা নিজেরাই কর্মসূচি বা নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তৃতীয়, স্থানীয় এনজিও। দেশে অবস্থিত বিভিন্ন ছোটখাট ক্লাব, সমিতি, বা সমাজকল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এদের কার্যক্রম বা কর্মসূচি সীমিত থাকে এবং অর্থের যোগানও সদস্যদের চাঁদা এবং ছোট খাট দানের উপর সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি নির্মাণ ও পরিচালনার পাশাপাশি আর্তমানবতা ও স্বেচ্ছাসেবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অতীতে সম্পন্ন হতো, তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মপদ্ধতি ও পরিধি বদলালেও স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব আজও বিলুপ্ত হয়নি। উল্লেখ্য যে, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে এদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম শুরু হয়। তবে বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের উপকূলীয় প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলার পর বিভিন্ন এনজিও বা রিলিফদাতা সংস্থাগুলো ব্যাপক সাহায্য তৎপরতা চালিয়েছে। কিছু কিছু সংস্থা অর্থ সাহায্যও দিয়েছে বাইরে থেকে। যাহোক, বস্তুতপক্ষে ১৯৭০ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরই বাংলাদেশে এনজিওগুলোর ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় "বাংলাদেশ হাসপাতাল" নামে যে সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য সেটি স্বাধীনতার পর "গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র" নামে সংগঠিত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে বাংলদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিলেট জেলায় শাল্লা এলাকায় উদবাস্তুদের পুনর্বাসন কাজের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও ত্রাণকার্যে দ্য ক্রিশ্চিয়ান অরগানাইজেশন ফর রিলিফ এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন (কোর) বর্তমানে কারিতাস নামে পরিচিত হয়। যদিও এর আগে গুটিকয়েক সংস্থা কাজ করছিল তথাপি উপরোক্ত সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বহুসংখ্যক এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।

বর্তমানে এনজিওসমুহ গ্রামবাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেছে। বিভিন্ন এনজিও ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এ সমস্ত এনজিও'র কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন কৌশল, ঋণদান বা আর্থিক সহায়তা পদ্ধতি, টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্লোচ্চ বিশেষ বিশেষ কর্মসূচীর উপর গুরুত্বারোপ, প্রযুক্তি সরবরাহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

বস্তুতঃ ১৯৭৩ সালের শেষদিকে এনজিওরা সীমিত পরিসরে উন্নয়নমূলক কজ শুরু করে। একথায় বলা যায় প্রথম দুই দশকের এনজিও কার্যক্রমের মূল্যায়নে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে সুদুর

প্রসারী লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এনজিও সমূহের কার্যক্রমগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র দূরীকরণ, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর এক্ষেত্রে এনজিওসমূহ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিতে গ্রামবাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ লক্ষ্যদল কেন্দ্রিক (টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ) পদ্ধতিতে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করে সমিতি বা দল গঠন করে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে। এনজিওসমূহ দেশের বিরাজমান সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যেমনঃ ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, সহ মৌলিক চাহিদা পূরণজনিত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও নানা ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাম্পতিককালের এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি মাঠপর্যায়ের গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে, গ্রাম এলাকায় এনজিও কার্যক্রমের ফলে এনজিও সংগঠিত সমিতির সদস্যদের আয়বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ব্র্যাক সদস্যদের ২.৩৮ ভাগ, কারিতাস সদস্যদের ৭.১৪ ভাগ। অপরপক্ষে অল্পআয়বৃদ্ধি পেয়েছে ব্র্যাক ১৬.৬৭%, কারিতাস ৬৪.২৯% এবং ওয়ালর্ডভিশন ২৬.৯২%। অপরদিকে আয়বৃদ্ধি পায়নি ব্র্যাকে ৪৭.৬২%, কারিতাস ২৮.৫৭% এবং ওয়ার্ডভিশন ২৩.০৮%। এছাড়াও আয় হ্রাস এর কথাও বলেছে বেশ কিছু উত্তরদাতা।[৭]

পাশাপাশি কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্যে দেখা যায় এনজিও কর্তৃক দেয় প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক হয়েছে ব্র্যাকের ১৬.৬৭ ভাগ, কারিতাসের ২৮.৫৭ ভাগ এবং ওয়ার্ডভিশনের ৩.৮৫ ভাগ সদস্যের।[৮]

পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক দেয় ঋণ বা সাহায্য এনজিও সংগঠিত সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান / আত্ম কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কিনা-এ তথ্যে দেখা যায়, যথাযথ বলেছে ব্র্যাকের ৪.৭৬%, কারিতাসের ২১.৪৩% উত্তরদাতা সদস্য। অবশিষ্ট উত্তরদাতারা কেউ বলেছেন-যথাযথ নয়। আর কেউ বলতে পারে না বলে জানিয়েছেন।[৯] সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও সাহায্য সম্পর্কিত কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক নানাদিক রয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে এনজিও'র সদস্য ও তার পরিবারের সদস্যবর্গ উপকৃত হচ্ছে যথাক্রমে ব্র্যাক ৬৬.৬৭ ভাগ, কারিতাস ১০০% এবং ওয়ার্ল্ডভিশন ৯৬.১৫ ভাগ।[১০]

এরকমভাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে। রোগ প্রতিরোধক টিকা বা ইনজেকশন নেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও'র মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ডভিশন এর

১৬.৩৮% সদস্য বলেছেন।[১১] আবার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র ব্র্যাক ও কারিতাসের কিছু সদস্য যথাক্রমে ৪.৭৬% ও ৩৫.৭১% সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ভূমিকার কথা বলেছেন।[১২] তবে খাবার পানি ও নিত্যব্যবহার্য পানি ব্যবহারে টিউবওয়েলের পানি ব্যবহারের ও ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন কারিতাসের ৭১.৪৩% ওয়ার্ল্ডভিশনের ৩০.৭৭% এবং ব্র্যাকের ৭.১৪% সদস্য। পাকা পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও'র সহযোগিতার কথা বলেছেন-ওয়ার্ল্ডভিশনের ৪৬.১৬ ভাগ এবং কারিতাসের ২১.৪৩ ভাগ সদস্য।[১৩]

সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যে সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি ফলাফলমূলক চিত্র পাওয়া গেলেও গবেষণাটি ছিল একটি মাইক্রো লেবেলের ও নির্দিষ্ট এলাকার ও নির্দিষ্ট এনজিও'র মধ্যে সীমাবদ্ধ মাঠ পর্যায়ের গবেষণা। যদিও এ প্রবন্ধে উক্ত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের খুব সামান্য ও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের তথ্যের উপর আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি উক্ত গবেষণার বিস্তারিত তথ্য ও ফলাফলসহ আলোচনা ব্যাপক গুরুত্ব বহনের দাবী রাখে। সেই সাথে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দেশে কর্মরত এনজিও সমূহের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর গুরুত্বসহকারে ম্যাক্রোলেবেলে মাঠপর্যায়ের গবেষণা হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত এনজিও সমূহের কার্যক্রম দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক ভূমিকা এবং নেতিবাচক দিক দিয়ে নানা মতামত রয়েছে। একদিকে বলা হচ্ছে দেশে এনজিও'র উপস্থিতি সার্বিকভাবে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি করছে। কেননা তাদের সাহায্য দেশে দরিদ্রদের অলসতা ও নিস্পৃহতার সৃষ্টি করছে। এনজিওগুলো তাদের ফান্ডের টাকা সংগ্রহ করতে বিদেশে বাংলাদেশের বিকৃত ও অপমানজনক চিত্র তুলে ধরছে। আরোও ধারণা করা হচ্ছে এনজিওগুলোর বিদেশী সাহায্য যে প্রচুর টাকার সমাগম হয় তা দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার এনজিওদের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে বাজেট বা ব্যয় বরাদ্দ হয়ে থাকে তা বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য নয় বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে। অপরদিকে এনজিও'র সাফল্য সম্পর্কেও অনেক কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে এনজিও'র কর্মসূচীর প্রশংসা ও গ্রাম পর্যায়ে কিছু কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে দাবী করা হয়। আবার এনজিও সমূহ ও তার কার্যক্রমকে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সহায়তাকারী হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে অনেক এনজিও জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর এই বাস্তবতার আলোকেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও অবস্থানের জনগণের এনজিও'র উন্নয়ন কার্যক্রম সর্ম্পকিত মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা জরুরী। তাই এই দিকটি লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। উন্নয়নের সংজ্ঞা বহুবিধ। কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। আবার কারো মতে, এটা একইসাথে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি। যেহেতু উন্নয়নকে এককভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না সেহেতু এখানে বিষয়টিকে সহজ করার জন্য উন্নয়নের সর্বাধিক প্রচলিত দু'একটি সংগার অবতারণা করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটি সংযুক্ত হতে থাকে। আর তাই আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়ন বলতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বোঝায়। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারোর মতে, উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পূণর্বন্টন, চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের একটি বহুদিক বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।[১৪] অন্যদিকে, উন্নয়ন বলতে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার সুযোগ লাভ করবে, তার সুপ্ত গুণাবলী ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে, প্রতিটি কর্মেচ্ছু ব্যক্তি উপার্জন করার সুযোগ পাবে, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ যথা ন্যুনতম আহার, বাসস্থান, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করে ভদ্রোচিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।[১৫] বর্তমানে অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশেও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্য আশ্রয়হীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির ব্যাপক প্রসারের প্রেক্ষিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি উন্নয়নে প্রাথমিক লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয়ভাবে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি কার্যক্রমও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়টি মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল দেশে কর্মরত বিপুল সংখ্যক এনজিও'র কার্যক্রম বা কর্মতৎপরতা।

১.৪ তথ্যসংগ্রহ প্রক্রিয়া

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার দুইটি ইউনিয়নের তিনটি গ্রাম থেকে। গ্রামগুলো হল-মাছগাঁও ইউনিয়নের নটাবাড়ীয়া, জোয়ারী ইউনিয়নের ভবানীপুর এবং কুমল্লু। উল্লেখ্য যে, বড়াইগ্রাম থানায় দীর্ঘদিন ধরে ব্র্যাক, কারিতাস ও ওয়ার্ল্ডভিশন তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নটাবাড়ীয়া গ্রামে ব্র্যাক, ভবানীপুর গ্রামে কারিতাস এবং কুমল্লু গ্রামে ওয়ার্ল্ডভিশন কাজ করছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামতের তথ্য যেভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে তা হল সংশ্লিষ্ট গ্রামের এনজিও'র কার্যক্রমভূক্ত সমিতিগুলোর সদস্যদের এবং স্থানীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ ইউপি সদস্য, শিক্ষক ইমাম ও মাতাব্বরদেরকে বাদ দিয়ে বাকী স্থানীয় সাধারণ জনগণের নিকট থেকে প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ৩টি গ্রামের সংশ্লিষ্ট এনজিও'র কার্যক্রমভূক্ত সমিতিটি যে পাড়ায় অবস্থিত সেই পাড়ার ২০ জন করে মোট ৬০ জন স্থানীয় সাধারণ জনগণকে

নির্বিচারী নমুনায়ন বা রেনডম্ সেম্পলিং এর মাধ্যমে নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সাধারণ জনগণ বা নমুনা হিসেবে তাদেরকেই ধরা হয়েছে যারা কোন এনজিও'র সুবিধাভোগী সদস্য নয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় নেতৃত্ব হিসেবে চিহ্নিত নয়।

১.৫ যৌক্তিকতা

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল যে বিষয় এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত সে সম্পর্কে যথাযথ পর্যালোচনা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে এনজিওগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। তথাপি এনজিও'র কার্যক্রমের মূল যে বিষয় সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং লক্ষ্যদল কেন্দ্রিক দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন সে সম্পর্কিত সাধারণ জনগণের মতামতের উপর কোন যথাযথ জরীপ বা ইনডেপথ্ গবেষণা আমার জানামতে এ পর্যন্ত হয়নি। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট থেকে মতামত সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে যে এনজিওগুলো কাজ করছে সে ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কার্যক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে অত্যন্ত কাছ হতে দেখা অর্থাৎ স্থানীয় সাধারণ জনগণের (এনজিও'র সুবিধা বহির্ভূত) মতামত নিয়ে কোন জরিপ বা পর্যালোচনা হয়নি। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন পেশাজীবীর মতামত নিয়ে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা করেছেন তানভীর আহমেদ খান।[১৬] এছাড়াও মোঃ ছাদেকুল আরেফিনের এম. ফিল. গবেষণার এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় নেতৃত্বের মতামতের উপর ভিত্তি করে তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।[১৭] সুতরাং এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে এবং যৌক্তিক বলে মনে করা যায়।

১.৬ স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত সম্পর্কিত তথ্যের পর্যালোচনা

এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের অর্থাৎ তিনটি গ্রাম থেকে ২০ জন করে মোট ৬০ জনের মতামত সম্পর্কিত যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল। উত্তরদাতা জনগণের বয়সের তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশই ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ শতকরা ৩১.৬৬ ভাগ, এরপরে রয়েছে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ ভাগ, আবার ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ২১.৬৭ ভাগ ও ১৬.৬৭ ভাগ উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারা বিভিন্ন বয়সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবার ধর্মের দিক থেকে ইসলাম ধর্মের ৮৮.৩৩ ভাগ ও হিন্দু ধর্মের ১১.৬৭ ভাগ উত্তরদাতা রয়েছেন। পাশাপাশি উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায় নিরক্ষর জনগণই অধিক শতকরা ৫৩.৩৩ ভাগ। অপরদিকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ১৫ ভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা-১৩.৩৩ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা

১১.৬৭ ভাগ (৬ষ্ঠ থেকে দশম), এস. এস. সি পাস ৩.৩৩ ভাগ এবং এইচ. এস. সি পাস ৩.৩৪ ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিরক্ষর জনগণ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনগণও রয়েছেন যেটা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে ধরা যায়।

স্থানীয় সাধারণ জনগণের পেশা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে কৃষিকাজের পেশায় অধিকাংশ উত্তরদাতা রয়েছে অর্থাৎ ৪৬.৬৭ ভাগ। অন্যান্য পেশার উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন দিনমজুর ৩৫ ভাগ, চাকুরী ৬.৬৭ ভাগ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫ ভাগ, রিক্সা ভ্যানচালক ৫ ভাগ এবং নাপিত ১.৬৬ ভাগ। উত্তরদাতাদের এনজিও'র কোন কোন কর্মসূচী সম্পর্কে তারা অবগত সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যা নিম্নে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো–

সারণী–১ঃ স্থানীয় সাধারণ জনগণ এনজিও'র যে সকল কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত

কর্মসূচীর নাম	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
ঋণদান কর্মসূচী	৯৩.৩৩ (৫৬)
শিক্ষা কর্মসূচী	৮৩.৩৩ (৫০)
পুকুর খনন মৎস্য চাষ	৫৩.৩৩ (৩২)
তুঁত চাষ	৪৩.৩৩ (২৬)
বৃক্ষরোপণ	৩৩.৩৩ (২০)
স্বাস্থ্য	১৮.৩৩ (১১)
বাসস্থান	১৩.৩৩ (৮)
হাঁস মুরগী পালন	১৩.৩৩ (৮)
খাদ্য	১০.০০ (৬)
গরু ছাগল পালন	৬.৬৭ (৪)
আয় বৃদ্ধিমূলক	৬.৬৭ (৪)
যোগাযোগ/ রাস্তাঘাট	৫.০০ (৩)
সঞ্চয়	১.৬৭ (১)
কর্মসূচী বলতে পারে না	১.৬৭ (১)

বিঃ দ্রঃ একই উত্তরদাতা একাধিক কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হওয়ার তথ্য দিয়েছেন।

উল্লেখিত ১ নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখযোগ্য হারে অবগত রয়েছেন যে কর্মসূচী সম্পর্কে তা হল-ঋণদান কর্মসূচী ৯৩.৩৩ ভাগ, শিক্ষা কর্মসূচী ৮৩.৩৩ ভাগ, মৎস্যচাষ ৫৩.৩৩ ভাগ, তুঁতচাষ ৪৩.৩৩ ভাগ, বৃক্ষরোপণ ৩৩.৩ ভাগ, স্বাস্থ্য ১৮.৩৩ এছাড়াও বাসস্থান, হাঁস মুরগী পালন ১৩.৩৩ ভাগসহ আরও অন্যান্য কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু উত্তরদাতা অবগত রয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, একই উত্তরদাতা একাধিক কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হওয়ার তথ্য দিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মরত এনজিও'র কর্মকর্তা/কর্মীগণের কাজের ধরন সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছিল। যা নিম্নে ২ নং সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং-২ এনজিও'র কর্মকর্তা/কর্মীগণের কাজের ধরন সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত

কাজের প্রতি	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
আন্তরিক	৬১.৬৭ (৩৭)
মোটামুটি	১৫.০০ (৯)
সৌজন্যমূলক	৬.৬৭ (৪)
বলতে পারে না	১৬.৬৬ (১০)
মোট	১০০%

উল্লেখিত ২ নং সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই কাজের ক্ষেত্রে আন্তরিক বলেছেন। এরা ৬১.৬৭ ভাগ। পাশাপাশি মোটামুটি ১৫ ভাগ, সৌজন্যমূলক ৬.৬৭ ভাগ বলেছেন। আবার বলতে পারে না এরকম উত্তরদাতা রয়েছেন ১৬.৬৬ ভাগ। এছাড়াও উত্তরদাতাদের সাথে এনজিও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্ক কিরূপ সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সম্পর্ক ভাল বলেছেন ৬৩.৩৩ ভাগ, মোটামুটি ১৫ ভাগ, খারাপ ৩.৩৩ ভাগ এবং কোন সম্পর্কে নেই বলেছেন ১৮.৩৪ ভাগ। আর একটি বিশেষ বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যেটা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কৌতুহল ও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সেটি হল কিছু কিছু বিদেশী এনজিও গ্রামের ব্যাপক দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের

শতকরা ১০০ ভাগই বলেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার এনজিওগুলো ধর্মান্তরিত করছে না বা তারা কোন মানুষকে ধর্মান্তরিত হতেও শোনেননি। এছাড়াও গ্রাম এলাকায় কর্মরত সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিও'র কর্মতৎপরতার তুলনা সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

সারণী নং ৩ ঃ সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের* ও এনজিও'র কর্মতৎপরতার তুলনা সম্পর্কিত স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামতের তথ্য

কর্মতৎপরতার ধরন	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
এনজিও'রা অধিক তৎপর	৬৮.৩৩ (৪১)
এনজিও এবং সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একই রকম তৎপর	২০.০০ (১২)
এনজিওগুলো কম তৎপর	৫ (৩)
এনজিও'রা মোটামুটি তৎপর	৩.৩৩ (২)
বলতে পারে না	৩.৩৪ (২)
মোট	১০০% (৬০)

*এখানে সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বলতে বিআরডিবি, আরএসএস এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখিত ৩ নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাম এলাকায় সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে এনজিও'রাই অধিক তৎপর বলেছেন ৬৮.৩৩ ভাগ। আবার এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠান একই রকম বলেছেন ২০ ভাগ। তবে এনজিওগুলো কম তৎপর বলেছেন মাত্র ৫ ভাগ উত্তরদাতা। সুতরাং উল্লিখিত তথ্যগুলি দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে নানা দিক থেকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এনজিও'র কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের যে মতামত চাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান তৈরী/সংস্কারের জন্য এনজিও'র পক্ষ থেকে যে

ব্যবস্থা নেয়া উচিত তাতে তারা শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন বাসস্থানের জন্য নগদ টাকার পরিবর্তে নির্মাণ সামগ্রী ঋণ হিসেবে ও স্বল্প সুদে দেয়া উচিত। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান / আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য এনজিও কর্তৃক যে ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেয়া উচিত সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নে সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল-

সারণী নং-৪ঃ এনজিও কর্তৃক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত।

প্রশিক্ষণের নাম	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
কারিগরী প্রশিক্ষণ	৬০ (৩৬)
কুটির শিল্প	৪৫ (২৭)
সেলাই	৩৫ (২১)
হাঁস মুরগী পালন	৩০ (১৮)
মোটরগাড়ী চালনা এবং নির্মাণ	২৫ (১৫)
উন্নত কৃষি প্রযুক্তি	১৫ (৯)
হাঁস মুরগী, গরু ছাগল এর চিকিৎসা	১৫ (৯)
গরু ছাগল পালন	১০ (৬)
রিক্সা/সাইকেল মেরামত	৫ (৩)
ব্যবস্থাপনা (ব্যবসার উন্নতি)	৫ (৩)
কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত	৫ (৩)
সবজি চাষ	৩.৩৩ (২)
ওয়েল্ডিং	৩.৩৩ (২)
কাঠমিস্ত্রি	১.৬৭ (১)
বলতে পারে না	৩.৩৩ (২)

বিঃদ্রঃ একই উত্তরদাতা একাধিক ক্ষেত্রে মতামত দিয়েছেন।

উল্লেখিত সারণী নং ৪ এ দেখা যায় কারিগরী প্রশিক্ষণ ৬০ ভাগ, কুটির শিল্প ৪৫ ভাগ, সেলাই ৩৫ ভাগ, হাঁস মুরগী ৩০ ভাগ, মটরগাড়ী, রিক্সা মেরামত ও চালনা ২৫ ভাগ, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও হাঁস মুরগী ও গরুছাগল চিকিৎসা ১৫ ভাগসহ আরও অন্যান্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে এখানে উত্তরদাতারা একাধিক প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। অন্যদিকে, গ্রাম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য এনজিও কর্তৃক কি ধরনের কর্মসূচী থাকা উচিত সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই মতামত হল নগদ টাকা ঋণ দেয়ার পরিবর্তে উপকরণ সামগ্রী ঋণ হিসেবে দেয়া উচিত বলে মনে করেন। উপকরণ সামগ্রীর ধরন সম্পর্কে ৭৩.৩৩ ভাগ উত্তরদাতা গরু-ছাগল, রিক্সাভ্যান ৬৫ ভাগ, হাঁস মুরগী ৬১.৬৭ ভাগ বলেন। তবে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার কথাও ৩৩.৩৩ ভাগ উত্তরদাতারা বলেন। এনজিও কর্তৃক কি ধরনের শিক্ষা কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই শিশু শিক্ষা কর্মসূচী নেয়ার কথা বলেন অর্থাৎ ৯৫ ভাগ। এছাড়া কারিগরী শিক্ষা ৭০ ভাগ, বয়স্ক শিক্ষা ৬০ ভাগ ছাড়াও সেলাই শিক্ষা, কৃষি বিষয়ক শিক্ষার কথাও অনেক উত্তরদাতা বলেছেন। এখানে উত্তরদাতারা একাধিক কর্মসূচীর কথা বলেছেন। এনজিও কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচী অধিক ফলপ্রসূ হবে কি না সে সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের কাছে মতামত নেয়া হয়েছিল যা নিম্নে সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণী নং-৫ঃ এনজিও'র শিক্ষা কর্মসূচী ফলপ্রসু হবে কিনা তৎসম্পর্কিত স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত।

মন্তব্যের ধরণ	শতকরা হার (গণ সংখ্যা)
ফলপ্রসূ হবে	৫৮.৩৩ (৩৫)
ফলপ্রসূ হবে না	৩৮.৩৪ (২৩)
বলতে পারে না	৩.৩৩ (২)
মোট	১০০% (৬০)

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতাই মতামত দিয়েছেন এনজিও'র শিক্ষা কর্মসূচী ফলপ্রসূ হবে অর্থাৎ ৫৮.৩৩ ভাগ। অপরদিকে ফলপ্রসূ হবে না বলেছেন ৩৮.৩৪ ভাগ। সুতরাং মতামত দু'টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

গ্রাম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে এনজিও কর্তৃক কি ধরনের কর্মসূচী নেয়া উচিৎ সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই ৭১.৬৭ ভাগ চিকিৎসাকর্মী নিয়োগের কথা বলেছেন। পাশাপাশি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ প্রকল্প ৫৬.৬৭ ভাগ, রোগ প্রতিরোধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা ৫১.৬৭ ভাগ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা প্রকল্প ৪৬.৬৭ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার এনজিও'র মধ্যে কারা উপযোগী সে সম্পর্কিত মতামতে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই ৩৬.৬৭ ভাগ উভয়ের কথা বলেছেন। অন্যদিকে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা ৩৩.৩৩ ভাগ, এবং এনজিও'র কথা ৩০ ভাগ বলেছেন। এ তথ্যে সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায়। তবে এনজিও'র বিষয়টিও গুরুত্বহীন নয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এনজিও সংগঠিত সমিতির সুবিধাভোগী সদস্যদের এনজিও কার্যক্রমের ফলে কোন উন্নয়ন হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত গৃহীত হয়েছিল যা নিম্নে সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণী নং-৬ঃ এনজিও সংগঠিত সমিতির সদস্যদের উন্নয়ন হচ্ছে কি না তৎসম্পর্কিত স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত

মতামতের ধরন	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
উন্নয়ন	৩১.৬৭ (১৯)
সামান্য উন্নয়ন	৪৬.৬৬ (২৮)
উন্নয়ন হচ্ছে না	২০ (১২)
বলতে পারে না	১.৬৭ (১)
মোট	১০০% (৬০)

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতাদের ৪৬.৬৬ ভাগের মতামতই হল এনজিও সংগঠিত সমিতির সদস্যদের সামান্য উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়ন হচ্ছে বলেছেন ৩১.৬৭ ভাগ। অপরদিকে উন্নয়ন হচ্ছে না বলেছেন ২০ ভাগ। উল্লেখ্য যে, এখানে উন্নয়ন বলতে এনজিও কার্যক্রমের আওতায় যে সমস্ত কর্মসূচীর সুবিধা সমিতির সদস্যরা ভোগ করেছেন যেমনঃ ঋণ,

প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধি প্রকল্প, সচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী।

এনজিও কার্যক্রমের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় এনে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–এনজিও কার্যক্রমের ফলে সমগ্র বড়াইগ্রাম থানায় আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে, যা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো–

সারণী নং–৭ঃ এনজিও'র কার্যক্রমের ফলে বড়াইগ্রাম থানার আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত।

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
শিক্ষা	৬৩.৩৩ (৩৮)
আয়বৃদ্ধি	৫৩.৩৩ (৩২)
সচেতনতাবৃদ্ধি	২৫ (১৫)
বাসস্থান	৫ (৩)
স্বাস্থ্য	৫ (৩)
সঞ্চয় বৃদ্ধি	৩.৩৩ (২)
বনায়ন	১.৬৭ (১)
ইরিগেশন	১.৬৭ (১)
যোগাযোগ/ রাস্তাঘাট	১.৬৭ (১)
টিউবওয়েল/পাকা পায়খানা সরবরাহ	১.৬৭ (১)
পরিবর্তন হচ্ছে না	২৬.৬৭ (১৬)

বিঃ দ্রঃ এখানে একই উত্তরদাতা একাধিক ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত সারণী নং ৭ এ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশরাই ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। যেমনঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ৬৩.৩৩ ভাগ, আয়বৃদ্ধি ৫৩.৩৩ ভাগ, সচেতনতা বৃদ্ধি ২৫ ভাগ

এছাড়াও বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সঞ্চয়, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোনরূপ পরিবর্তন হচ্ছে না বলেছেন ২৬.৬৭ ভাগ উত্তরদাতা।

সবশেষে এনজিও'র কার্যক্রম বা কর্মসূচী কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা উচিৎ সে সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। যা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণী নং-৮ঃ এনজিও'র কার্যক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা উচিত সে সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত

সম্প্রসারণের ক্ষেত্র	শতকরা হার (গণসংখ্যা)
শিক্ষা প্রকল্প	৭৬.৬৭ (৪৬)
কর্মসংস্থান	৬১.৬৭ (৩৭)
স্বাস্থ্য শিক্ষা	৫৩.৩৩ (৩২)
আয় বৃদ্ধি	২০ (১২)
ঋণদান কর্মসূচী	১৩.৩৩ (৮)
প্রশিক্ষণ	৬.৬৭ (৪)
মৎস্য চাষ	৫ (৩)
বাসস্থান	৩.৩৩ (২)
যোগাযোগ/রাস্তাঘাট উন্নয়ন	৩.৩৩ (২)
কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্প	১.৬৭ (১)
আয় বৃদ্ধির উপকরণ সহায্য প্রকল্প	১.৬৭ (১)
সম্প্রসারণ ক্ষেত্র বলতে পারে না	১.৬৭ (১)
কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা উচিৎ নয়	২১.৬৭ (১৩)

বিঃ দ্রঃ এখানে একই উত্তরদাতা একাধিক ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই এনজিও'র কর্মসূচী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষায় ৭৬.৬৭ ভাগ, কর্মসংস্থানে ৬১.৬৭ ভাগ, আয়বৃদ্ধিতে ২০ ভাগ, ঋণদান কর্মসূচীতে ১৩.৩৩ ভাগ সহ প্রশিক্ষণ, মৎসচাষ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বাসস্থান, বৃক্ষরোপণসহ নানা ক্ষেত্রে কর্মসূচী আরও সম্প্রসারণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে শতকরা ২১.৬৭ ভাগ উত্তরদাতাদের মতামতে। তারা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা উচিৎ নয় বলে মতামত দিয়েছেন। যদিও এদের হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতার অধিকাংশই এনজিও'র কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের পক্ষে।

১.৭ উপসংহার

উপরোক্ত সার্বিক এই আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, এনজিও'র কার্যক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতা স্থানীয় সাধারণ জনগণ সচেতন ও সজাগ রয়েছেন। যেটা স্থানীয় এলাকায় এনজিও'র কার্যক্রম ও কর্মসূচী তথা কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছে বলে ধারণা করা যায়। কেননা প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতারাই এনজিও'র প্রধান প্রধান কর্মসূচী সম্পর্কে বলেছেন যেমনঃ ঋণদান ও শিক্ষা কর্মসূচী। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত এনজিও'র কর্মকর্তা/কর্মীগণের কাজের ধরন সম্পর্কে উত্তরদাতারাই আন্তরিক বলেছেন। আবার সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিও'র কর্মতৎপরতার তুলনায় এনজিও কে অধিক তৎপর বলে মতামত দিয়েছেন অধিকাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচীর মতামত এর ক্ষেত্রে বাসস্থান, আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সরাসরি টাকা দেয়ার পরিবর্তে উপকরণ বা সামগ্রী ঋণ হিসাবে দেয়ার বিষয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন। কেননা তাদের মতে, নগদ টাকা ঋণ হিসেবে দিলে অভাবের কারণে অন্য খাতে খরচ করে ফেলবে। কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থানের জন্যেও অধিকাংশ উত্তরদাতা কারিগরি ও কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। এছাড়া, শিক্ষা কর্মসূচীর মতামতের ক্ষেত্রে ৯৫% উত্তরদাতাই শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পাশাপাশি শিক্ষা কর্মসূচী এনজিও কর্তৃক অধিক ফলপ্রসূ হবে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই মতামত ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি, এনজিও কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে মতামত চাওয়া হয়েছিল–তাতে দেখা যায় অধিকাংশ স্থানীয় জনগণ শিক্ষা ও আয়বৃদ্ধি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে এনজিও'র সুবিধাভোগী সমিতির সদস্যদের উন্নয়নের কথাও অধিকাংশ উত্তরদাতার কাছ থেকে পাওয়া যায়। আবার সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক মতামতও পাওয়া গেছে। পাশাপাশি এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী যেমনঃ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, ঋণদানসহ উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচী আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকারি কর্মসূচীর মত এনজিও কর্মসূচী দেশব্যাপী সম্প্রসারিত না হলেও সীমিত পরিসরে এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়ে থাকে সরকারি কর্মসূচীর দেশব্যাপী সম্প্রসারণের ফলে কর্মসূচী বাস্তবায়নে লোকবলের

অভাব রয়েছে। অপরদিকে এনজিও কার্যক্রম সীমিত এলাকায় এবং প্রয়োজনের বেশি লোকবল দ্বারা পরিচালিত। পারম্পরিক এই বক্তব্যে এনজিও কার্যক্রমের সাফল্য ক্ষীণ করে দেখার চেষ্টা হলেও সারা দেশব্যাপী সরকারি কর্মসূচীর যে অব্যবস্থা চলছে এটা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই হিসাবে এনজিও কার্যক্রম বা মডেলকে সরকারিভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচ্য। প্রাসঙ্গিকভাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অস্থায়ী সরকারের সময়ে গঠিত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টেও এনজিও'র কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম এলাকায় কর্মরত এনজিও'র কার্যক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে অতি নিকট হতে দেখা ও স্থানীয় চাহিদা এবং প্রয়োজন (local need) ভিত্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামতের বিষয়টি আগামী দিনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য নির্দেশঃ

১। *দৈনিক বাংলা,* ৭ই জুলাই, ১৯৯২, পৃ.৩।

২। K. M. Tipu Sultan, "Partnership in Development: Government-NGO Collaboration" *ADAB NEWS,* Jan-March, 1991, pp. 45-46.

৩। Merio Padron, "Non-Governmental Development Organizations From Development Aid to Development Co-operation", Oxford: *World Development* Vol. 15. Supplement, 1987, p.70.

৪। মিজানুর রহমান শেলী, "এনজিও বিতর্কঃ হাওয়াই ঝগড়া" *দৈনিক সংবাদ,* ১১ই আষাঢ়, ১৩৯৬।

৫। Khawaja Shamsul Huda and Azfar Hussain, "Genesis and Growth of NGOs in Bangladesh", *ADAB NEWS,* Dhaka; May-June, 1990, pp. 3-4.

৬। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল,* (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, ১৯৮৮) পৃ. ১০।

৭। মোঃ ছাদেকুল আরেফিন, গ্রামবংলার দরিদ্র জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রমঃ বড়াইগ্রাম উপজেলায় একটি সমীক্ষা, (অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস), ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ১২২।

৮। *তদেব* পৃ. ১০৬।

৯। *তদেব* পৃ. ১১৯।

১০। *তদেব* পৃ. ১৫৪।

১১। *তদেব* পৃ. ১৫৯।

১২। *তদেব* পৃ. ১৬১।

১৩। *তদেব* পৃ. ১৬৫-১৭০।

১৪। Michel P. Todaro, *Economic Development in the Third World,* 3rd ed. (New York and London: Longman, 1985), p. 85.

১৫। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজকর্ম,* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ৭৬-৭৭।

১৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Tanvir A. Khan, "A Compilation of the thinking of 'Concerned' Groups towards the role of N.G.O s in National Development", *ADAB NEWS,* Dhaka: May-June, 1990, p. 57.

১৭। সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য দেখুন, মোঃ ছাদেকুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭৮-২০৬।

মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ রাজশাহীস্থ 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ সাদেক
সেলিনা বানু

সারসংক্ষেপ

সম্প্রতি পরিচালিত একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। রাজশাহীস্থ 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' মহিলা সমাজের বিশেষ করে তার কর্ম পরিধির আওতাভূক্ত এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আথ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে দুঃস্থ বলতে জীবন ধারনের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম দরিদ্র মহিলাদের (যেমন-বিবাহিতা অর্থাৎ যারা স্বামীর সাথে বসবাস করছে, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, পরিত্যক্তা, অনূঢ়া) চিহ্নিত করা হয়েছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে পুরুষের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদাশীল করে তুলতে ও তাদের সনাতন ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার পরিবর্তন আনয়নে এ প্রতিষ্ঠান ব্যবহারিক ও সামাজিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে যাচ্ছে। 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের' অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কিত পর্যালোচনা এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মহিলাদের অধিকাংশ বিবাহিতা, এক-পঞ্চমাংশ তালাকপ্রাপ্তা এবং এক-দশমাংশ বিধবা। বাড়তি আয়ের আশায় অধিকাংশ মহিলা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ মহিলা পোশাক তৈরীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। উত্তরদাত্রীদের বৃহদাংশ তাদের প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনে প্রয়োগ করতে পেরেছে এবং বেশীরভাগ ঘরে বসে উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য উপার্জনের অংক বিবেচনায় বলা চলে যে, অধিকাংশ মহিলাদের আয়ই নগণ্য। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের' ভূমিকা নিরূপণের প্রচেষ্টা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশি মহিলার পারিবারিক এবং তিন-চতুর্থাংশের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমিকা

একটি স্থানীয় ভিত্তিক মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তার উপকারভোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে তা নিরূপণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূললক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রায় ১৯০১টি মহিলা

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ব্যবহারিক ও সামাজিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে এসব সংস্থায় আগত দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।[১] এসব কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে জড়িত করে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

"মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানা ও পবা উপজেলার সমগ্র এলাকা এর কর্ম পরিধির আওতাভূক্ত। 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের' উদ্দেশ্য তার নির্ধারিত কর্ম এলাকার দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের বিভিন্ন বৃত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের উপার্জনক্ষম ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আত্মসচেতনতা জাগ্রত করা। এ প্রতিষ্ঠান মহিলাদের জন্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- চামড়া, দর্জি, উলবুনন, এমব্রয়ডারী, পাট, তাঁত, ব্লক/বাটিক, হাঁস/মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, সজি বাগান, বৃত্তিমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে স্থাপিত হলেও এর প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৩০০ জন মহিলা এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এসব মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্যক্রম, পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মহিলা ও সর্বোপরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজকর্ম বিভাগ' কর্তৃক ফিল্ড প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু মহিলা 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের' বিভিন্ন উৎপাদনমূলক বিভাগে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া কিছু মহিলা স্থানীয়ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থেকে এবং কেউ কেউ ঘরে বসে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় উপার্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রধানতঃ দু'ধরনের তথ্য সংগ্রহের প্রযোজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমে গবেষণার বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্মসূচীর প্রকৃতি ও তাদের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সংস্থা থেকে যারা সরাসরি উপকৃত হয়েছে তাদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে

১। ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলতে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে যারা মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে উঠে এবং এসব কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সদস্যদের চাঁদা ও সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করে।

প্রশিক্ষণগ্রহণকারী মহিলাদের গবেষণার সমগ্রক ধরে সাক্ষাৎকার অনুসূচী ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তরদাত্রীদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে মোট ৩৪৩ জন মহিলা 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে উত্তরদাত্রীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, পরিবারে তাদের অবস্থান, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং সর্বোপরি উত্তরদাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অর্ন্তদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের এ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষিত ঘটনাসমূহও লিপিবদ্ধ করা হয়। গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়। উল্লেখ্য যে, ৩৪৩ জন মহিলার ঠিকানা 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৪৫ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২৯৮ জন মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় এবং এ ২৯৮ জন মহিলার কাছ থেকেই সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

অংশগ্রহণকারী মহিলাদের পারিবারিক ও সমাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করার পূর্বে তাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে যেসব মহিলা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের বয়স, শিক্ষা, বৈবাহিক অবস্থা, অভিভাবকের পেশা, অভিভাবকের শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের মাসিক গড় আয় ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী জরীপভূক্ত মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী (৫৪.৩৬%) বিবাহিতা, প্রায় এক–পঞ্চমাংশ মহিলা তালাকপ্রাপ্তা (১৯.৪৬%) এবং অবিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যা যথাক্রমে এক–দশমাংশ (১০.০৭%) ও এক–পঞ্চমাংশের কিছু বেশী (২১.৪১%)। এছাড়া স্বামী থেকে পৃথকভাবে বাস করছে এরূপ মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪.৭০ জন। নাম সই করতে পারে এবং যৎসামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে এরূপ মহিলার সংখ্যাই বেশী (৮০.২০%)। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি পর্যায়ের শিক্ষামানের অন্তর্ভূক্ত মহিলা অতি অল্প। উল্লেখ্য, স্নাতক কিংবা তদুর্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত কোন মহিলা এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। অধিক সংখ্যক মহিলারাই পারিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি (৫–৮ জন, ৫০.৩৩%)। মহিলাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৬ জন। গড়ে ৩৩.২৫ বছর বয়সের মহিরাই এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের স্বামী ও অভিভাবকদের প্রায় সবাই ছোট–খাট পেশায় যেমন–খুদে ব্যবসায়, দিনমজুর, রিক্সাচালক, ছোট–খাট চাকুরী, কৃষি শ্রম ইত্যাদিতে নিয়োজিত। রিক্সাচালক অভিভাবকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (২৯.৩০%) স্বামী ও অভিভাবকের শিক্ষার মানও অনেক নীচু। অশিক্ষিত এবং শুধু নাম সই করতে পারে এরূপ অভিভাবকের সংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে একটু কম (৪৬.৮৯%)। দুই–পঞ্চমাংশ (৪১.৩৯%) ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। মাধ্যমিক, উচ্চ–

মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষামানের স্বামী / অভিভাবকের সংখ্যা খুব নগন্য। উত্তরাদাত্রীদের স্বামী/অভিভাকের মাসিক আয়ও কম। মহিলাদের আয় ছাড়া তাদের পরিবারের মাসিক গড় আয় ১০৬৮.২৯ টাকা। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় (১৯৯০) মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৬০০ টাকা পর্যন্ত পরিবারকে দরিদ্রতম, ১৬০১ থেকে ২৩০০ টাকা পর্যন্ত পরিবারকে দরিদ্র এবং তদুর্ধ আয় সম্পন্ন পরিবারকে স্বচ্ছল পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাত্রীদের পরিবারের মাসিক আয় সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, এসব মহিলাদের পরিবারের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২২৮৯.১৯ টাকা। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা (১৯৯০) অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের পরিবারগুলোকে দরিদ্র পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

উত্তরদাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও আয়

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মহিলাদের অর্থোপার্জন ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হচ্ছে তা নিরূপণের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনের কাজে প্রয়োগ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের নিজস্ব মাসিক গড় আয় ও আয়ের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়ঃ

সারণী নং ১ঃ প্রশিক্ষণের বিষয় অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

প্রশিক্ষণের বিষয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পাটের কাজ	৫৮	১৯.৪৬
দর্জির কাজ	১৫০	৫০.৩৪
উলবুনন (হাত)	৯৮	৩২.৮৯
উলবুনন (মেশিন)	২৫	৮.৩৯
কাপড় ছাপা	২৮	৯.৪০
চামড়ার কাজ	১৯	৬.৩৮
এমব্রয়ডারী (হাত)	৬৫	২১.৮১
এমব্রয়ডারী (মেশিন)	১৫	৫.০৩
তাঁত	৪৩	১৪.৪৩
হাঁস/মুরগী পালন	–	–
সব্জি বাগান	–	–
মোট	৫০১	

বিঃদ্রঃ অনেক উত্তরদাত্রী একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় গণসংখ্যা ২৯৮ এর বেশি হয়েছে।

উত্তরদাত্রীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মহিলা (৫০.৩৪%) পোশাক তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া হাতে উলবুনন (৩২.৮৯%), পাট(১৯.৪৬) ও হাতে এমব্রয়ডারী (২১.৮১) বিষয়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তবে কাপড় ছাপা, চামড়া, মেসিনে উলবুনন, মেসিনে এমব্রয়ডারী ও তাঁতের কাজে খুব নগণ্য সংখ্যক মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, হাঁস/মুরগী পালন ও সব্জি বাগান বিষয়ক প্রশিক্ষণকে তারা অর্থোপার্জনে নিয়োগ করেনি

(সারণী নং ১)। এ বিষয় দুটোর উপর মহিলাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। এ সম্পর্কিত কিছু পদ্ধতিগতদিক মহিলাদের ব্যবহারিক ক্লাশে জানিয়ে দেয়া হয় মাত্র। ফলে প্রতিষ্ঠানে যেসব মহিলা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আসে তারা প্রত্যেকেই এ বিষয় দু'টো সম্পর্কে কিছু না কিছু পদ্ধতিগত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে ২৯৮ জন উত্তরদাত্রীর মধ্যে বৃহদাংশ (২০৬ জন অর্থাৎ ৬৯.১৩%)মহিলা তাদের লব্ধ প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনে প্রয়োগ করতে পেরেছে। বাকী ৯২ জন অর্থাৎ ৩০.৮৭% মহিলা নিজেদেরকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। যারা প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়েছে তাদের মধ্যে ১৩৯ জন অর্থাৎ (৬৭.৪৮%) 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের' বিভিন্ন উৎপাদনমূলক বিভাগে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত। অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থেকে আয় করছে ১০.৬৮% মহিলা।

সারণী নং ২ঃ উত্তরদাত্রীদের অর্থোপার্জনমূলক কাজের ধরন

অর্থোপার্জনমূলক কাজ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পাটের কাজ	১২	৫.৮২
দর্জির কাজ	১২৬	৬১.১৬
উলবুনন (হাত)	৭৭	৩৭.৩৭
উলবুনন (মেশিন)	৮	৩.৮৮
কাপড় ছাপা	১২	৫.৮২
চামড়ার কাজ	৭	৩.৪০
এমব্রয়ডারী (হাত)	৫১	২৪.৭৫
এমব্রয়ডারী (মেশিন)	৫	২.৪৩
তাঁত	৫	২.৪২
হাঁস/মুরগী পালন	–	–
সজি বাগান	–	–
মোট	৩০৩	

বিঃ দ্রঃ পেশা গ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা ২০৬ জন। কিন্তু কোন কোন উত্তরদাত্রী একাধিক প্রশিক্ষণকে অর্থ–উপার্জনের কাজে লাগানোর জন্য গণসংখ্যা ২০৬ এর অধিক হয়েছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (৬১.১৬%) মহিলা দর্জির কাজে নিয়োজিত। এরপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা হাতে উলবুনন (৩৭.৩৭%) ও হাতে এমব্রয়ডারী (২৪.৭৫%) প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে কিছু না কিছু অর্থ–উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া পাট, কাপড়ছাপা, চামড়া, তাঁত, মেসিনে উলবুনুন, মেসিনে এমব্রয়ডারীর কাজ করে কিছু কিছু মহিলা অর্থ–উপার্জন করছে, তবে সংখ্যার দিক থেকে তা অতি নগণ্য। হাঁস/মুরগী পালন ও সজিবাগান এ দুটো বিষয়কে কোন মহিলাই উপার্জনশীল কাজ হিসাবে গ্রহণ করেনি (সারণী নং–২)। গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত ২৯৮ জন মহিলার মধ্যে ২৬১ জন অর্থাৎ ৮৭.৫৮% মহিলা এ দু'বিষয়ের প্রশিক্ষণকে গৃহ কাজে লাগাতে পেরেছে। এদের সবাই বাড়ীতে সম্ভবত কিছু হাঁস/মুরগী পালন ও সজির চাষ করে থাকে, যা থেকে তাদের পরিবারের কিছুটা খাদ্যের সংস্থান হয় মাত্র। অনেকে তাদের উৎপাদিত হাঁস/মুরগী ও সজি থেকে যৎসামান্য বিক্রয়ও করে কিন্তু আর্থিক দিক থেকে তা

তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যারা প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনের কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা ব্যর্থতার কারণ হিসাবে পিতা-মাতার নিষেধ (২.১৭%), স্বামীর বাধা (৯.৭৮%), তৈরী জিনিসের চাহিদার অভাব (১০.৮৭%), উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়া (৭.৬১%), মূলধন, সেলাইকল ও বুননকলের অভাব (৬৫.২২%), বাজারজাতকরণের অসুবিধা (৪.৩৫%) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে।

সারণী নং -৩ঃ মাসিক গড় আয় অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

মাসিক গড় আয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১-২০০	১১৫	৫৫.৮৩
২০১-৪০০	৪৬	২২.৩৩
৪০১-৬০০	২৮	১৩.৫৯
৬০১-৮০০	৮	৩.৮৮
৮০১-২০০০	৯	৪.৩৭
মোট	২০৬	১০০

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশের (৫৫.৮৩%) মাসিক গড় আয় খুবই নগণ্য (১-২০০) টাকার মধ্যে। এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি (৩৫.২%) মাসে গড়ে ২০১-৪০০ এবং ৪০১-৬০০ টাকার মধ্যেই আয় করে। মাত্র ৩.৮৮% মহিলা মাসে গড়ে ৬০১-৮০০ এবং ৪.৩৭% মহিলা ৮০১-২০০০ টাকার মধ্যে আয় করে। মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থ কি কাজে ব্যবহার করে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, প্রায় চার-পঞ্চমাংশ মহিলা (৭৩.৭৯%) পরিবারের খাদ্যক্রয়ে অর্থাৎ পরিবারের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় তাদের অর্থ ব্যয় করে থাকে (সারণী-৪)।

সারণী নং ৪ঃ উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আয়ের ব্যবহার অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ।

আয়ের ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারের খাদ্য ক্রয়ে	১৫২	৭৩.৭৯
কাপড় ক্রয়ে	১২০	৫৮.২৫
চিকিৎসার ক্ষেত্রে	৮০	৩৮.৮৩
ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কাজে	৭৭	৩৭.৩৮
বাড়ীঘর মেরামতের কাজে	৫০	২৪.২৭
জমি ক্রয়	৩	১.৪৩
জমি বন্ধক নিতে	২	.৯৭
অলংকার ক্রয়ে	৩৫	১৬.৯৯
আসবাবপত্র ক্রয়ে	২৫	১২.১৪
সঞ্চয় করে	১২৮	৬২.১৪
	৬৭২	

বিঃ দ্রঃ অনেক উত্তরদাত্রী একাধিক কাজে তাদের আয়ের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করায় গণসংখ্যা ২০৬ এর অধিক হয়েছে।

কাপড় ক্রয়, চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ও বাড়ীঘর মেরামতের কাজেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাকে (এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক) তাদের আয় ব্যয় করতে হয়। ৩৫ জন অর্থাৎ ১৬.৯৯% মহিলা তাদের আয় অলংকার ক্রয়ে এবং ২৫ জন অর্থাৎ ১২.১৪% মহিলা তাদের আয় আসবাবপত্র ক্রয়ে ব্যয় করে। উল্লেখ্য, প্রায় অর্ধেকের বেশি মহিলা তাদের স্বল্প আয়ের মধ্য থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করছে। সুতরাং সিংহভাগ মহিলাই তাদের আয় পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণেই ব্যয় করে।

উত্তরদাত্রীদের আয় সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২৯৮ জন উত্তরদাত্রীর মধ্যে ২০৬ জন (৬৯.১৩%) তাদের প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনের কাজে লাগাতে সক্ষম হলেও অধিকাংশ (৫৫.৮৩%) উত্তরদাত্রীর মাসিক গড় আয়ের পরিমাণই অতি নগণ্য (১-২০০ টাকার মধ্যে)। মহিলাদের মধ্যে ৪৬ জন (২২.৩৩%) মাসে গড়ে ২০১-৪০০ এবং ২৮ জন (১৩.৫৯%) ৪০১-৬০০ টাকার মধ্যে আয় করে, যারা তাদের পরিবারকে আংশিকভাবে শুধু সাহায্য করতে সক্ষম। ৬০১-৮০০ ও ৮০১-১২০০ টাকা আয়কে সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করলে দেখা যায়, উপার্জনকারী মহিলাদের মধ্যে শুধুমাত্র শতকরা ৮.২৫ জন এ পর্যায়ভূক্ত। এ থেকে বলা যায়, 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের আর্থিক উন্নতি বিধানে বিশেষ সহায়ক হয়নি। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণগ্রহণ করলেও উত্তরদাত্রীদের ৩০.৮৭% জন পরিবার পুরুষ সদস্যের উপর আর্থিক দিক দিয়ে পূর্ণভাবে এবং ৬৩.৪২% জন আংশিকভাবে নির্ভরশীল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন অর্থাৎ ৫.৭০% মহিলা নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ উপযোগী আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা

এই গবেষণায় মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের জন্য যেসব সূচক ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(১) পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ (২) পরিবারে মতামত প্রদান (৩) পরিবারে পরামর্শের ধরন। (৪) পারিবারিক জীবনে উত্তরদাত্রীদের সম্পর্কের উন্নয়ন (৫) সাংসারিক কাজে জবাবদিহি করার ধরন। (৬) পরিবারের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত

পারিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির একটি প্রধান পরিচায়ক। আমাদের সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মধ্যে আয় বন্টনের যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ আর্থিক সুবিধা এবং পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুরুষ সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে। সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষেরা (Adnan 1989: 3-16)। ধারণা করা হয় যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন পরিবার ও সমাজে মহিলাদের মর্যাদাশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ায় সক্ষম করে তোলে। এ উদ্দেশ্যে পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য সারণী-৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণী নং-৫ঃ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্বামী	৩০	১০.০৭
পিতা	৭৫	২৫.১৭
ভাই	২৩	৭.৭২
নিজেই	৩০	১০.০৭
মাতা	৮	২.৬৮
স্বামী-স্ত্রী একত্রে	১৩২	৪৪.২৯
মোট	২৯৮	১০০

বিঃ দ্রঃ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলতে ভাই/ বোন/ সন্তানের বিবাহ, ভাই/ বোন/ সন্তানের স্কুলে ভর্তি, ঋণ দেয়া নেয়া, বন্ধু/ বান্ধব প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করা, বড় ধরনের কিছু ক্রয় করা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে এরূপ মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য (৪৪.২৯%)। এক চতুর্থাংশ পরিবারে (২৫.১৭%) পিতা পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় স্বামী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা নিজেই, ভাই ও মায়ের প্রাধান্যের কথা বলেছে যথাক্রমে শতকরা ১০.০৭, ১০.০৭, ৭.৭২ ও ২.৬৮ জন। মূলত বিধবা, পরিত্যক্তা ও পৃথক মহিলারাই নিজেই গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এসব মহিলাদের পরিবারে কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকায় নিজেই পরিবার প্রধান হওয়ায় পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত তারা নিজেই নিয়ে থাকে। পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষ্য করা না গেলেও বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ৮১.৪৮% মহিলাই পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদানে তাদের স্বামীর সাথে সমভাবে অংশগ্রহণ করে। আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরদাত্রীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণ এ হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বর্তমান গবেষণার এ তথ্যের সাথে ১৯৮৮ সালে বেগম কর্তৃক পরিচালিত "উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকাঃ সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা তথ্যের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ গবেষণায় দেখা যায়, বিসিক ও প্রশিকা সংগঠন দুটোর আর্থিক সাহায্য মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে তেমন প্রভাবিত করেনি। অর্থাৎ পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার পরও গবেষণার অন্তর্ভূক্ত উভয় সংগঠনের অধিকাংশ মহিলার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদানের মালিক হলেন তাদের স্বামী। এ হার বিসিকে শতকরা ৪৬.৪ ও প্রশিকায় শতকরা ৪৮.৫ জন। বর্তমান গবেষণায় যেখানে ৪৪.২৯% প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা মহিলা স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যৌথভাবে অংশ নিয়েছে অথচ বিসিক ও প্রশিকা

সংগঠনভূক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে সে হার যথাক্রমে ৩০.৯% ও ১১.৮%। সুতরাং বিসিক ও প্রশিকা সংগঠন দুটোর চাইতে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা মহিলাদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক বলা চলে।

পরিবারে উত্তরদাত্রীদের মতামতের গুরুত্ব

স্ত্রীর নিজস্ব উপার্জন বা জমি-জমা না থাকলে সে স্বামীর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। নিজের বা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মেয়েদের মতামত বা বক্তব্য গ্রাহ্য করা হয় না। সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষেরা (আরেন্স ও ব্যুরদেন, ১৯৮০ঃ৮০-৮৫)। সুতরাং "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও তাদের নিজস্ব উপার্জন ক্ষমতা পরিবারে তাদের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হয়েছে তা নিরূপণের জন্য পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায়-

সারণী নং - ৬ঃ পরিবারে মতামতের গুরুত্ব অনুযায়ী জরিপভূক্ত মহিলাদের শ্রেণীবিভাগ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পূর্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়	২৩২	৭৭.৮৫
পূর্বের মতই	৪৫	১৫.১০
পূর্বের তুলনায় কম	১০	৩.৩৬
জানে না	১১	৩.৬৯
	২৯৮	১০০

মোট ২৯৮ জন উত্তদাত্রীর মধ্যে ২৩২ অর্থাৎ ৭৭.৮৫% উত্তরদাত্রীই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে। তবে পরিবারে মতামতের গুরুত্ব পূর্বের মতই আছে ও পূর্বের চেয়ে কমেছে এরূপ কথা বলেছে যথাক্রমে ১৫.১০% ও ৩.৩৬% মহিলা। পরিবারে মতামত প্রদানের প্রশ্নে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ৩.৬৯% উত্তরদাত্রী (সারণী নং ৬)। উল্লেখ্য যে সব মহিলার নিজস্ব আয় আছে তাদের মধ্যে সিংহভাগ মহিলাই পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বেড়েছে বলে জানিয়েছে। এছাড়া যেসব মহিলা প্রশিক্ষণকে অর্থোপার্জনের কাজে লাগাতে পারেনি তাদের মধ্যেও কিছু মহিলা পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে বলে উল্লেখ করেছে। আবার এমনও দেখা গেছে যারা আয় করছে তাদের মধ্যে কিছু মহিলা পরিবারে তাদের প্রাধান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে কমেছে বলে জানিয়েছে. প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য লাভ করে কম বেশী উপার্জনক্ষম হওয়ার পরও পরিবারে এসব মহিলার মর্যাদা বৃদ্ধি কেন হয়নি, সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করা যায়। নারী সমাজের উৎপাদনমুখী ভূমিকা একটা পরিবার তথা সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতখানি অপরিহার্য তা আমাদের সমাজের অনেকেরই অজানা। নারী সমাজের চিরাচরিত ভূমিকার কোন ব্যতিক্রম হলে আমাদের

সমাজে উৎকণ্ঠা দেখা দেয় এবং পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করে এর ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। বিশেষ করে অশিক্ষিত, দরিদ্র ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের জন্য একথা বিশেষভাবে সত্য। স্বাধীনভাবে উপার্জন করার পরও পরিবারে যেসব উত্তরদাত্রীর মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়নি এবং যাদের গুরুত্ব বরং পূর্বের চেয়ে কমেছে বলে জানিয়েছে তাদের পরিবারে এরূপ উৎকণ্ঠা দেখা গেছে। তবু বলা চলে যে, আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা ২৯৮ জন মহিলার মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ৭৭.৮৫% মহিলাই পরিবারে তাদের মতামতের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে দাবি করেছে। উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মহিলাদের আয় ও পরিবারে মতামতের গুরুত্ব

মহিলাদের আয় ও পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্বের মধ্যে আড়াআড়ি বিশ্লেষণের জন্য চলক দু'টি সম্পর্কিত তথ্য সারণী নং- ৭ এ উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সারণী নং-৭ঃ মাসিক গড় আয় ও পরিবারে মতামতের গুরুত্ব

মাসিক গড় আয়

মতামতের গুরুত্ব	আয় নাই	১-২০০	২০১-৪০০	৪০১-৬০০	৬০১-৮০০	৮০১-২০০০	মোট
পূর্বের চেয়ে অধিক	৪৩ (৫৭.৩৩)	১০৯ (৯৪.৭৮)	৪১ (৮৯.১৩)	২৪ (৮৫.৭১)	৬ (৭৫)	৯ (১০০)	২৩২
পূর্বের মতই	৩০ (৩২.৬১)	৫ (৪.৩৫)	৫ (১০.৮৭)	৩ (১০.৭২)	২ (২৫)	০	৪৫
পূর্বের চেয়ে কম	৮ (৮.৬৯)	১ (.৮৭)	০	১ (৩.৫৭)	০	০	১০
জানেনা	১১ (১১.৯৬)	০	০	০	০	০	১১
	৯২ (১০০)	১১৫ (১০০)	৪৬ (১০০)	২৮ (১০০)	৮ (১০০)	৯ (১০০)	২৯৮

(বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

সারণী নং-৭ এর তথ্য বিশ্লেষণে উত্তরদাত্রীদের আয়ের সাথে পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্বের তেমন কোন সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না। এর কারণ গবেষণাভূক্ত মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাই বিধবা, পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন। এসব মহিলারা সামাজিকভাবে যেমন দুর্দশাগ্রস্ত, পারিবারিকভাবেও তেমনি অবহেলিত। এ ধরনের মহিলাদের অধিকাংশের আয়ও তেমন উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির সংগে

আয়ের সম্পর্ক তেমন স্পষ্ট নয়। অশিক্ষিত ও অভাবী পরিবারের বিবাহিতা উত্তরদাত্রীদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

শিক্ষা ও পরিবারে মতামতের গুরুত্ব

মহিলাদের পরিবারের মতামতের গুরুত্বের সঙ্গে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য অনুরূপভাবে এ দুটো চলকের তথ্য সারণী নং–৮ পরিবেশিত হয়েছেঃ

সারণী নং – ৮ঃ শিক্ষা ও পরিবারে মতামতের গুরুত্ব

	শিক্ষা						
মতামতের গুরুত্ব	নিরক্ষর	নাম সই করতে পারে	১ম-৫ম	৬ষ্ঠ-৯ম	এস.এস.সি.	এইচ.এস.সি.	মোট
পূর্বের চেয়ে অধিক	০	১২০ (৮২.৭৬)	৭৭ (৮১.৯৯)	২১ (৭৫)	১২ (৮০)	২ (১০০)	২৩২
পূর্বের মতই	৯ (৬৪.২৯)	১৭ (১১.৭২)	১১ (১১.৭০)	৫ (১৭.৮৬)	৩ (২০)	০	৪৫
পূর্বের চেয়ে কম	০	৫ (৩.৪৫)	৩ (৩.১৯)	২ (৭.১৪)	০	০	১০
জানেনা	৫ (৩৫.৭১)	০ (২.০৭)	৩ (৩.২০)	০	০	০	১১
	১৪ (১০০)	১৪৫ (১০০)	৯৪ (১০০)	২৮ (১০০)	১৫ (১০০)	২ (১০০)	২৯৮

(বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

উপরোক্ত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিবারে উত্তরদাত্রীদের মতামতের গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার প্রভাবও তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, উত্তরদাত্রীরা অধিকাংশই অভাবী পরিবারের। তাছাড়া এসব মহিলাদের সিংহভাগেরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রায় নাই বললেই চলে। এরা "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" থেকে অক্ষর জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। সম্ভবতঃ এ কারণে পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্বের সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সম্পর্ক তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

পরিবারে উত্তরদাত্রীদের পরামর্শের ধরন

সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আমাদের দেশের মহিলাদের মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না (Jahan, 1975: 1-28)। অর্থোপার্জনে অংশ নেয়ার ফলশ্রুতিতে মহিলারা পারিবারিক ক্ষেত্রে তাদের দেয়া পরামর্শ কতটুকু সমাদৃত হয়েছে তা নিরূপণের জন্য পরিবারে উত্তরদাত্রীদের পরামর্শের

ধরন সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্য সারণী নং – ৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণী নং – ৯ঃ পরিবারে পরামর্শের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

পরামর্শের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পূর্বের চেয়ে অধিক পরামর্শ করে	১৮৬	৬২.৪২
পূর্বের মতই পরামর্শ করে	৯৩	৩১.২১
পূর্বের চেয়ে কম পরামর্শ করে	৯	৩.০২
জানেনা	১০	৩.৩৫
	২৯৮	১০০

উপরোক্ত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পরিবারের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক সংখ্যক মহিলার পরামর্শ পরিবারে সমাদৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাত্রীর (৩১.২১%) পরিবারে পরামর্শের ধরন পূর্বের মতই আছে। তবে পূর্বের চেয়ে কমেছে এরূপ কথা বলেছে ৩.০২% মহিলা। পরিবারের পরামর্শের ধরন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে ৩.৩৫% উত্তরদাত্রী। বর্তমান গবেষণার এ তথ্যের সাথে ১৯৮৫ সালে মাবুদ কর্তৃক সম্পদিত গবেষণা তথ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। ঐ গবেষণায় দেখা যায়, ৭৩% উত্তরদাত্রীই পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বের চেয়ে পরে পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় উপার্জনকারী মহিলাদের মধ্যেও কিছু মহিলা রয়েছে যে, পরিবারে পরামর্শের ধরন পূর্বের মতই আছে বা পূর্বের চেয়ে কমেছে। উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে সব উত্তরদাত্রী পরিবারে পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে তার কারণ আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যে সব উত্তরদাত্রী পরিবারে পরামর্শের ধরন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে তাদের এরূপ আচরণের কারণ হলো, এ ধরনের মহিলাদের অধিকাংশই বিধবা, পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও স্বামী থেকে পৃথক। এরা তাদের অভিভাবক হিসাবে ভাই, পিতা, মামা ও চাচাকে উল্লেখ করেছে। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পরিবারে তাদের অশান্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে বিধায় এ ক্ষেত্রে তারা উত্তর প্রদান থেকে বিরত ছিল।

পরিবারের অভ্যন্তরে সম্পর্ক

প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উপার্জনক্ষম হওয়ায় পরিবারের ভিতর উত্তরদাত্রীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রূপান্তর ঘটেছে কি–না তা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য (সারণী নং –১০) থেকে বোঝা যায় যে, অর্ধেকের বেশি (৬৭.৪৫%) উত্তরদাত্রীই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পরিবারে অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক সমঝোতাপূর্ণ হয়েছে বলে তারা মনে করে।

সারণী নং–১০ঃ উত্তরদাত্রীদের আয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক পারিবারিক জীবনে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করেছে কি–না

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সহায়তা করেছে	২০১	৬৭.৪৫
সম্পর্ক পূর্বের মতই আছে	৭৬	২৫.৫০
পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে	১০	৩.৩৬
জানে না	১১	৩.৬৯
	২৯৮	১০০

এছাড়া শতকরা ২৫.৫০ জন মহিলা পরিবারে তাদের সম্পর্ক পূর্বের মতই আছে, শতকরা ৩.৩৬ জন পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে এবং শতকরা ৩.৬৯ জন এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেনি। বর্তমানে গবেষণার এ তথ্যের সাথে ১৯৭৯ সালে বেগম ও সরকার কর্তৃক পরিচালিত "বাংলাদেশ দুঃস্থা মহিলাদের পুনর্বাসন" শীর্ষক গবেষণা তথ্যের মিল নেই। তাঁদের গবেষণায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ (৫৭.৪৫%) মহিলার পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, দারিদ্র পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, পারিবারিক ভাঙ্গনের কারণও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। এ ক্ষেত্রে যেহেতু অধিকাংশ উত্তরদাত্রী কিছু না কিছু আয় করে স্বামী ও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছুটা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তাতে পারিবারিক সমঝোতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে আলাপ আলোচনাতে তা বোঝা গেছে।

পরিবারে মহিলাদের জবাবদিহিতা

আমরা মনে করি উপার্জনক্ষমতা মহিলাদের আত্ম–মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করে ও পরিবারে তাদের অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম করে তোলে। এ ধারণার সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের তাদের সাংসারিক দায়দায়িত্ব ও কাজের জন্য পরিবারে জবাবদিহিতার ধরণ সম্পর্কে তথ্য সংগহ করা হয়। সারণী নং ১১ এর 'ক' ও 'খ' – এ পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যায় অর্ধেকের বেশি (১৭০ জন) মহিলা তাদের কাজকর্ম বিনা দ্বিধায় করতে সক্ষম হয়েছে।

সারণী নং–১১ (ক) ঃ সাংসারিক কাজে অভিভাবকের নিকট জবাবদিহি করা

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
জবাবদিহি করতে হয় না	১৭০	৫৭.০৫
জবাবদিহি করতে হয়	১২৮	৪২.৯৫

সারণী নং- ১১ (খ)ঃ সাংসারিক কাজের জন্য উত্তরদাত্রীদের যার কাছে জবাবদিহিঁ করতে হয়

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্বামীর কাছে	৯৭	৭৫.৭৮
শ্বশুর/শ্বাশুড়ীর কাছে	১০	৭.৮১
ভাইয়ের কাছে	৮	৬.২৫
বাবা/মার কাছে	১৩	১০.১৬
মোট	১২৮	১০০

অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজ কর্ম সম্পাদন করতে কিছুটা স্বাধীনভাবে করতে পেরেছে। এসব ব্যাপারে তাদেরকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয়নি। অবশ্য আমাদের সমাজের চিরাচরিত নিয়মে যে ১২৮ জন অর্থাৎ ৪২.৯৫% উত্তরদাত্রীকে তাদের কাজের জন্য পরিবার প্রধানের নিকট জবাবদিহি করতে হয় তাদের মধ্যে ৯৭ জন (৭৫.৭৮%) তাদের কাজের জন্য স্বামীর কাছে, ১০ জন (৭.৮১%) শ্বশুর/শ্বাশুড়ীর কাছে, ৮ জন (৬.২৫%) ভাইয়ের কাছে এবং ১৩ জন (১০.১৬%) বাবা/মার কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। সুতরাং যদিও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলার জবাবদিহি করার ধরণ আমাদের সমাজের ঐতিহ্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ, তথাপি আমরা বলতে পারি যে, প্রায় অর্ধেকের বেশি মহিলা পরিবারে তাদের অবস্থান সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিবারের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপার্জনক্ষম হবার পর পরিবারের বাইরে বৃহৎ সমাজের সঙ্গে মহিলাদের মেলামেশা ও লেনদেনের প্রকৃতিতে কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা নিরূপণের চেষ্টাও এই গবেষণার মাধ্যমে করা হয়েছে। পরিবারের বাইরের লোকজনের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনে তাদের পারিবারিক সদস্যদের কোন আপত্তি আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তারা যে উত্তর দেন তা সারণী নং ১২-এ পরিবেশিত হয়েছে।

সারণী নং- ১২ঃ সামাজিক সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

সম্পর্কের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আপত্তি আছে	৭৮	২৬.১৮
আপত্তি নেই	১৯২	৬৪.৪৩
প্রয়োজনে বাধা নেই	২৪	৮.০৫
ধর্মীয় ভয়ে বাধা গ্রস্থ হয়	৪	১.৩৪
	২৯৮	১০০

উপরোক্ত সারণীর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশি (৬৪.৪৩%) উত্তরদাত্রী পরিবারের বাইরে কোন লোকের সঙ্গে লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মহিলাদের মধ্যে তিন-পঞ্চমাংশের বেশি মহিলার ক্ষেত্রে চিরাচরিত পর্দাপ্রথা তেমন কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। বাঁচার

তাগিদে এদেরকে বাড়ীর চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে হচ্ছে। গবেষণাভুক্ত মহিলাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। আবার তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার স্বার্থে বাইরের প্রতিষ্ঠান ও লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ মহিলারই নিজের, তার স্বামীর ও পরিবারের অপরাপর সদস্যদের এ ব্যাপারটি সম্পর্কে জড়তা কেটেছে। অবশ্য কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণগ্রহণকারী বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরের বৃহৎ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে পরিবার ও তাদের নিজেদের মধ্যে বিব্রতবোধ বিরাজ করতে দেখা গেছে। যেসব মহিলা পরিবারের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তারা অর্থোপার্জন কাজকর্ম পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেছে এবং লেনদেন করেছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি পরামর্শ করে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উপার্জনক্ষম হওয়ায় পরিবারে তাদের সম্পর্ক তথা সমঝোতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সাংসারিক কাজের জন্য পরিবারে জবাবদিহি করতে হয় না, পরিবারের বাইরের কোন লোকের সাথে কথা বলতে আপত্তি নেই এ ধরণের কথা অধিক সংখ্যক মহিলাই বলেছে যা পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক। উল্লেখ্য যেসব মহিলা কিছু না কিছু উপার্জন করতে পারছে তাদের সিংহভাগই এ ধরনের কথা বলেছে।

মহিলাদের আয় ও পরিবারের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক

মহিলাদের আয় ও পরিবারের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা নিরুপণের জন্য সারণী নং ১৩ এ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণী নং-১৩ঃ মাসিক গড় আয় ও পরিবারের বাইরের লোকের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলতে আপত্তির ধরন

মাসিক গড় আয়

আপত্তির ধরণ	আয় নাই	১-২০০	২০১-৪০০	৪০১-৬০০	৬০১-৮০০	৮০১-২০০০	মোট
আপত্তি আছে	৫০ (৫৪.৩৪)	২০ (১৭.৩৯)	৪ (৮.১৭)	৪ (১৪.২৯)	০	০	৭৮
আপত্তি নেই	৩২ (৩৪.৭৮)	৮৮ (৭৬.৫২)	৩৬ (৭৮.২৬)	২১ (৭৫)	৭ (৮৭.৫০)	৮ (৮৮.৮৯)	১৯২
প্রয়োজনে বাধা নেই	৮ (৮.৭০)	৬ (৫.২২)	৫ (১০.৮৭)	৩ (১০.৭১)	১ (১২.৫০)	১ (১১.১১)	২৪
ধর্মীয় ভয়ে নিজেই বাধাগ্রস্ত হয়	২ (২.১৭)	১ (.৮৭)	১ (২.১৭)	০	০	০	৪
	৯২ (১০০)	১১৫ (১০০)	৪৬ (১০০)	২৮ (১০০)	৮ (১০০)	৯ (১০০)	২৯৮

(বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

সারণী নং–১৩ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাত্রীদের আয়ের সাথে পরিবারের বাইরের লোকের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলতে আপত্তির ধরনের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এর কারণও আমাদের সামাজিক পরিবেশে বিদ্যমান। গবেষণাভুক্ত মহিলাদের মধ্যে বেশীরভাগ মহিলাই গরীব শ্রেণীর। অভাবের সংসারে কিছু বাড়তি আয়ের আশা নিয়েই অধিকাংশ উত্তরদাত্রী "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" হতে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। চরম অভাবের কারণে গরীব শ্রেণীর অভিভাবকেরা তাদের পরিবারের মহিলাদের কঠিন পর্দার মধ্যে রাখতে পারছে না। কারণ তার একার পক্ষে সংসারের বোঝা টানা সম্ভব হয় না। তাই অভাবের সংসারে ছেলেদের পাশাপাশি এসব পরিবারের মেয়েরাও যদি কিছু আয় করে তাহলে সে ক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবক ও অপরাপর সদস্যদের তেমন কোন আপত্তি থাকে না। বরং অনেকক্ষেত্রে পরিবারের স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রাক্কালে মহিলাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করতে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত ও বাহির হতে আগত বিভিন্ন প্রশিক্ষক ও পরিদর্শকের সংগে কথা বলতে হয়েছে। এতে করে উত্তরদাত্রীদের নিজের ও পরিবারে অপরাপর সদস্যের মনের সংকীর্ণতা ও জড়তা অনেকাংশে কেটেছে। ফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা মহিলাদের মধ্যে যারা আয় করছে না তাদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাদের পরিবারের বাইরের কোন লোকের সাথে কথা বলতে আপত্তি নেই। সুতরাং একথা বলা যায়, উত্তরদাত্রীদের আয়ের চেয়ে "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের" ব্যাবহারিক ও সামাজিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কই তাদের গতানুগতিক ধ্যান–ধারণা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

শিক্ষা ও পরিবারের বাইরের সামাজিক সম্পর্ক

সারণী নং–১৪ঃ শিক্ষা ও পরিবারের বাইরের কোন লোকের সাথে কথা বলতে আপত্তির ধরনঃ

শিক্ষা

আপত্তির ধরন	নিরক্ষর	নাম সই করতে পারে	১ম–৫ম	৬ষ্ঠ–৯ম	এস.এস.সি.	এইচ.এস.সি.	মোট
আপত্তি আছে	৮ (৫৭.১৪)	৩৭ (২৫.৫২)	২৬ (২৭.৬৬)	৭ (২৫)	০	০	৭৮
আপত্তি নেই	৩ (২১.৪৩)	৯৪ (৬৪.৮৩)	৬৩ (৬৭.০২)	১৭ (৬০.৭১)	১৩ (৮৬.৬৭)	২ (১০০)	১৯২
প্রয়োজনে বাধা নেই	২ (১৪.২৯)	১৩ (৮.৯৬)	৪ (৪.২৬)	৩ (১০.৭২)	২ (১৩.৩৩)	০	২৪
ধর্মীয় ভয়ে নিজেই বাধাগ্রস্ত হয়	১ (৭.১৪)	১ (.৬৯)	১ (১.০৬)	১ (৩.৫৭)	০	০	৪
	১৪ (১০০)	১৪৫ (১০০)	৯৪ (১০০)	২৮ (১০০)	১৫ (১০০)	২ (১০০)	২৯৮

(বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

সারণী ১৪–এ পরিবেশিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবারের বাইরের কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলতে আপত্তির ধরনের ক্ষেত্রে উত্তরদাত্রীদের শিক্ষাস্তর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। পরিবারে মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তরদাত্রীদের শিক্ষারস্তর প্রভাব বিস্তার করতে না পারার জন্য যে কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে মহিলাদের আত্মমূল্যায়ণ

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপার্জনক্ষম হওয়ায় সমাজে উত্তরদাত্রীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মহিলাদেরকে আত্মমূল্যায়ণ করতে বলা হলে তারা যে মনোভাব প্রকাশ করে তা সারণী নং ১৫–এ দেখানো হলোঃ

সারণী নং ১৫ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে উত্তরদাত্রীদের আত্মমূল্যায়ন

সামাজিক মর্যাদা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বৃদ্ধি পেয়েছে	২৩২	৭৭.৮৫
পূর্বের মতই আছে	৫৮	১৯.৪৬
পূর্বের চেয়ে কমেছে	৩	১.০১
জানে না	৫	১.৬৮
	২৯৮	১০০

প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উপার্জনক্ষম হওয়ায় ২৯৮ জন উত্তরদাত্রীর মধ্যে ২৩২ জন অর্থাৎ ৭৭.৮৫% ভাগ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। সমাজে মর্যাদা পূর্বের মতই আছে, পূর্বের চেয়ে কমেছে এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে যথাক্রমে শতকরা ১৯.৪৬, ১.০১ ও ১.৬৮ জন মহিলা (সারণী নং ১৫)। যে তিন জন উত্তরদাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বের চেয়ে বরং বর্তমানে সমাজে তাদের মর্যাদা কমেছে বলে জানিয়েছে তারা অবিবাহিতা। তাদের মতে "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অর্থোপার্জনের জন্য কাজ করায় পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকে তাদের এরূপ কাজকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে না। ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতে করে তাদের বিয়ে বিলম্বিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু পরিবার তাদের যথাযথভাবে ভরণপোষণ করতে না পারায় তাদের অর্থোপার্জনমূলক কাজকে পরিহারও করতে পারছে না। উত্তরদাত্রীদের মধ্যে যে তিন চতুর্থাংশের বেশি মহিলা সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবী করেছে তারা তাদের সম্পর্কে পাড়া প্রতিবেশীর অনুকূল মনোভাব, প্রতিবেশী কর্তৃক তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি, সভা সমিতি বা শালিসী সভায় নিজেদের বক্তব্য পেশ ইত্যাদিকে মর্যাদা বৃদ্ধির সূচক হিসাবে উল্লেখ করেছে। মর্যাদা বৃদ্ধির যেসব সূচক তারা উল্লেখ করেছে সেগুলো ১৬ নং সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণী নং ১৬ঃ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সূচক

মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সমাজের মানুষ খারাপ চোখে দেখে	২৩২	১০০
আগের চেয়ে এখন সবাই সম্মান করে	১৮০	৭৭.৫৯
অনেকে তার কাছে পরামর্শ করতে আসে	৯৯	৪২.৬৭
এখন সে মাতব্বরদের সঙ্গে কথা বলে পারে	১৭৫	৭৫.৪৩
শালিসী বা সমাজে তার কথা উপস্থাপন করতে পারে	১৩০	৫৬.০৩

বিঃদ্রঃ অনেক উত্তরদাত্রী একাধিক উপায়ের কথা বলায় গণসংখ্যা ২৩২ এর বেশী হয়েছে।

উপরোক্ত সারণীর তথ্য থেকে দেখা যায়, উত্তরদাত্রীদের যে বৃহদাংশ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবী করেছে তাদের সবাই তাদের প্রতি সমাজের লোকজনের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তাদের নতুন ভূমিকা সমাজের কাছে সমাদৃত হওয়া শুরু করেছে। এইটি আমাদের সমাজের পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। এদের ৭৭.৫৯% ভাগ দাবী করেছে যে, তারা অন্যের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রায় একই সংখ্যক বলেছে যে তারা এখন নিঃসংকোচে গ্রাম্য বা শহরের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে। ৫৬.০৩% ভাগ বিবাদ বিসংবাদ মিটানো সংক্রান্ত সভায় অংশ নিয়ে নিজের মতামত উপস্থাপন করার বিষয় উল্লেখ করেছে। এ যাবৎ মহিলারা সাধারণতঃ স্বামী, পিতা-মাতা বা ভাইয়ের মাধ্যমে তাদের মতামত বিভিন্ন শালিসী সভায় উপস্থাপন করতে পারত (Adnan, 1989: 3-16)। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আশাব্যঞ্জক।

উপসংহার

"মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" একটি ঐতিহ্যবাহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। নানাবিধ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এটি গত তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে সহায় সম্বলহীন মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান" বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের উপার্জনক্ষম ও স্বাবলম্বী হতে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে না পারলেও যে অধিক সংখ্যক মহিলা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে তা আমাদের সমাজে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশাব্যঞ্জক এবং "মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের" কার্যকরী ভূমিকারই পরিচায়ক। পেশাগত নির্দেশনা ও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে যেমনঃ দামী যন্ত্রপাতি ও পুজি নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরিবর্তে স্থানীয় চাহিদা, বাজার ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রবর্তন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলাদের সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিতে তাদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য সমবায় বিপণী প্রতিষ্ঠা, মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রশিক্ষণের মান উন্নীত করার জন্য মহিলা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং মহিলা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

এসব প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সম্পদ ও আয়ের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এ হার আরো বাড়ানো এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলোর ভূমিকাকে আরো সক্রিয় ও কার্যকরী করা সম্ভব হলে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

Abdullah, Tahrunnessa Ahmed (1974), *Village Women As I Saw them*, The Ford Foundation, Dhaka, (PP 13-30).

Adnan, Sapan (1989). "Birds in a Cage: Institutional change and Women's position in Bangladesh "*ADAB NEWS*, Vol. xvi, No-1. (PP 3-16)

Ahmed, Perveen (1980). *Income Earning As Related to the changing Status of Village Women in Bangladesh: A Case Study;* Women for Women Research and study Group, Dhaka.

Begum, Naznir Nur (1987). *Pay or pardah. Women and Income Earning in Rural Bangladesh*, Massay University, Palmerston North Newzeland (M. Phil Thesis).

Chaudhury Rafiqul Huda and Ahmed, Nilufer Raihan (1980). *Female Status in Bangladesh*, The Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Hossain, Monowar, et al (eds.) (1977). *Role of Women in Socio-Economic Development in Bangladesh. Proceedings of a Seminar held in Dhaka May. 9-10.* Bangladesh Economic Association, (PP 21-22).

Huda, Khaja Shamsul (1987). "The Development of NGos in Bangladesh." *ADAB NEWS*, vol. xiv, no. 3 (pp. 1-9)

Huq, A.K.M. Hedayetul (1984), "Role of the Voluntary Agencies in Development Activities in Bangladesh. *সামাজিক বিজ্ঞান ও উন্নয়ন*, জাতীয় সমাজ বিজ্ঞান সমিতি, বাংলাদেশ (PP. 131-140)

Jahan, Rounaq (1975), "Women in Bangladesh" *Women for Women.* Women for Women Research and Study Group, Dhaka (PP. 1-28).

Mabud, Mohammed A (1985), "Women's Status at the House-hold level in Rural Bangladesh." *The Journal of Social Development*, Vol. 2, No. 1. Institute of Social Welfare and Research. University of Dhaka, Dhaka (PP. 13-23)

Mahbub, Gul-Afruz and Rahman, Jowshan A. (eds), (1986). *Inventory of Women's NGo in Bangladesh*, Women's Affair's Department, Government of the people's Republic of Bangladesh, Dhaka.

আরেন্স, ইয়েনেকা এবং ব্যুরদেন, ইউসফান (১৯৮০), *ঝগড়াপুর;* গণপ্রকাশনী, নয়ারহাট, ধামরাই, ঢাকা।

বিবাহের 'প্রীতি উপহার'

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

ভূমিকা

আমাদের দেশের লোকসাহিত্য সমালোচক তথা লোকসাহিত্য বিশারদগণ লোক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সব 'প্রীতি উপহার' মুদ্রিত হয় এবং বিবাহ আসরে যা বিতরণ করা হয় সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সব সঙ্গীত-গীত হয় সে সব গান বা গীত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও এই মেয়েলী গীত বা বিয়ের গানগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষ্যে এ সকল 'প্রীতি উপহারের' (অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ কবিতায়) সংগ্রহ করার চেষ্টা কেউ করেছেন বলে আমি জ্ঞাত নই, বা এ সম্পর্কে আদৌ কোন আলোচনা দৃষ্ট হয় না।

এই 'উপহার' গুলিকে অর্থাৎ 'কবিতা' গুলিকে আমি লোক সাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত করেছি। এখন এগুলিকে লোক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা – এর যৌক্তিকতা কতদূর তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

লোক সাহিত্যের সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে যা কিছু মৌখিক প্রচলিত (Oral Tradition) তাই লোক সাহিত্যের অঙ্গীভূত। লোক সাহিত্য বা (Folklore is the material that is handed on by tradition eilter by word of mouth or by custom and practice. It may be folksongs- folktales - riddles, proverbs or other material, preserved in words. [A. Tylor, Folklore and student of Literature. The pacific spectator, Vol II (1948), P. 216-23)] অন্যত্র বলা হয়েছে – Folk literature is simply literature transmitted orally. [Francis Lee... An operational definition - Journal of American Folklore Nol 74 (1961) Page 193-316]

লোক সাহিত্যের আরও সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়ঃ কিন্তু সব কয়টির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সর্ব স্বীকৃত এবং প্রচলিত তা হচ্ছে যে এই সাহিত্য হচ্ছে মুখে মুখে তৈরী এবং প্রচলিত হতো মুখে মুখে গান আকারে গল্প আকারে কাহিনী আকারে (নৃত্য গীতের মাধ্যমে) এগুলি প্রচলিত। এগুলির রচয়িতা একজন হতে পারে অথবা বহুজনও হতে পারে।

বিবাহ উপলক্ষ্যে যে 'প্রীতি উপহার'গুলি বিবাহ আসরে বিতরণ করা হয় এবং ঐ আসরেই এগুলির উপস্থিত কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর ঐ গুলি কেউ আর সংরক্ষণ করে না একবার পাঠ করার পর আর কেউ পড়ে দেখে না। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটায় বলে সম্ভবত এগুলিকে কেউ সংরক্ষণের চেষ্টাও করে না। এই উপহারগুলি এক বা একাধিক ব্যক্তির রচনা এবং রচয়িতার নাম সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। বা কেউ এর রচয়িতার সন্ধানও করে না। যারা এগুলি মুদ্রিত করে বিতরণ করে শুধু তাদের নামেই – এগুলি প্রচারিত হয়।

লোক সাহিত্যের সমালোচকগণ এর নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন – আমি সে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছি না। তবু সাধারণভাবে দু একটা কথা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

লোক সাহিত্যের সমালোচকগণ একে দুভাগে বিভক্ত করেছেন, Material folklore: লোক প্রথা, লোক শিল্প, লোক ভাস্কর্য, লোক বাদ্যযন্ত্র।
Formalized folklore: লোক কথা, কাহিনী, রূপকথা, ধাঁধাঁ, যাদুমন্ত্র, ছড়া, প্রবাদ গীতিকা– পুরাগীতিকা।

আমার অভিমতে বিবাহের 'প্রীতি উপহার' গুলিকে এই Formalized folklore এর অন্তর্ভূক্ত করতে কোন বাধা নেই। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (বা উপাদান) একটি সমাজের তথা দেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করে। উদ্‌ঘাটিত করে তার মন মানসিকতাকে আর তার মনোজীবনের বিভিন্ন অনুভূতিকে। লিখিত বা তথা শালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত না হয়ে তারা বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন কিংবদন্তীর মধ্যে, রূপকথার মধ্যে, প্রবাদ বচনের মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতার কথা মানুষের অতৃপ্ত আশা আকঙ্খার কথা বিভিন্ন আকারে ইঙ্গিতে প্রতীকে প্রকাশ পায়, তেমনি এই উপহারগুলিতে মানুষের জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রিয়জনের আনন্দ অনুভূতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। "Folklore perpetuates the pattern of culture and through its study we can often explain the motif and meaning of culture. Frazer, The Golden Bough- 1963- p 603]

বাহুল্য ভয়ে লোক বিশারদ Espinson, Maria Leach, Tylor এর মন্তব্যের এ জাতীয় বহু উদ্ধৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকছি। লোক সাহিত্য যে শুধু মাত্র চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করে তা

নয়– মানুষের সামাজিক জীবনকেও জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। মানুষের নানা কর্ম – নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপই লোক সাহিত্যের বিষয়বস্তু। মানব সমাজে বিবাহ একটি অতি সুপ্রাচীন প্রথা। বিবাহ শুধু প্রথা মাত্র নয়– একটি পবিত্র প্রথাও বটে। সমাজ শৃঙ্খলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় পবিত্র প্রাচীন প্রথা। তাই এ বিবাহ উপলক্ষ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পূর্ব থেকেই বিবাহ বাড়ীতে নানা ক্রিয়া কর্ম শুরু হয়ে যায়– আমাদের দেশে বিবাহ বাড়ীতে গানের আসর বসে – এই গীতগুলি বিয়ের পূর্বে বহু দিন থেকেই গাওয়া হয় – এবং মেয়েরাই এর প্রধান উদ্যোক্তা। বিবাহের বাসর ছাড়াও বাড়ীতে আরও অনুষ্ঠান এই বিবাহের সঙ্গে যুক্ত। – যেমন গায়ে হলুদ, ধান দুর্বাসহ প্রদীপ জ্বালানো – আল্পনা – এসবতো বিবাহের আগে থেকেই হতে থাকে– এগুলি প্রাক্‌বিবাহ আচার অনুষ্ঠান। বিবাহের দিনে (বা রাত্রিতে) মন্ত্রপাঠ বা কবুল করানোর পর সম্প্রদান বা রসুমত ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিবাহের পরও 'বধুবরণ' অনুষ্ঠানে নানা রীতিনীতির প্রচলন আছে। আর বিবাহ সভায় মন্ত্রপাঠ বা দোয়ার পরপরই এসব মুদ্রিত 'উপহার' গুলি বিতরণ করা হয়।

এই 'প্রীতি উপহার' গুলির উদ্দেশ্য কিন্তু আনন্দ প্রকাশ ও আনন্দ দান। তবে নিছক আনন্দ বা কৌতুক করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। অধিকাংশ স্থলেই একটি শুভকামনা বা মঙ্গলবোধ এর পশ্চাতে কাজ করে। নিকট আত্মীয় স্বজনরাই এই 'প্রীতি উপহার' গুলির আয়োজক বা রচয়িতা। নব দম্পত্তির প্রতি তাদের প্রীতি ও মঙ্গলকামনার প্রেরণা থেকেই এগুলির উদ্ভাবন এবং প্রচলন। এগুলির পেছনে যথেষ্ট না হলেও বেশ অর্থ ব্যয় – সময় ব্যয় ও কষ্ট পরিশ্রম আছে। যদিও অন্যান্য ব্যয়ের তুলনায় এ 'উপহার' গুলির মুদ্রণ ব্যয় কমই বলতে হবে। ব্যয় সামান্য হলেও এর গুরুত্ব বা এর মধ্য দিয়ে যে আনন্দ রস পরিবেশন করা হয়ে থাকে তা সামান্য নয়। এই উপহারগুলির মধ্য দিয়ে শুধু যে সামাজিক বা মনস্তাত্বিক দিকের পরিচয়ের উদ্‌ঘাটন হয়ে থাকে তা নয় এর মধ্যে সাহিত্য রসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই সাহিত্যরসের উপস্থিতির জন্য ও এগুলিকে লোক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমাদের দেশে এ জাতীয় মুদ্রিত 'প্রীতির উপহার' দেবার রীতির উদ্ভব কখন হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা মুস্কিল – সম্ভবতঃ মুদ্রাযন্ত্রের আবিস্কারের পরই এগুলি মুদ্রিত হতো এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে তা প্রচারিত হতো। সুতরাং এগুলির ইতিহাস দীর্ঘদিনেরই বলতে হয়। বিবাহ উপলক্ষ্যে বিবাহ আসরে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অভিভাবকগণ মুখে মুখে আশীর্বাদ করেন। পাত্র পাত্রীকে আর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক আত্মীয় স্বজন [কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নিপুত্র ইত্যাদি] যে আমোদ আহলাদ মনে মনে বা মুখে মুখে প্রকাশ করতো তারই লিখিত কথা মুদ্রিত (Printed) রূপ এ সকল 'প্রীতি উপহার'। বিবাহের আসর থেকে কন্যাকে যখন বরপক্ষের গৃহে নিয়ে যায় তখন আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যার অভিভাবক পাত্রের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন এবং বর কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। এ রীতি দীর্ঘদিনের সুপ্রাচীন এবং এখনো সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

নামকরণ

বিবাহ অনুষ্ঠানে [কন্যার বাড়ীতে – অধুনা শহরে নিজ বাড়ীতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় না – শহরে হোটেল বা কোন সভাগৃহ ভাড়া করে কন্যাপক্ষ বিবাহের আয়োজন করেন। পল্লী অঞ্চলেও নিজ বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হলে অন্যত্র বা বাড়ীর আঙিনায় সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।] এ 'প্রীতি উপহার'গুলি বিতরণ করা হয়। কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষ উভয় দিকের 'উপহার' গুলি এই অনুষ্ঠানেই প্রচার করা হয়। এগুলির সাধারণ নাম 'প্রীতি উপহার' হলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত এ জাতীয় 'প্রীতি উপহারের' ভিন্ন ভিন্ন নামের শিরোনাম দৃষ্ট হয়। আমার সংগ্রহে যে সকল 'প্রীতি উপহার' আছে সেগুলিতে নিম্নরূপ শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। (১) প্রীতি উপহার (২) ভক্তি উপহার (৩) উপহার গুচ্ছ (৪) উপহার (৫) একটু খানি ভক্তি উপহার (৬) কলগুঞ্জন (৭) অব্যক্ত মনের দুটি কথা (৮) এক গুচ্ছ প্রতিবেদন (৯) কিছু কথা (১০) বধূ বরণ (১১) ফুরতি (১২) আমোদ আহলাদ।

লক্ষ্যণীয় যে প্রথম পাঁচটিতে 'উপহার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে – যদিও শেষের সাতটিতে 'উপহার' শব্দটি অনুপস্থিত। এছাড়া পত্রিকার ঢং এ ছাপানো তিনটি 'উপহার' আমার সংগ্রহে আছে। পত্রিকা হিসাবেই এদের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে– (১) ঝটিকা (২) উল্কা– আনন্দবাজার।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে লোক সাহিত্য বিশারদগণ লোক সাহিত্যকে (Folklore) দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অনেকে আবার ঐ প্রধান শ্রেণীকে আরও নানা উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) বাক্ কেন্দ্রিক ফোকলোর (খ) অঙ্গভঙ্গী কেন্দ্রিক ফোকলোর (গ) আচার ব্যবহারগত ফোকলোর (ঘ) খেলাধূলা কেন্দ্রিক ফোকলোর (ঙ) বস্তুকেন্দ্রিক (Arts, Crafts) ফোকলোর (চ) লিখন কেন্দ্রিক ফোকলোর।

আমাদের আলোচ্য "প্রীতি উপহার" গুলিকে আমরা লিখনকেন্দ্রিক উপবিভাগের অন্তর্ভূক্ত করতে পারি। যদিও ফোকলোর তথা লোক সাহিত্যের প্রথম কথাই হলো – এর জন্ম বা উৎপত্তি হচ্ছে মৌখিকভাবে এবং তা প্রাচীনকাল থেকে [অতীত কাল থেকে] চলে আসছে – একে আমরা বলি ঐতিহ্য বা [Tradition] কিন্তু এ উপহারগুলির যে উদ্দেশ্য [motif] তা হচ্ছে বিবাহ অনুষ্ঠানে নব দম্পতিকে আর্শীবাদ করা। এ আশীর্বাদ একদা মুখে উচ্চারিত হতো – কিন্তু কোন এক সময়ে এগুলি হয়তো লিখিত হতে শুরু করে। এই শুভেচ্ছা বা শুভকামনা সবারই মধ্যে প্রচারিত হোক সেই উদ্দেশ্যে এগুলি মুদ্রিত করার রীতি প্রবর্তিত হয়। মৌখিক ঐতিহ্য থেকে যেমন লিখিত সাহিত্য গ্রহণ করে থাকে – তেমনি লিখিত সাহিত্য থেকেও মৌখিক সাহিত্যে তা অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। হয়তো কোন লিখিত সাহিত্য থেকে এই আশীর্বাদ দেবার প্রথা মুখে মুখে প্রচলিত হয়। এবং মুখে মুখে প্রচলিত আর্শীবাণী পুনরায় লিখিত রূপ লাভ করেছে। প্রাচীন কাব্যে (বিশেষ করে

বাংলা মঙ্গল কাব্য সমূহে এ ধরনের বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। এ ধরনের প্রসঙ্গ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

শ্রেণীকরণ

বিবাহের 'প্রীতি উপহার'গুলিকে আঙ্গিকের তথা প্রকরণের দিক থেকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) কবিতা বা ছন্দোবদ্ধ পদ (খ) গদ্য (গ) পত্রিকা

কোথাও কোথাও একই 'উপহার' গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য 'পত্রিকা' আকারে যেগুলি মুদ্রিত হয় তাতে গদ্যের ব্যবহার করা হয়।

এখন আমাদের 'উপহার' গুলির আলোচ্য বিষয়বস্তু হবে নিম্নের প্রসঙ্গগুলিকে অবলম্বন করে।

১। মূল বিষয়বস্তুর আলোচনা এবং এর উদ্দেশ্য (motif) ব্যাখ্যা।

২। সাহিত্য রস – এতে আছে ভাষা সৌন্দর্য উপমা রূপকের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা।

৩। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি উদ্‌ঘাটন।

৪। অঙ্গ সজ্জা (Get up) এবং অলঙ্করণ, মুদ্রণ কলা কৌশল।

উদ্দেশ্য

প্রথমেই আমাদের আলোচ্য এই "প্রীতি উপহার"র–রচয়িতা কে এবং কারা এবং এর পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য (motif) ক্রিয়াশীল তা পর্যবেক্ষণ করা। যে কোন একটি 'উপহার' পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এগুলির রচয়িতা বা বিতরণকারী (যাদের নামে এগুলি মুদ্রিত হয়) হচ্ছেঃ বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষের (ক) কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র (খ) ভাবী, (দেবর বা ননদের বিয়েতে) (গ) বন্ধুবান্ধব। উপহারগুলি এই শ্রেণীর আত্মীয় বা ব্যক্তির নামে প্রচারিত হয়ে থাকে। কখনও কখনও গুরুজন পিতা মাতার পক্ষ থেকেও প্রচারিত। প্রকৃতপক্ষে এই সব উপহারের রচয়িতার নাম দেওয়া হয় না– অনেক সময় একাধিক ব্যক্তি দ্বারা এগুলি রচিত। অর্থাৎ যাদের নামে 'উপহার' মুদ্রিত হয়, তারা সচরাচর এর রচয়িতা নয়। এবং রচনাকারীর নাম নিয়ে কেউ কোন উৎসাহ দেখায় না বা নাম জানার চেষ্টাও করা হয় না। [অবশ্য আমার সংগ্রহে কয়েকটি উপহার আছে যেখানে রচয়িতা হিসাবে নামের উল্লেখ করা হয়েছে] সাধারণতঃ এগুলি পুরাতন কোন 'উপহারের' আদর্শ দেখে ছাপাখানায়ই তা রচিত হয়। যারা উদ্যোক্তা তারা তাৎক্ষণিকভাবে ঐগুলি প্রস্তুত করে। কখনো কখনো পুরাতন কোন 'উপহারের' শিরোনাম অর্থাৎ পাত্র পাত্রীর নাম বিবাহ স্থান, দিন তারিখ পরিবর্তন করে মুদ্রিত করা হয়।

অধিকাংশ 'উপহার'ই কনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরাই দিয়ে থাকে। তাদের নামেই এগুলি মুদ্রিত হয় এবং বিবাহ আসরে তারাই এগুলির প্রচার বা বিতরণ করে থাকে।

আমাদের দেশে বিবাহ আসরে বসে কন্যার বাড়ীতে – কন্যাপক্ষ কর্তৃক ভাড়া করা কোন স্থানেও অর্থাৎ সমস্ত ব্যয়ভার কন্যার পিতা বা অভিভাবকের। বরপক্ষ ও অবশ্য কোথাও কোথাও বিবাহ আসরে অনুরূপ 'প্রীতি উপহার' বিতরণ করে থাকে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে 'প্রীতি উপহার' প্রদানের রীতি কদাচিৎ দেখা যায়। এই জাতীয় 'উপহার' বা অভিনন্দন কেউ কেউ তাদের স্নেহভাজন প্রীতিভাজন বন্ধুবান্ধবের বিবাহে রচনা করে থাকেন এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচার করেন। এগুলি অবশ্য উপহার দাতার স্বনামেই মুদ্রিত হয়। কুষ্টিয়ার কবি দাদ আলীর রচনায় তার বন্ধু শ্রী রশেমচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এ রকম আরও অনেক লেখকেরও বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত 'অভিনন্দন' বা 'উপহার' পাওয়া গেছে। এখানে দাদ আলী রচিত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

'বিবাহ উপহার কাব্য'

'শ্রীমান রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রীতি উপহার'

আজি কি আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হল তনু
শাখা পত্র পুষ্পে নব জীবন লভিল স্থানু
শম্বর বিহীন সরে
পরিপূর্ণ দেখিবারে
অম্বর ত্রিদিব বালা সম্বরিতে নারি
হর্ষে পুষ্প বর্ষিছেন তব শিরোপরি।

এ রকম ১২টি স্তবকে 'উপহার'টি সম্পূর্ণ। যাহোক এ জাতীয় ব্যক্তিগত 'উপহার' আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় বলে অধিক উদাহরণ দেওয়া থেকে বিরত রইলাম।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পূর্বে এই সব 'উপহারের' মূল উদ্দেশ্য কি তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এখানেই লোক সাহিত্যের motif বা উদ্দিষ্টতত্ত্বের কথা এসে যায়। পাত্র পাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন সুখী বা সমৃদ্ধশালী হোক এই অভিপ্রায় এসব উপহারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। উপহারগুলির একেবারে শেষের দিকে এ উদ্দেশ্য খোলাখুলি ব্যক্ত করা হয়। কখনো বা পরোক্ষভাবেও ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। বিবাহ আসরে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যেমন নবদম্পতির সুখশান্তি কল্যাণ কামনা করে মৌখিক উচ্চারণে দোয়া আশীর্বাদ মোনাজাত করে থাকেন তেমনি এই প্রীতি উপহার গুলিতেও লিখিত দোয়া আশীর্বাদ করা হয়ে থাকে। এই মঙ্গল কামনা কখনো পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে উপহারদাতার বিশ্বাস বা ধর্ম অনুযায়ী তারা স্রষ্টার কাছে করুণাময়ের কাছে আবেদন জানান।

সংগ্রহের পদ্ধতি

এ উপহারগুলির বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এগুলি সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আমার সংগ্রহে যতগুলি উপহার পাওয়া গেছে সেগুলি সাধারণতঃ তিন উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে।

(ক) ব্যক্তিগতভাবে আমি নিমন্ত্রিত হয়ে যে সব বিবাহ উৎসবে যোগদান করেছি সেখানে প্রদত্ত উপহার আমি সংরক্ষণ করেছি।
(খ) অন্যের মারফৎ কিছু কিছু উপহার সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ উৎসবে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম না। পরিচিত জন বা বন্ধুবান্ধবরা সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন।
(গ) ছাপাখানা থেকে কিছু কিছু 'উপহার' এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও মুদ্রণালয় থেকে এই সব 'উপহার' সংগ্রহ অত সহজ ছিল না। প্রথমতঃ তারা এগুলি হাতছাড়া করতে চায় না ব্যবসায়ের খাতিরে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়েছে। বড় বড় শহরের ছাপাখানায় – এগুলো এখন দুস্প্রাপ্য। কেননা শহরে 'উপহার' প্রদানের রীতি ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে।

প্রীতি উপহার প্রদানের প্রথা এখন রাজধানী বা বিভাগীয় মহানগরীতে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে– ভিডিও ক্যামেরার কল্যাণে বিবাহের শুরু থেকে অর্থাৎ পাকা কথা থেকে কনে দেখা, গায়ে হলুদ, বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ পরবর্তী বৌভাত পর্যন্ত এখন সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দী করে রাখা হচ্ছে। উচ্চবিত্ত সমাজে এখন এই রীতিই চলছে। 'প্রীতি উপহার' প্রদানের রীতি এখন মধ্যবিত্ত সমাজেই চলছে – তাও মফস্বলের শহরে অথবা গ্রামে। ভিডিও ক্যামেরার প্রচলন কিন্তু জেলা শহর ছাড়িয়ে উপজেলা বা থানা কেন্দ্র গুলিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

বৈশিষ্ট্য

এই সব 'প্রীতি উপহারের' বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রথমই দেখা প্রয়োজন – এগুলি প্রদানের উদ্যোগ কারা গ্রহণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র পাত্রীদের চেয়ে বয়সে যারা কনিষ্ঠ প্রধানতঃ তারাই এগুলি রচনা – মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকে। এর ব্যয়ভার অনেকক্ষেত্রে অভিভাবক বহন করেন। কখনো কখনো আত্মীয় স্বজনরা চাঁদা তুলে এর মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

কনিষ্ঠ (ক) ভাই–বোন (খ) ভাইপো, ভাগ্নে–ভাগ্নী, ভাই ঝি অথবা (গ) ভাবী–বৌদি (ঘ) বন্ধু–বান্ধব (ঙ) পিতামাতা, অভিভাবক বা গুরুজন – এদের নামে এই 'প্রীতি উপহার' গুলি মুদ্রিত হয়। উপহারগুলিতে যাদের নামই মুদ্রিত থাকুক না কেন– প্রকৃতপক্ষে অল্পবয়স্ক আত্মীয় স্বজনরাই এর প্রকৃত উদ্যোক্তা। এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রথার কথা বলা যেতে পারে। বিবাহের আসরে প্রবেশের সময় বাড়ীর সম্মুখে যে সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করা হয় সেখানেই প্রথম বরকে বাধা

দেওয়া হয়। যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে বর সঙ্গী–সাথীসহ বিবাহের আসরে প্রবেশ করে। এই বাধা দেওয়ার কাজটিও বয়সে ছোট ভাই বোনেরা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরাই করে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রীতি উপহারের" রচয়িতার নাম কিন্তু সাধারণতঃ মুদ্রিত হয় না – উল্লেখও থাকে না। ছাপাখানার নাম অবশ্য মুদ্রিত হয়। অবশ্য আমার সংগ্রহে দু একটি 'উপহারে' রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয়েছে। সচরাচর এরকম হয় না।

'প্রীতি উপহার' সাধারণতঃ কবিতা আকারে ছন্দে রচিত ও মুদ্রিত। তবে কখনো কখনো গদ্যে রচিত 'উপহারের'ও সন্ধান পাওয়া যায়, এবার আমরা 'প্রীতি উপহার' গুলির রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত শ্রেণীবিভাগ করবো। প্রথমে কাঠামোগত বা সাংগঠনিক (Structural) বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমে আল্লাহ, ঈশ্বর প্রজাপতির নামের উল্লেখ, তারপর (১) বিবাহের পাত্র পাত্রীর নাম– কখনো পিতার নাম – ঠিকানা উল্লেখ করা হয়।

(২) ছন্দোবদ্ধ কবিতায় উপহার প্রদানকারীর বক্তব্য বা অনুভূতির প্রকাশ। ছন্দোবদ্ধ কবিতা না হলে গদ্য ভাষায় অনুভূতির প্রকাশ।

(৩) বিবাহের আসর – স্থান ও কালের উল্লেখ

(৪) কখনো কখনো অনুষ্ঠানসূচী উল্লেখ করা হয়।

(৫) প্রার্থনা বা মঙ্গল কামনা

(৬) সব শেষে উপহার দাতাদের নাম।

পাত্র পাত্রীর নাম উল্লেখের পর প্রাসঙ্গিক বিখ্যাত কোন উদ্ধৃতি দিয়ে তারপর উপহার প্রদানকারীদের বক্তব্য নিবেদন করা হয়। বিশবছর পূর্বে ১৩৮২ সালে খুলনা বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত কোন একটি বিবাহের উপহারের শুরু এভাবেঃ

বিবাহ বলিয়া তিনটি অক্ষর যোজন করিল যে
বড়ই ভাবুক বড়ই প্রেমিক বড়ই রসিক সে
বি–অক্ষর মাঝে বিলাস বিহার বিয়া বিচ্ছেদ মাখা
বা– অক্ষর মাঝে বাঁদর বাঁধিয়া বাদ দিয়া দিল ঢাকা
হ–অক্ষর মাঝে হরিল সন্দেহ হরষ ঢাকিল তার
বিবাহ বন্ধন সৃজন কাহিনী রসিক সুজন গায়।

উল্লেখ্য যে সম্প্রদায় ভেদে উপহারগুলির শীর্ষদেশে সাধারণতঃ

(ক) বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহিম – পরম করুণাময় আল্লাহর নামে অথবা আল্লাহু আকবর– আল্লাহ মহান

(খ) শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ

মুদ্রিত হয়ে থাকে।

এবার কয়েকটি 'প্রীতি উপহারের' সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

আমাদের প্রথম আলোচ্য 'প্রীতি উপহারটি'তে সূচী দেওয়া আছে এই রকমঃ
[বিবাহ স্থান....., সময়.....]

এই উপহারটিতে পরিবারের চার শ্রেণীর স্বজনের বক্তব্য আছেঃ উল্লেখ্য যে এই 'উপহারটি' কন্যাপক্ষের পরিবারের স্বজনদের দ্বারা প্রদত্ত। বিভিন্ন শিরোণামে মুদ্রিত হয়েছে এই উপহারটি।

১। বড়ভাই – আনন্দাশ্রু
২। ভাইবোন– আনন্দোচ্ছাস
৩। ভাগ্নেভাগ্নী – কাকলি
৪। পিতামাতা – প্রার্থনা

প্রথমে 'আনন্দাশ্রু' থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

স্নেহের বোন– তুমি এতদিন ধরে
ছিলে মোদের ঘর আলোকিত করে
আজকে তোমায় বিদায় দিতে বড় ব্যথা পাই
চোখের জল মানে না বাঁধ কেমন করে রই।
শ্বশুর শ্বাশুড়ীর করতে সেবা ভুল করোনা একটি বার
পাড়া প্রতিবেশীরা পায় যেন বোন কোমল ব্যবহার।
স্বামীর পায় বেহেস্ত নারীর রেখ সদা মনে
মিলে মিশে থাকবে সদা .... ভাইয়ের মনে।
সর্বশেষে খোদার কাছে করি মোনাজাত
জীবন ভরে থাক সুখে এড়াও দুঃখের হাত।

ভাইদের এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি ব্যাপার সুস্পষ্ট– শ্বশুর শাশুড়ী তথা গুরুজনদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে তারই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে – উপসংহারে খোদার কাছে প্রার্থনা আছে যেন তারা সুখী হয়। লক্ষ্যণীয় যে বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে বিবাহের আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতি কেমন যেন পরিবর্তিত হতে চলেছে। শিক্ষিত মেয়েরা কি এখন আর শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বসবাস করে? অথবা করা কি বাস্তবে সম্ভব? এখানে বর্তমান অর্থনীতি তথা সমাজ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এসে যায়। জীবনের চাহিদা ও কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির ফলে পিতা মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসবাসের সম্ভাবনা তিরোহিত হবার পথে। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাংলাদেশের সঙ্গে এই মুহূর্তের বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের পারিবারিক জীবনের প্যাটার্ন বা ধারার অনেক অমিল লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ পরবর্তী জীবনে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একত্রে বসবাস না করতে

পারলেও বিবাহের দিনে নবদম্পতিকে এই বলেই আশীর্বাদ করা হয় যেন তারা সকলের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। বিশেষ করে কন্যাপক্ষের লোকজনের মনে এখনও একটা সংকোচ বা ভীতি বা আশঙ্কা থেকেই যায়। এই মানসিকতার কারণ যে সমাজ হচ্ছে পুরুষ শাসিত। যদিও স্ত্রীশিক্ষার হার সম্প্রতি এদেশে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে– কিন্তু ঐ মানসিকতা এখনও দূরীভূত হয়নি। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের অনেকক্ষেত্রেই লাঞ্ছিত হতে হয় – (কখনো কারণে বা অকারণেও) তাই বিবাহের দিনে কন্যার অভিভাবকদের মনে এই আশঙ্কা বা ভীতি। মনে হয় অভিভাবকেরা এখনো প্রাচীন রীতি নীতির জীবন ধারার প্রতি আস্থাশীল।

আলোচ্য এই উপহারটির শেষে পিতামাতার প্রার্থনাও আছে। এই একই বিবাহের পাত্র পক্ষের 'উপহারটি' গদ্যে রচিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বড় ভ্রাতৃবধু কর্তৃক প্রদত্ত উপহারটির শিরোনাম একটু ভিন্ন রকমেরঃ– 'অব্যক্ত মনের দু'চারটি কথা' – এই শিরোনামে রচিত উপহারটি কেন গদ্যে রচিত হলো – তার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে–

"ভাষার জাল বিস্তারে কিংবা ছন্দের অপরূপ রূপমাধূর্য দিয়ে আপনাদের জীবনের গতিকে অহেতুক কল্পিত রূপ রং ও রহস্যের রাজ্যে না গিয়ে বাস্তব মাটির পৃথিবীতেই সীমিত রাখার চেষ্টা করবো।"

তবে উপহারের প্রায় শেষের দিকে আছে শুভকামনা এবং প্রার্থনাঃ
"ভাবী, আপনার লক্ষ্মী হাতের পরশে আমাদের সংসার ধন্য হোক– পুণ্য হোক, এ কামনা করেই বিদায় নিচ্ছি।"

উল্লেখ্য এই উপহারটির শেষে রচয়িতার নামের উল্লেখ আছে। সচরাচর বিবাহের উপহারগুলিতে রচনাকারীর নাম দৃষ্ট হয়না।

এবার একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের "প্রীতি উপহারের" আলোচনা করা যাক। এ জাতীয় উপহারগুলির সাংগঠনিক রূপ– ভাষা প্রকারণ ও অলংকরণ একটু ভিন্ন রকমের। যদিও মূল উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। আনন্দ প্রকাশ ও শুভকামনাই এ গুলির মূল উদ্দেশ্য।

এ জাতীয় একটি 'উপহারের' শুরুতেই 'শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' – এই বাণী মুদ্রিত। প্রজাপতি হচ্ছে সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা জন্মদাতা এবং পূর্ব পুরুষও বটে। বেদে ইন্দ্র সাবিত্র লোম হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকেও প্রজাপতি নামে অভিহিত করা হয়। মনুসংহিতা গ্রন্থে ব্রহ্মাকেই এই উপাধিতে বিভুষিত করা হয়েছে। কারণ আসলে তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষকও বটে। ব্রহ্মার পুত্র দশজন, ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। এই 'মনু' থেকে মানবের সৃষ্টি। এই দশজন ঋষি হলেন – মরীচি, অত্রি, অনিরা, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ।

বিবাহ উপলক্ষ্যে এই জন্যেই প্রজাপতিকে প্রণাম জানানো হয়। তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয়। কেননা সমাজে বিবাহের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির ধারা রক্ষা করা হয়।

আমাদের আলোচ্য 'প্রীতি উপহার'টি বাগেরহাটের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। বিবাহের সময়কাল – বৈশাখ ১৪০১। এই উপহারটি পাত্র পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত। এতে প্রথমে আছে পাত্রের নিকট আত্মীয় স্বজনের নাম, পিতৃস্থানীয়দের নাম দিয়ে শুরু, তারপর ছোট ভাই বোনঃ ভাই বৌদি, বন্ধু বান্ধবের নাম আছে। সবশেষে 'বন্ধু মহলের' 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' অংশটুকু। এই অংশটুকু বেশ রসিকতাপূর্ণ। এই ধরনের 'পত্রিকা' মারফৎ বন্ধু বান্ধবের মনোভাব ব্যক্ত করার বিষয়ে এই প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা করা যাবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলের এই রূপ সম্মিলিত 'প্রীতি উপহার' জ্ঞাপনের রীতি একটু অভিনবও বটে। সাধারণতঃ বন্ধু বান্ধবদের 'প্রীতি উপহার' পৃথকভাবে দেওয়াই প্রচলিত রীতি। সম্ভবতঃ সময়াভাব অর্থাভাবের কারণে এই 'সম্মিলিত' উপহার প্রদানের হেতু হতে পারে।

এই উপহারের প্রারম্ভে পাত্র পাত্রীর পরিচয় সহ নাম ঠিকানা মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে পাত্র পাত্রীর নামের পূর্বে অনেক 'বিশেষণ' যুক্ত হয়েছে। এই ধরনের 'বিশেষণ' প্রয়োগ উপহারগুলিতে দেখা যায় না। পাত্রকে বলা হয়েছে– 'স্নিগ্ধশ্রী শ্রীমান' – পাত্রীর নাম বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে– 'রূপলাবণ্যময়ী– শ্রীমতি–'। পরিচয় পর্বের শেষে বহুলউদ্ধৃত উপদেশমূলক একটি কবিতাংশ প্রদত্ত হয়েছে–

'প্রেমের পবিত্র শিখা চিরকাল জ্বলে
স্বর্গ হতে আসে প্রেম স্বর্গে যায় চলে।'

গুরুজনদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে – গদ্য ভাষায়, আর ভাইবোন, ভাইপো, ভাগ্নে, বৌদি ও অন্যান্যরা ছন্দে কবিতাকারে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। যদিও কবিতাগুলি অতি ক্ষুদ্রাকারের– আট চরণের বেশী কোনটিই নয়। এই সব 'প্রীতি উপহারের' মূল উদ্দেশ্য যদিও আনন্দ পরিবেশন, ও মঙ্গলকামনা, বোধ করি উপদেশ দান ও তার একটা উদ্দেশ্য, বিশেষ করে পাত্রী পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত 'উপহার' গুলিতে এই উপদেশ দানের অভিপ্রায় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

অতি সংক্ষিপ্ত 'পত্রিকা' অংশটুকু নাম 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' সংবাদ শিরোনাম – এরকমঃ ভীষণ চুরি, আসামী গ্রেপ্তার। বলা বাহুল্য আসামী হচ্ছে পাত্র এবং বিবাহেচ্ছু বর কর্তৃক অপহৃত হয়েছে পাত্রী। অপরাধের বিচারে – বিচারক আসামীকে পাত্রীর 'হৃদয় কারাগারে – আজীবন আবদ্ধ থাকিতে আদেশ দেন।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রীতি উপহারের বিষয়বস্তু বা রূপগত আলোচনা করা যায়। প্রজাপতিকে প্রণাম জানিয়ে এর শুরু। তার পরই আদেশ উপদেশমূলক কবিতাংশঃ

সতীত্ব তেজে সাবিত্রী লভিলো হারাণো স্বামীর প্রাণ
নশ্বর দেহ বেচিয়া শিষ্য রাখিল স্বামীর মান।
অযুত যোজন ভেলায় ভাসিয়া বেহুলা বাঁচালো স্বামী

জীবনে মরণে তাদের মত হও পতি অনুগামী।

পুরাণ থেকে উদাহরণ দিয়ে পাত্রীকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বামীগতাপ্রাণ নারীর আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য এই উপদেশ।

এখানেও গুরুজন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাইপো, ভাগ্নেদের সম্মিলিত উপহার। প্রথমে গদ্য ভাষায় গুরুজনেরা পাত্রপাত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। পরে কাকার বিয়েতে ভাইপোরা, মামার বিয়েতে ভাগ্নেরা ছন্দোবদ্ধ কবিতায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে। এখানে অতি বিখ্যাত সুপরিচিত একটি শিশু পাঠ্য কবিতা 'পাখী সব করে রব' এর অনুকরণে রচিত ভাইপোদের কবিতাটুকু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল নাঃ

ঢুলি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাকুর বিয়েতে ফুল ফুটিয়া উঠিল।
ফুটিল বিয়ের ফুল সৌরভ ছুটিল
ভালবাসা দিতে কাকী আসিয়া জুটিল।
কাকীমাকে পেয়ে কাকা আনন্দে মগন
রাঙা চেলি পরে কাকী পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর
পাতায় পাতায় পড়ে দধি আর ক্ষীর।
খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পরি নিজ বেশ
আপন দেশেতে কাকা করিল প্রবেশ।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি 'উপহারের' বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। একটিতে প্রথমে 'শ্রী শ্রী প্রজাপতিকে' নমস্কার জানিয়ে পাত্র পাত্রীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, শুধু গ্রামের নাম পিতার নাম – দেওয়া হয়নি – উভয়ের গ্রামের সৌন্দর্য ও বর্ণনা করা হযেছে সঙ্গে সঙ্গে। খুলনা ও যশোর জেলার গ্রাম দুটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

"পূর্ব গগনে উদিত ভানু যশোর জেলার মনিরামপুর থানাধীন মায়ামুগ্ধ স্নেহশীতল ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা পল্লীমায়ের আদর মিশ্রিত সুশোভিত গ্রাম বাজিতপুর– "

"বাংলার – সবুজ বনশ্রী মণ্ডিত তালা থানার নলতা নিবাসী" 'প্রীতি উপহার' এই শিরোণামের পর পরই চার চরণের একটি কবিতাঃ

নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গিনীরূপে
কে গো তুমি রাধিকা
একাকী বসিয়া গাথিছ মালা

তব কৃষ্ণের লাগিয়া।

এরপর আছে গুরুজনের আশীর্বাণীঃ
রমণী যদ্যপি হয় রাজার নন্দিনী
কর্মস্থলে হয় যদি দরিদ্র গৃহিনী
পিতার ঐশ্বর্য সুখ তুচ্ছ করি মনে
দরিদ্র স্বামী সেবা করিবে যতনে।

পুরুষ শাসিত সমাজে রমনীকে স্বামীর সেবা করতে হবে এই উপদেশই এ উপমহাদেশের সামাজিক ঐতিহ্য। উপদেশের পর আছে ছোট ভাই বোন বৌদিদের বাণী– তারপর আছে একটি সংবাদ।

তার শিরোনাম ও দেওয়া হয়েছে এভাবে–
সংবাদ – (৯টা ৯৭ মিনিটের সংবাদ)
"সংবাদ – The news read by কেতর আলী তালুকদার। আজকের দিনের বিশেষ বিশেষ খবর হলো– আজ রাত ১২টায় নলতা প্রেম মঞ্চে দাস অপেরা আপনাদের যে বইখানি উপহার দিতে চলেছে – নাট্য পরিচালক গেদু সরকার পরিচালিত প্রেম ঘটিত সামাজিক নাটক– 'বাসর রাত'। এতে শ্রেষ্ঠাংশে যারা অভিনয় করবেন তারা হলেন – প্রেম জগতের আলোড়ন সৃষ্টি কারী ও কারিনী শ্যামলকুমার ও ঝর্ণা রানী। এছাড়া আরও অভিনয় করবেন – নটসম্রাট সন্দেহ রায়, সুদর্শন যুবরাজ চা মল্লিক, বিস্কুট দাদা, পান সুপারী ও দেবনাথ....।

আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য নিম্নরূপ
নলতা আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে যে প্রেম বন্যার ফলে যুবক যুবতীদের চলাফেরা ভয়ানক অসুবিধা জনক হয়ে পড়তে পারে। এই একালাকার যুবক যুবতীদের জন্য ৯২৭ নম্বর সতর্ক সঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে। আগামীকাল সূর্যোদয় রাত ১২টা ৮৯ মিঃ, সূর্যাস্ত সকাল ৯টায়। সংবাদ শেষ হলো।

এ জাতীয় বুলেটিন বা সাময়িকপত্রের অনুকরণে কিছু কিছু প্রীতি উপহার প্রচারের রীতিও আছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি 'উপহারের' উল্লেখ এখানে করতে চাই। এই উপহারে শুধু পাত্রের নাম আছে। পাত্র পরিচয় নেই– বিবাহ আসরের স্থান কাল এর উল্লেখ নেই। শুধু ছাপাখানার নাম বর্ডারের নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর প্রথমে আছে একটি উদ্ধৃতি– উদ্ধৃতি চিহ্ন [রচয়িতার নাম অজ্ঞাত]

"নূতন পথে শুভযাত্রা

করিল তব সন্তান প্রভু
তব জ্যোতি দিয়ে পথ করো আলো
সরে যেও নাকো কভু।"

উপহার দাতা হচ্ছেন – জামাই বাবু (ভগ্নিপতি) দিদি, ভাগ্নে, ভাগ্নী ও বন্ধুবর্গ। বন্ধুদের কবিতা এরূপঃ

'শুনছি নাকি বন্ধু তোমার মনটি গেছে চুরি
চোরকে মোরা আনব ধরে ২২শে জানুয়ারী।

এখানে বিবাহের তারিখটি পাওয়া গেল বটে – তবে সনের উল্লেখ নেই। এবার সাধারণভাবে অন্যান্য 'প্রীতি উপহার' গুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। প্রথমেই একটি কথা বলতে চাই – মধ্যযুগের রচিত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি এরকম– প্রথমে দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণন, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, স্বর্গভ্রষ্ট কোন দেবতার মর্তে আগমন, মানবরূপে জন্মগ্রহণ। এ কাব্যগুলিতে বিবাহ বর্ণনা থাকে– বিবাহ উপলক্ষ্যে নানা আচার আচরণের উল্লেখ থাকে– বিবাহ সভার বর্ণনা, এমনকি নারীদের মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির কথা [পতিনিন্দাও] এমনকি খাদ্য তালিকা ও রন্ধন পর্বের বর্ণনা। শেষে অবশ্য দেবতাদের জয়গান আছে– স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন ও মর্তে তাদের পূজা প্রচলনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্য শেষ হয়ে যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির বিবাহ বর্ণনা– খাদ্য রন্ধন প্রক্রিয়া বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে যুগের সমাজ মানসের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বিবাহ উপলক্ষে যে সব 'প্রীতি উপহার' রচিত মুদ্রিত ও বিতরিত হয় তার মধ্যেও সমাজের বিশেষ দিকের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে [বৌদ্ধ বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও] এ ধরনের 'প্রীতি উপহার' প্রদানের প্রথা আছে। এই প্রথা কত দিনের প্রাচীন সে কথা বলা মুস্কিল – তবে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে এ ধরনের 'উপহার' দেবার রেওয়াজ চালু হয়েছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে হস্তলিখিত অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি আকারে এ ধরনের কোন 'উপহার' এর নমুনা আমার হস্তগত হয়নি। পুরাতন ছাপাখানায় হয়তো এখনো কিছু প্রাচীন উপহারের নমুনা পাওয়া যেতে পারে– তবে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন উপহারের নমুনা ছাপাখানায় ও পাওয়া কঠিন। ব্যক্তিগত সংগ্রহে যদি কেউ সংরক্ষণ করে থাকেন তবে ভিন্ন কথা। আমার সংগ্রহে এরকম চল্লিশ বৎসর বা ততোধিক পুরাতন 'উপহারের' নমুনা কিছু রক্ষিত আছে।

আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের 'উপহার'গুলি পূর্বে আলোচনা করেছি। মুসলমান সমাজে প্রচলিত এই 'উপহার'গুলির অঙ্গ সৌষ্ঠব অলংকরণ ও ভাষা একটু ভিন্ন রকমের। যদিও সাদৃশ্য আছে অনেক এবং বহিরাঙ্গের দিক থেকে ভিন্ন হলেও মূলতঃ এগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্ন। সেগুলি এ রকমঃ আনন্দ, উপদেশ, শুভকামনা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা।

'উপহারের' উদ্যোক্তা কিন্তু এখানেও সেই একই রকমঃ
(ক) ছোট ভাই-বোন (খ) ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি, ভাগ্নী (গ) ভাবী, ভগ্নিপতি (ঘ) গুরুজন (ঙ) বন্ধু-বান্ধব। লক্ষ্যণীয় যে গুরুজনদের নামে এগুলি মুদ্রিত হলেও উদ্যোক্তা কিন্তু আত্মীয় স্বজন [বিশেষতঃ কনিষ্ঠ স্বজন] ও বন্ধু-বান্ধব। উপহারগুলি কবিতাকারেই রচিত হয়ে থাকে। তবে কদাচিৎ গদ্যভাষাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপহারগুলির ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় পরে আসছি।

এই সব 'প্রীতি উপহারে'র শুরুতে প্রজাপতিকে প্রণামের পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' বা 'বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম' মুদ্রিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো কোন উপহারের শুরুতে এ জাতীয় কোন কথাও থাকে না। এমনও দেখা যায় যে, পাত্র পাত্রীর নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই কোন কোন উপহারে। আমার সংগ্রহে এমন কয়েকটি 'উপহার'ও আছে। পাত্রপাত্রীর নাম বিহীন উপহারগুলিতে যারা উপহার দিচ্ছে [অর্থাৎ ভাইবোন, ভাগ্নে, ভাইপো, বা অন্য নিকট আত্মীয়] তাদের নামও নেই। প্রজাপতিকে প্রণাম ও বিসমিল্লাহ বা আল্লাহু আকবর বিহীন এই সব উপহারে শুধু বিবাহের দিন তারিখ ও বিবাহ আসরের নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য একটি উপহার – 'ভক্তি উপহার' নামে মুদ্রিত, এটি শুরু হয়েছে এভাবে –

ফাগুনে আগুন লেগেছে
বহিছে মৃদু হাওয়া
মিলন বার্তা এসেছে নিয়ে
প্রকৃতির আহবান ধারা।

ছোট ভাইবোনদের সম্বোধন আছে – দাদা বৌদি। কবিত্বপূর্ণ গদ্যে এ 'ভক্তিউপহার'খানি রচিত এবং একেবারে শেষে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সমাপ্ত হয়েছে এই উপহারটি।

হে বিধাতা মিনতি কবি তোমার কাছে
এ দু'টি জীবনের মিলনের মাঝে
বিরহ না আসে।

প্রার্থনা শেষে একটি প্রজাপতির ছবিও আছে। এ থেকে কিংবা দাদা বৌদি সম্বোধন থেকে অনুমান করা যায় এটি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রপাত্রীর বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত।

পাত্র পাত্রীর নাম ও বিবাহের তারিখ বিহীন আর একটি উপহারের উল্লেখ করছি- 'বড় মামার বিয়েতে' 'ফুরতি' এই শিরোণামে এটি রচিত এবং ঢাকা থেকে মুদ্রিত [ছাপা খানার নাম মুদ্রিত আছে] এটি আরম্ভ হয়েছে এ ভাবে-

আজকে মোদের বড় মামার হচ্ছে গো বিয়ে
খুশীতে তাই মন যে মোদের ছুটছে আকাশ দিয়ে।

শেষে অবশ্য ভাগ্নে-ভগ্নীর নাম আছে। [যদিও এগুলি ডাক নাম – কচি, আঙ্গুর, আনার, হ্যাপি, পপি ইত্যাদি] ছাপাখানার বর্ডার লাইন ছাড়া অন্য কোন অলংকরণ নেই। এমনকি কোন প্রার্থনা বা দোয়া পর্যন্ত করা হয়নি উপসংহারে। তবে মামা-মামী সম্পর্কে ভাল ভাল উক্তি আছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধ লেখকের বিবাহের [প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে] 'ভক্তি উপহারের' উল্লেখ করছি। এটির উদ্যোক্তা হচ্ছে ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। এরা সংখ্যায় পনর জন। [পনের জনের নাম মুদ্রিত হয়েছে সংখ্যা আরও বেশী হতে পারে] প্রথমে আল্লাহ আকবর দিয়ে এটি শুরু। বিবাহ উপলক্ষ্যে যে আনন্দ তারই প্রকাশ ঘটেছে এর মধ্যে। অবশ্য শেষে প্রার্থনাও আছে।

আজকে ওরা দুজনাতে
জীবন নদীর জোয়ারেতে
তোমারই নাম স্মরণ করি
ভাসাইল ভেলা।
রেখ তুমি শক্ত করি
হালটি ধরি
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় তুমি
করনাক হেলা।

কন্যাপক্ষ থেকে 'আমোদ আহলাদ' শিরোণামে যে উপহারটি প্রচারিত হয়েছিল – তার নাম নমুনা দিইঃ

ঝম ঝমা ঝম বৃষ্টি পড়ে ব্যাঙে ধরে তান
রাত্রিদিন চলছে মোদের হৈ হুলোড় গান।
বেলা আপার হচ্ছে বিয়ে প্রথম আষাঢ়ে
পানি কাদায় ভরে দিল সমুদ্রে শিশিরে।
কাব্য পড়ান গুরু মশায় চশমা এঁটে নাকে
আজকে দেখি পাগড়ী মাথায় চুপটি করে থাকে
দিল্লী আগ্রা ঘুরে বেড়ান নানান রসের খোঁজে
সকল খোঁজা শেষ হলো তার ক্যালকুলাসের মাঝে।

বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃতি এখানে শেষ করা হলো। ভাইবোনেরা (কনিষ্ঠ) আমোদ-আহলাদ করছে সুতরাং তাদের কারো নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এমন কি দিন তারিখ বিবাহ আসরের কোন উল্লেখও নেই। প্রথমেই বলা হয়েছে যে এই 'উপহারের' উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দরস পরিবেশন রসিকতা ও কৌতুকের মাধ্যমে বিবাহ আসরে উপস্থিত সকলের নিকট আনন্দ রস পরিবেশন। [অবশ্য কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপদেশের উদাহরণও আছে।] নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শুধু উদরপূজাই

করবেন না– মানসিক ক্ষুধারও খানিকটা নিবৃত্তি করে যাবেন – এলক্ষ্যেই উপহারগুলি প্রদত্ত প্রচারিত হয় বিবাহ আসরে। কাজেই হাস্যরসই 'উপহারের' কবিতাগুলির মূলপ্রাণ। কন্যাপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি 'উপহারে' ভগ্নিপতিদের রসিকতা তথা বাক্‌চাতুরীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।' "বোন নাজিনা বিবাহ একটি পুরাতন অথচ নিত্যনতুন জিনিস – না মিষ্টি না টক – ইহাতে কাশ্মীরী ভালবাসা আছে, বিলাতি হাসি আছে, স্বদেশী কান্না আছে, দিল্লীর গৌরব আছে, লাহোরের সৌরভ আছে, খাঁটি প্রেমের পরীক্ষা আছে, যৌবনতরীর পাড়ি আছে, গ্রীষ্মকালের আইসক্রীম আছে, বর্ষাকালের মুড়িভাজা আছে, শীতকালের গরম চা আছে। আরও আছে হাতে ধরা– পায়ে পড়া স্বদেশী গুড়ুম গুড়ুম কিল এবং মুচকি চাহনিও আছে।" এ বিবাহের তারিখ হচ্ছে ১৩৮৪ (১৯৭০) সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ, বিবাহ আসর বাগেরহাট।

এই 'উপহারের' শুরুতে উদ্ধৃতি চিহ্ন সহ একটি শ্লোক আছে –
"দুটি ফুল সরোবরে ফুটেছিল অগোচরে
তোমার বিধানে আজি মিলাইল হেথায়
দেখিও সতত প্রভূ বিচ্ছেদ না হয় কভু
এই মোদের প্রার্থনা খোদা তোমারই মহিমায়।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কোন কোন 'উপহারে' রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বিখ্যাত কবিতার চরণও উদ্ধৃত হয়েছে। যেমনঃ
"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

পাত্রপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এই বাগেরহাটের বিবাহে দেওয়া হয় "উপহার গুচ্ছ"। এর প্রথমেই আছে দাদীর আশীষ, তারপর মা, বাবা, বড় ভাই–বোন, ভাবী, দুলাভাই, ছোট ভাই–বোনদের দীর্ঘ কবিতা– একেবারে শেষে ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে–ভাগ্নীর কবিতা, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ বোধ করি বাদ পড়েনি এই আশীর্বাদ শুভেচ্ছা কামনায়।

এতক্ষণ আমরা কবিতাকারে কিংবা গদ্যে রচিত 'উপহার' সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। এবার একটু ভিন্ন রকমের 'উপহার' সম্পর্কে মন্তব্য করছি। এগুলির আকার (অর্থাৎ কাগজের) 'উপহারের' আকারের চেয়ে কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং এগুলির উদ্যোক্তা হচ্ছে বন্ধু বান্ধবেরা। এগুলি অনেকটা পত্রিকার ধরনে মুদ্রিত। এগুলির একটা ভিন্ন রকম নাম দেওয়া হয়– প্রীতি উপহার বা ভক্তি উপহার এ রকম নাম নয়।

আমাদের আলোচ্য তিনটি প্রত্রিকাঃ একটি নাম 'ঝটিকা' অপরটির নাম – 'উল্কা'। প্রথম প্রত্রিকাটির নামের পূর্বে বিশেষণ আছে– 'নির্ভীক ঝটিকা' উপরে বামদিকে চাঁদার হার উল্লেখ করা হয়েছে। "চাঁদার হার লোক চিনে"। ডান দিকে বিজ্ঞাপনের হার "উর্বশীদের জন্য ফ্রি"।

দূরালাপনী নম্বরটি মুদ্রিত হয়েছে তিনটি তারকা চিহ্ন দিয়ে। নিকটালাপনীও তাই – অর্থাৎ তিনটি তারকা চিহ্ন। তারপর আছে দিন তারিখ ও প্রকাশ স্থানের উল্লেখ। পরে আছে সংখ্যা ও প্রতি সংখ্যার মূল্যের উল্লেখ – "১ম বর্ষ, প্রথম ও স্মারক সংখ্যা–" এটি বোধ করি শেষ সংখ্যা, "তারিখ ২৪শে আষাঢ় সোমবার ১৩৮০ (১৯৭৩) খুলনা, প্রতিসংখ্যা .০০ পয়সা (শূন্য) ভারতে .০০০ পয়সা"। শেষে প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদকের নাম [এখানে সম্পদিকা] মুদ্রিত হয়েছে– 'রুমী রহমান', প্রেসের নাম – প্রেম যমুনা প্রেস' রাস্তার নাম 'ডবল জিরো কাজল ব্রু রোড'– শেষে প্রকাশ স্থান 'ফরিদপুর' – প্রকাশকের নাম 'বি কে, জামান'।

এটি এক পাতার একটি সংবাদপত্র। সংবাদ সরবরাহকারী– প্রতিষ্ঠান মারফৎ তারা সংবাদ সমূহ সংগ্রহ করেছেন। চার কলাম বিশিষ্ট এই পত্রিকাটির দৈর্ঘ ২২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৪ ইঞ্চি। প্রথম কলামের প্রথম সংবাদ হচ্ছে – "অবশেষে 'চায়না'র স্বীকৃতি" খুলনা–২৪শে আষাঢ় [বিপিআই সংবাদ সরবরাহকারী] (বিপিআই সংক্ষিপ্ত নাম, পুরো নাম উল্লেখ করা হয়নি) বলা বাহুল্য 'চায়না' চীন দেশ নয় এবং চায়নার স্বীকৃতি অর্থ কিন্তু ভিন্ন। পত্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে আমরা বুঝতে পারি কন্যার– আসল নাম তাহমিনা, ডাক নাম চায়না। আসল নামের সঙ্গে ডাক নাম এক সঙ্গেই লিখিত হয়েছে। ইদানীং আমাদের দেশে আসল নামের সঙ্গে ডাক নামের সংযোজন বা অন্তর্ভূক্তি একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। এই দ্বিতীয় নাম – সংক্ষিপ্ত নাম বা ডাক নাম আমাদের দেশের একটি সুপ্রাচীন প্রথা। [বোধ করি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই প্রথা বিদ্যমান] আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা এই দ্বিতীয় নাম বা ডাকনাম ব্যবহার করে থাকে। লিখিতভাবে এই নামের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতিকালে আসল নামের সঙ্গে [এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটে ও জমি সংক্রান্ত কাজপত্রে] ডাকনাম জুড়ে দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। আমাদের সমাজে এমন কি রাজনীতির অঙ্গনেও পরিচিত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে ডাকনাম যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা হোক আমাদের আলোচ্য সংবাদখানির প্রথম সংবাদটির তাৎপর্য হচ্ছে বিবাহে চায়নার সম্মতি পাওয়ার পরই আনুষ্ঠানিক ভাবে একথা প্রচার করা হয়। এই পত্রিকাটিতে অনেক সংবাদ ঘোষণা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, বিশেষ সাক্ষাৎকার – দুটি ক্ষুদ্র নাটিকা [আজকের নাটক – নামে, আগামী নাটক মধুরাত নামে] বৌভাত – ধাঁধার আসর মুদ্রিত হয়েছে। একেবারে শেষে শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে পাত্র পাত্রীর নাম উল্লেখপূর্বক তাদেরকে নির্ভীক ঝটিকা সম্পাদিকা আর্শীবাদ করেছেন ও তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। বস্তুতঃ এই পত্রিকার সকল সংবাদই নিছক হাস্যরস ও কৌতুক পরিবেশেনের উদ্দেশ্যে প্রচারিত।

'প্রাপ্তি সংবাদ' এই শিরোনামের খবরটি লক্ষ্য করা যাকঃ '১৮ বছরের একটি তরুণীকে অপরূপ রোডের মোড়ে পাওয়া গিয়েছে– ভদ্র মহিলার স্বামী সাহেবকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তিনি যেন অনতিবিলম্বে ভদ্র মহিলাকে নিয়ে যান।" তারপর আছে B.A. First Night পরীক্ষা ১৯৭৩ এর প্রশ্নপত্র। সময় হচ্ছে সারারাত্রি– পূর্ণমান লাভ [Love] লক্ষ্যণীয় যে প্রশ্নপত্রটি ইংরেজীতে

মুদ্রিত। বাংলা কথাগুলিও ইংরেজী তথা রোমান হরফে মুদ্রিত। Kon ratre manusher narir gati beshi otha nama karey. kon rater katha furate chaina.

তারপর বিশেষ প্রতিনিধির 'সাক্ষাৎকার' আছে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পাত্রীর নাম বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করছে, যদিও জবাব মিলেনি। নাটিকাটির কিয়দংশ এইরূপঃ

পাত্র – মনে হয় শুধু তাই নয়– নিশ্চয়ই জানি তুমি একটা বিদেশী ফু– উর্বশী সমা অথবা বাংলার চায়না।

ধাঁধাটি এইরূপঃ খুলনায় আছে – বরিশালে নেই, পাবনায় আছে – রায়পুরে নেই।

দ্বিতীয় সংবাদপত্রটির নাম – 'উল্কা' – প্রগতিশীল উল্কা। পত্রিকার সম্পাদকের নামের উল্লেখ আছে– প্রেমপ্রবাহিনী রোড, ডবল জিরো কাজল ভ্রু রোড থেকে মুদ্রিত। প্রকাশকের নাম সন তারিখ ও উল্লেখ করা হয়েছে– ১৩৭৬ ২রা ফাল্গুন, শনিবার। ১ম বর্ষ – প্রথম ও শেষ সংখ্যা – প্রতি সংখ্যার মূল্য মিষ্টি হাসি। দূরালাপনী কানে কানে। পত্রিকাটির উপর বাঁ দিকে আছে 'কেমন করে বিশ্বসুন্দরী হওয়া যায় জানতে হলে পড়ুন– প্রগতিশীল উল্কা। আর ডান দিকে আছে, "চাঁদার হার লোক চিনে," বিজ্ঞাপনের হার "সুন্দরীদের জন্য ফ্রি।" পত্রিকার প্রথম সংবাদ হচ্ছে – 'জরুরী ঘোষণা'। তারপর আছে 'ধাঁধার আসর।' আরও আছে– 'প্রাপ্তি সংবাদ'। 'লোমহর্ষক ডাকাতির আসামীর কি হলো–''আদালত কক্ষ' ও 'বিচারকের রায়'– বিশেষ প্রতিনিধির খবরানুসারে– একেবারে শেষে আছে– 'সম্পাদকীয়'।

প্রথম ঘোষণাটি এরূপ– "শুধু মাত্র যুবতীদের জানানো যাচ্ছে যে আমাদের পত্রিকায় "প্রেমের চিঠি' এই শিরোণামে একটি বিভাগ খোলা হবে। লেখিকাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন তাদের লেখা অতি সত্ত্বর বিভাগীয় সম্পাদকের নিকট পাঠিয়ে দেন।" ধাঁধার আসরে চারটি প্রশ্ন আছে– ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আবশ্যিক। ধাঁধাগুলি এরূপঃ

১। এমন একটি জেলার নাম করতে হবে যেখানে রেল লাইন নাই?

২। গাভী বিয়োলে বাছুর হয় – টিয়ে বিয়োলে কি হয়?

৩। স্বামী স্ত্রীর কি দেখতে পায় না?

৪। ...?

তারপর 'প্রাপ্তি সংবাদ'টি লক্ষ্যণীয়–

'বরিশালের বগুড়া রোডে ২৮ বছর বয়স্ক একটি ছোট খোকাকে পাওয়া গেছে। সে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। দুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিনিধি তার কথা বুঝতে না পেরে তাকে আমাদের খুলনাস্থ অফিসে হেফাজতে রেখেছেন।

এতে বুঝা গেল পাত্র বরিশাল নিবাসী এবং কন্যা খুলনার। এরপর আছে লোকহর্ষক ডাকাতির সংবাদ। 'আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কয়েকমাস ধরে একটি যুবক ছদ্মবেশে মুন্সীপাড়া থার্ডলেনের কোন এক বাসাতে প্রায়ই যাওয়া আসা করতো। হঠাৎ একদিন উক্ত যুবকটি ডাকাতের বেশে তার দলবল নিয়ে উক্ত বাসায় হানা দেয়। এবং মালিকের কন্যাসহ কয়েক হাজার টাকা এবং জিনিসপত্র দাবী করে....। অবশেষে আসামী ধরা পড়লো। এবং বিচারকের কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে হলো। শেষে বিচারকের রায় এরূপ– সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিয়ে বুঝা গেল আসামী সত্যি দোষী। তার এ অন্যায়ের– নম্বর ধারা অনুযায়ী তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের–" এর মধ্যে মিস – আসামীকে মুক্তির জন্য আবেদন জানায়। আসামীকে মুক্তি অবশ্য দেওয়া হলো তবে মিস – এর কারাগারে চিরদিনই আসামী আবদ্ধ হয়ে থাকবে। রায় শুনে আসামী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অমনি ডাক্তার এগিয়ে এলেন তার সেবার জন্য। নার্স হিসেবে নাকি ছিল – নামকরা একজন তরুণী। কি আশ্চর্য হসপিটালে যেতে না যেতেই আসামী নাকি তার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। অন্যান্য পত্রিকার মত এতেও সম্পাদকীয় আছে। এখানে পাত্র পাত্রীর নামের উল্লেখ আছে– তাদের শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে তাদের জন্য 'মঙ্গল কামনা' করে সম্পাদকীয় শেষ করা হয়েছে। সম্পাদকের প্রকৃত নাম মুদ্রিত হয়েছে, প্রকাশকের নাম পর্যন্ত আছে– যদিও রাস্তার নাম ছাপাখানার বিবাহ উৎসব এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতীকী নাম ব্যবহার করা হয়েছে। পত্রিকাটি পাত্র পক্ষের বন্ধু বান্ধব দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত। তৃতীয় পত্রিকাটির নাম আনন্দ বাজার পত্রিকা।

এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় নরহরি কুণ্ডু ও জ্যোৎস্না রাণীর বিবাহ উপলক্ষ্যে। এটি কুষ্টিয়া থেকে সংগৃহীত। বিবাহের তারিখ ১৪ বৈশাখ – ১৩৯৩ (১৯৮৪)। কন্যার নিবাস ঝিনাইদহ। বন্ধুদের দ্বারা প্রদত্ত এই পত্রিকার প্রধান বক্তব্য হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশিত।

আবহাওয়া সংবাদটির নমুনা এরূপঃ

'এই মাত্র পাওয়া আর একটি সংবাদ জানানো যাচ্ছে যে এই সময় এই এলাকায় ০০ সেন্টিমিটার বেগে প্রেমের হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে ০ মিটার বেগে প্রেম দরিয়ার মিষ্টি ঘোলা পানিও বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ১০০%। তার জন্য শাড়ী ব্লাউজ ব্যতীত আরও কিছু বাড়তি কাপড়ের ব্যবস্থা করে রাখার জন্য বলা হয়েছে।"

বাজার দরের নমুনাঃ

১। নরম হাতের কিল প্রতি বস্তা ষোল আনা

২। মুচকি হাসি – প্রতি ড্রাম – দেড় টাকা ছয় আনা

৩। বাঁকা চোখের চাহনি– প্রতি ইঞ্চি সাড়ে এক টাকা

৪। বুকে বুকে ধাক্কা – বিনা পয়সা

৫। মিষ্টি পান কোমল হাতে

৬। অভিমান মিনিটে মিনিটে।

এরপর আছে আরও নানা প্রসঙ্গের অবতারণাঃ
যেমন– ভাব সম্প্রসারণ, টিকা লিখ, বিজ্ঞাপন পাত্রী চাই ইত্যাদি। শেষে জগদীশ্বরের কাছে নবদম্পতির জন্য প্রার্থনা বা শুভ কামনা।

সাধারণভাবে এসব 'প্রীতি উপহরের' উদ্দেশ্যঃ (ক) আনন্দ দান (খ) উপদেশ প্রদান (গ) মঙ্গলকামনা। বিবাহ অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হন তাদের মধ্যে এগুলি প্রচারিত হয়। উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দ এগুলি তৎক্ষণাৎ পাঠ করেন। ঐগুলি সেই মুহূর্তে পাঠ না করলে পরবর্তী সময়ে এগুলি পাঠ করেন– এবং আনন্দ লাভ করেন। অবশ্য অনেক সময়ই এগুলি তারা সংরক্ষণ করেন না।

বিবাহ মানব সমাজের একটি সুপ্রাচীন প্রথা। যে কোন সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর জন্য এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হলেও সামাজিক অনুষ্ঠান। ধর্মীয় বা সামাজিক যা–ই হউক এ অনুষ্ঠানে বিবাহেচ্ছু নরনারী তার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। ব্যক্তি জীবনে দুটি নরনারীর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সারাজীবন ব্যাপী দুটি নরনারী ঐ অনুষ্ঠানটিকে ঐ দিনটিকে স্মরণ করে থাকে। অধুনা 'বিবাহ বার্ষিকী' অনুষ্ঠানের আয়োজন শিক্ষিত সমাজে দেখা যায়। উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে এ অনুষ্ঠান অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজেও এর প্রচলন দেখা যায়।

এ বিবাহ অনুষ্ঠানকে কোন কোন সম্প্রদায়ধর্মীয় মূল্যবোধ এর কারণে অতি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সে কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নর নারীর এ বন্ধন কোন ক্রমেই ছিন্ন করা যায় না। বিবাহের সময় শপথ বা মন্ত্র পাঠ করা হয়– উচ্চারিত হয় এমন উক্তি – "আমাদের এই বন্ধন কেহ ছিন্ন করতে পারবে না– শুধুমাত্র মৃত্যুই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।" কোন কোন সম্প্রদায়ে এমন বিশ্বাসও আছে যে, মৃত্যুর পরও এ সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বামীর মৃত্যুর [পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই সম্ভবতঃ] পর স্ত্রী পরলোকগত স্বামীর কথা স্মরণ করে– তার মঙ্গল কামনা করে – অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবে। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ ধর্মমতে নিষিদ্ধ। সম্প্রতি কোন কোন স্থলে আইন প্রণয়ন করে এ দ্বিতীয় বিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। আবার বিবাহ বিচ্ছেদকেও আইন দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে।

ভাষা ও সাংগঠনিক রূপঃ
বলা বাহুল্য অধিকাংশ 'প্রীতি উপহারের' মাধ্যম কবিতা। ছন্দোবদ্ধ বাক্যে মনের ভাবকে প্রকাশ করলে তা আকর্ষণীয় ও মনোহর হয়ে উঠে। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে গদ্য ভাষায়ও 'উপহার' রচিত হয়েছে দেখা যায়। এমন কি 'প্রীতি উপহারে' কিয়দংশ গদ্যে কিয়দংশ ছন্দে রচিত। আর 'পত্রিকা' নামধারী 'উপহার'গুলি সবই গদ্যে রচিত। ছন্দে রচিত 'পত্রিকা' আমার হস্তগত হয়নি।

প্রথমে গদ্যে রচিত 'উপহার' সমূহের ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। গদ্যে রচিত 'উপহার'গুলি রম্যরীতিতে লিখিত। সাধু গদ্য রীতির রচনা খুব বেশী দৃষ্ট হয় না। তবে 'উপহারের' এ গদ্য ভাষা আবেগ জড়িত উচ্ছাসে পরিপূর্ণ। ছন্দে রচিত উপহারে যেমন উপমা রূপকের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় গদ্যে রচিত উপহারেও তেমনি উপমা রূপকের ছড়াছড়ি। 'পত্রিকা' আকারে যেগুলি রচিত সেখানে হেঁয়ালি, ধাঁধা, প্রতীকী ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তথা অলংকার প্রয়োগের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) বিশেষণ প্রয়োগের আধিক্যঃ
শুভ্র অনুভূতি, প্রীতির বন্ধন, অচেনা চাহনি, আবেগমুখর চপলতা, নিবিড় রোমাঞ্চ, দুর্গম পথ, দীপ্ত আভা, চঞ্চল মুহূর্ত।

(খ) সমাসবদ্ধ গদ্যের ব্যবহারঃ মিলন মালা, সংসার ক্ষেত্র, স্নেহ দুলালী, স্নেহচ্ছায়া, মায়ামুগ্ধ, স্নেহশীতল, ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, তীর্থনীড়, স্নেহসুধা, সোনার কাঠি, আলোক বর্তিকা।

(গ) উপমা রূপকের প্রয়োগঃ হরিণ শাবকের ন্যায় অস্থির, সংসার সাগর পাড়ি, জীবন সমুদ্র, আনন্দ বেদনা, আম-তেতুঁলের মত পাশাপাশি জান্নাতের ফুলের মত-লক্ষী হাতের পরশ, হৃদয় কারাগার, মনোরাজ্যের যাত্রাপথ. জীবনের সিংহদ্বার, পল্লীমা, হৃদয়মন্দির, অনুরাগের গঙ্গাজল, পুর্ণিমার মত সমুজ্জ্বল শিশির স্নিগ্ধ ফুলের মত পবিত্র।

এবার এই 'উপহার'গুলির ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। অধিকাংশ 'উপহারের' কবিতাংশটুকু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কখনো কখনো স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সামান্য ক্ষেত্রে পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে কোথাও কোথাও একাধিক ছন্দের মিশ্রণ ঘটেছে। চরণ বা মাত্রার সাম্য সর্বত্র বজায় থাকেনি। অধিকাংশ কবিতাই অন্তমিল বিশিষ্ট। কবিতার ভাষায় উপমা রূপকের ছড়াছড়ি সে কথা বলা বাহুল্য।

ছন্দের ক্ষেত্রে মিশ্রণ দোষের দু'একটা উদাহরণ দেওয়া হলো। মাগুরা নিবাসী পাত্রের সঙ্গে বাগেরহাট নিবাসী পাত্রীর বিবাহ (১৩৮৮ সালে অনুষ্ঠিত উপলক্ষ্যে) 'বধূবরণের' উদ্ধৃতি দেওয়া যাকঃ

ললাটে সিঁদুর রেখা পরিধানে লাল শাড়ী
পূর্ণ কলসী কাঁখে মাথায় লাল আড়ি
সুশোভিত আঙ্গিনায় হবে বধূ পরিচয়
সানাই গাহিবে আগমনী।

এখানে শেষ দুই চরণে অন্ত্যমিল নেই এবং মাত্রা সংখ্যার গরমিলও লক্ষ্য করা যায়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি 'উপহার' ভাগ্নে ভাগ্নী কর্তৃক প্রদত্ত-

অনেক দিনের স্বপ্ন মোদের –
সফল হলো আজ
সাঁঝের প্রদীপ হয়ে এল
মামার ঘরের মাঝ।

এটি স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দে রচিত। বন্ধুরা লিখছে –

শুনছি নাকি বন্ধু তোমার
মনটি গেছে চুরি
চোরকে মোরা আনবো ধরে
বাইশে জানুয়ারী।

বাগেরহাটের দাশের বিবাহ উপলক্ষ্যে (১৩৯৭) 'একগুচ্ছ প্রতিবেদন' এর কবিতার নমুনাঃ

তুমি বৌদি তুমি মাতা তুমি বন্ধু সব
হৃদয়ের মাঝ এই কথা করিছে কলরব।

নাটোরের– দিদির বিয়েতে (১৯৯২) 'ভক্তি উপহার'

সাবিত্রী সতীর কথা
রেখ সদা মনে
জীবন পথে চল দিদি
চির সাথীর সনে।

জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে চায়নার বিবাহ উপলক্ষ্যে (১৩৮০) 'ছোটদের সবুজ মনের কলগুঞ্জন' শোনা যাকঃ

মেঝ মামার বিয়েতে যাব
ধরেছি যে বায়না
বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠে
নামটি ওর চায়না
পরে যখন বুঝে নিলাম
চায়না নামের রহস্য
সবাই মিলে পণ করিলাম
যেতে হবে অবশ্য।

ছোটদের 'গুঞ্জন' ছড়ার ছন্দেই মানায় ভাল।

বাগের হাটের টিপুর সঙ্গে– বেগমের শুভ পরিণয় (১৩৮৪ সালে) উপলক্ষ্যে 'উপহার গুচ্ছ' এর নিদর্শন এ রকমঃ

হঠাৎ এল খুশীর খবর
টিপু দাদার বিয়ে
ফতেপুরে মিলতে হবে
মেহেদী হলুদ দিয়ে।

পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে হাস্য–রস পরিবেশন বা আনন্দময় মুহূর্তকে কথায় কর্মে ব্যক্ত করাই এই উপহারগুলির মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য এসব কবিতা গুচ্ছ বা পত্রিকার মধ্যে কৌতুক রস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি উপহারে 'পাখী সব করে রব' কবিতার প্যারডীর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা যায় ইংরেজী বাংলায় মিশিয়ে কবিতা রচনার প্রয়াস। বাগের হাট থেকে সংগৃহীত একটি উপহারের সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাকঃ

'ঠাকুর পোর B.A তে E.R.কি'

Good morning dear ভাই – Your নাকি B.A.
আমি তাই ছুটে এলাম New News পেয়ে
বলেছিলে থাকব Free করব নাকো বিয়ে
To-day তুমি যাচ্ছ কোথা টোপর মাথায় দিয়ে।

যশোর জেলার – কুমারের বিয়েতে বৌদিরা লিখছেনঃ

Good morning ঠাকুর পো – Your নাকি B.A.
Very glad হয়েছি মোরা Invitation পেয়ে
আর কিছু বলবো না ভাই এবার তবে যাই
Coming Year এ খুকির ভাতে Invitation যেন পাই।

এখানে ভবিষ্যৎ বংশীয় শিশুর আগমনের ইঙ্গিত পর্যন্ত আছে। অন্নপ্রাশনের অগ্রিম নিমন্ত্রণ পর্যন্ত কামনা করা হয়েছে।

এবার এসব 'উপহার' এর অলঙ্করণ বা অঙ্গ সজ্জা (Getup) সম্পর্কে সামান্য মন্তব্য করা যেতে পারে। এসব উপহারে কি ধরনের অলঙ্করণ হয়ে থাকে তা বর্ণনা করার পূর্বে যে সব কাগজে এগুলি মুদ্রিত হয় তার বিবরণ দিতে হয়।

প্রথমতঃ এগুলি সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। এগুলির আকার ফুলস্কেপ কাগজের $\frac{১}{৮}$ অর্থাৎ দৈর্ঘ ১৪ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮$\frac{১}{২}$ইঞ্চি। সচরাচর এগুলি রঙীন (গোলাপী, হলুদ বা নীল বা সবুজ) কাগজে ছাপা হয়। কদাচিৎ সাদা কাগজে ছাপা হয়।

এগুলির বর্ডার দেওয়া হয় ফুল বা নকশা দ্বারা। বর্ডারগুলি অবশ্য মুদ্রাকর বা ছাপা খানা থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু কিছু ছবিও মুদ্রিত হয়। কখনো কখনো মুদ্রাকর এগুলি দিয়ে থাকে– কখনো কখনো উদ্যোক্তাদের পছন্দ মত এগুলি মুদ্রিত হয়। ছবি গুলি এ রকমের হয়ঃ

(ক) উপরে দুদিকে দুজন পরীর ছবি – তাদের হাতে ফুলের মালা থাকে।
(খ) কোথাও উপরে দু'দিকে দুটি ফুল থাকে – সাধারণত গোলাপ ফুল, কদাচিৎ অন্য ফুল থাকে।
(গ) পরীদের ছবি ছাড়া 'প্রীতি উপহার' বা শিরোণামের ও নক্সা করা হয়– শুধু অক্ষর থাকে না। নক্শার মধ্যে সাধারণত ফুল লতাপাতারই ছবি থাকে।
(ঘ) উপরে পরীর ছবি না থাকলে নীচে কোথাও শঙ্খের ছবি থাকে।
(ঙ) দুটি ফুলের ঝাঁপি দুদিকে মুদ্রিত হয়
(চ) কোন ছবি (ফুল বা পরী বা শঙ্খ) ছাড়াই তাকে 'উপহার' মুদ্রিত হয়।

মুসলিম পাত্র পাত্রীদের বিবাহে সাধারণতঃ পরী বা শঙ্খের ছবি থাকে না– তবে ফুলের ছবি কোথাও কোথাও থাকে। একেবারে কোন ছবি ছাড়া উপহারে শুধু বর্ডার লাইন থাকে – এটা মুদ্রাকর সরবরাহ করে।

উপহারগুলি সচরাচর কাগজের একদিকেই মুদ্রিত হয়। তবে কোথাও ছোট আকারের কাগজে (দৈর্ঘ ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ৩$\frac{১}{২}$ইঞ্চি) চার পৃষ্ঠা ব্যাপী 'উপহার' মুদ্রিত হয়ে থাকে। এগুলির সাধারণতঃ ডিমাই $\frac{১}{৮}$ সাইজের কাগজে মুদ্রিত হয়। পত্রিকার আকারে বা ঢং এ যে সব উপহার মুদ্রিত হয় সেগুলিতে সাদা কাগজ ব্যবহার করা হয়। এ কাগজগুলির আকার সাধারণ উপহার এর কাগজের চেয়ে বড় আকারের সাধারণত এগুলি ডবল ক্রাউন $\frac{১}{৪}$ বা ডিমাই $\frac{১}{৪}$ আকারের কাগজে মুদ্রিত হয়।

উপসংহার

এতক্ষণ আমরা বিবাহের 'উপহার' সমূহের বর্ণনা বিষয়বস্তু ভাষা অলংকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এগুলির কি স্বার্থকতা আছে? এগুলির মূল্য কি? শুধু শুধু কি অর্থের অপচয়। বিবাহের এই সব 'প্রীতি উপহার' এর আয়ু বা স্থায়িত্ব কতক্ষণ? বিবাহ আসরের স্থায়িত্ব যতক্ষণ এই 'উপহার'গুলি ততক্ষণই তার অস্তিত্ব। তারপর কেউ আর এগুলি পড়ে না– দেখে না – সংরক্ষণও করে না।

বিবাহ একটি আনন্দ অনুষ্ঠান। ব্যক্তিগত তথা পরিবারগত আনন্দের ব্যাপার। এই আনন্দ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে নিজের আনন্দকে আরও বর্দ্ধিত আরও সম্প্রসারিত করাই এসব উপহারের সার্থকতা। অর্থনৈতিক সাধ্য বা শক্তি অনুযায়ী বিবাহ

অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন [কখনো কখনো ঋণ করেও] করা হয়ে থাকে। কত বেশী সংখ্যক অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হলো তা যেন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষ বা বরপক্ষ গৃহ আলোক সজ্জায় সুসজ্জিত করে– গান বাজনার ব্যবস্থা করে– আমাদের দেশের বিবাহের প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান এগুলি। আর সেই সঙ্গে বিবাহের আসরে 'প্রীতি উপহার' প্রদানও এককালে একটি প্রচলিত রীতি ছিল। যদিও অধুনা সব বিবাহে (শহরে কিংবা গ্রামে) এগুলো আর প্রচলিত নেই। ভিডিও ক্যামেরার বদৌলতে এ 'উপহার' প্রথা লোপ পেতে শুরু করেছে।

এগুলির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের একটি প্রতিফলনও ঘটে। এ রীতির মধ্যে যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় বা সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তা নয়– এ রীতি একটি মানসিক প্রক্রিয়াও বটে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই 'উপহার' প্রদানের রীতির একটি বিশেষ মূল্যও তাৎপর্য আছে।

বিবাহ হচ্ছে সংসার জীবনে প্রবেশের প্রথম সোপান। এই জীবনে প্রবেশের সময় আপনজনের বা নিকটজনের শুভেচ্ছা একটি বড় প্রেরণা বা উদ্দীপনা। এ প্রেরণা মানসিক শক্তি জোগায়– দুটি অনভিজ্ঞ নরনারীর জীবনপথে চলার। এ উপহারগুলি শুধু 'আমোদ আহলাদ' বা 'ফুরতি' 'উচ্ছাস' বা 'গুঞ্জন' মাত্র নয়– এগুলি শুভেচ্ছার প্রতীক–মঙ্গল কামনার প্রতীক। এ শুভেচ্ছা শুধু গুরুজন অভিভাবকগণই দেন না– বন্ধু বান্ধব এমন কি বয়ঃকনিষ্ঠরাও নব বিবাহিত দম্পতির মঙ্গল কামনা করেন। অন্যান্য আশীর্বাদ বা দোয়া বা মঙ্গল কামনার সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষ্যে এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পার্থক্য এই খানে। এই পার্থক্যের জন্যই এগুলি এক অনন্য রীতি বা প্রথা। আমাদের এই উপমহাদেশের বাইরে এ ধরনের রীতি নেই বলেই জানি। পাশ্চাত্য বা অন্যান্য দেশে [অতি সভ্য বা মাঝারি সভ্য বা অতি ধনী] অবশ্যই বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন বিবাহের নিমন্ত্রণ পেলে 'অভিনন্দন' জানাতে সুশোভন 'কার্ড' বা চিঠি পাঠান। কেউ কেউ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন কেউ বা করেন না। কেউ কেউ হয়তো মূল্যবান কোন বস্তু উপহার দেন। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও মানসিকতাকে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। এখনও আমরা এই প্রথাকে [বহু পুরাতন প্রথার মতই] স্বীকার করি– অনুসরণও করি।

তাই এই 'প্রীতি উপহার' প্রদান প্রথা এদেশের সমাজ জীবন তথা সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকেরই পরিচায়ক।*

* আমার সংগ্রহের মাত্র কয়েকটি 'উপহার' সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো। তবে সাধারণভাবে 'উপহার'গুলির বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য প্রায় একই রকমের। শুধু ভাষারীতি – উপস্থাপনা পৃথক। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের 'উপহার' সংগ্রহ করলে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব।

এই প্রবন্ধের শেষে ৪টি উপহারের ফটোকপি সংযোজিত হলো।

নব প্রজন্মের প্রিয় ঠিকানা খ্যাত সামাজিক সুখ নিলয় মোহনার সুযোগ্য সভাপতি মোঃ ফোরকান আজমের ভ্রাতুষ্কন্যার নব জীবন অভিষেকে আমাদের—

ফুলেল শুভেচ্ছা

অস্তিত্বের অহংকার মহান স্বাধীনতা,
শিকল ভাংগার সেই দিন—
মুক্তি পাগল জনারণ্যের মরণজয়ী উন্মাদনা—
শত শহীদের আত্মত্যাগে পুষ্ট বিজয় আমাদের।
পবিত্র সেই ক্ষণে তোমাদের জীবন সানায়ে
বাজে মিলনের সুর মঞ্জরী,
ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণিল আবহে—
তোমরা নিচ্ছ নতুনত্বের আস্বাদ।
আমরা তোমাদের জানাই
পুষ্পিত শুভাশীষ।
ব্যাংকার আর শিল্পী মনের সৌরভ—
সেফটি লকারে শিল্পীর হৃদয় ক্যানভাস
জলরং - তেলরংয়ের নানা মাধুরীতে
বেড়ে উঠবে সংগোপনে, মিশেল হবে
দুজনে দুজনায়
ফাগি - ডায়না বা ক্লিওপেট্রার দাম্পত্য নয়
আমরা চাই চিরায়ত কুল বধূর নিদায়
যুগল জীবন।
ভোগ আর উপভোগের কারুময় অনুভবে
হারিয়ে যাও নিরন্তর
জীবন ঘনিষ্টতায় উপড়ে ফেল সকল সংস্কার।
জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে— বসন্তেরই
মাতাল সমীরণে।

২৫শে মার্চের
বিমুগ্ধ রজনী '৯৪

শুভমুগ্ধ
কর্মকর্তা ও সদস্যবর্গ
মোহনা
রেজিঃ নং—১৭১৭/৯২
গড়দুয়ারা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তি: মাহমুদ শাহ কোরেশীর সৌজন্যে।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নম :

সুপ্রিয় বড়দার শুভ-পরিণয়ে

"ভক্তি-উপহার"

দাদা !

বসন্ত যেমন প্রকৃতিতে আসে শীতের জরাজীর্ণতাকে পশ্চাতে ফেলে আনন্দের গান নিয়ে, নদী যখন আনন্দে নেচে উঠে তার যৌবনের ঢেউয়ের তালে তালে। তুমিও ঠিক তেমনি আজ প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে তোমার কুমারত্বকে বিসর্জন দিয়ে এক অজানা অথচ আকাঙ্খিত জীবনে পা বাড়াতে চলেছো দাদা।

যৌবনের পদার্পন থেকে তুমি হারিয়েছিলে তারুণ্যের দীপ্রভা, ক্ষিপ্রতা, হিংস্রতা, উচাটন মন নিয়ে চলেছিলে এক নীড় হারা পাখীর মত, হয়তো বা তারই পরিসমাপ্তি ঘটাতে আজ তুমি হয়েছো বদ্ধ পরিকর। মনে আজ সাজিয়েছ সেই গল্প কথার রাজ কুমারের স্বপ্নালোকের রঙ্গমঞ্চ। সেই স্বপ্নটা কখন কোন মুহূর্তে সার্থক হবে তুমি রয়েছো সেই প্রতীক্ষায়। অথচ এরই কোন এক অবসরে তুমি যেন ঠিক আমাদের কাছ থেকে একটু দুরে সরে যাচ্ছ, তা কি কখন ভেবে দেখেছ দাদা !

যাক তুমি স্বার্থপর হলেও তোমার এই শুভলগ্নে আমরা কি তোমাকে অভিসম্পাত করতে পারি ? না ! বরং বুদ্ধিমানের মত তোমারই এই শুভলগ্নের মত আমাদের জীবনে আসুক এই কামনা রেখে আশীর্বাদ করছি, করবো যেন তোমার পাপ উচ্চারিতে তোমার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টির মত বর্ষিত হোক ; ভগবানের আশীষে সুখী হোক তোমাদের দাম্পত্য জীবন।

বৌদি !

ঋতুতে ঋতুতে,. বর্ষে বর্ষে ধরণী যেমন রূপ বদলায় প্রকৃতির নিয়মে ঠিক তোমারও এসেছে আজ রূপ বদলানোর পালা, এতদিন তুমি ছিলে বৃক্ষ বিহিন লতা, কবিতা বিনা কবিতা, আচ্ছাদন বিহীন প্রতিমা, ঠিক যেন তা কাগজের শ্বেত পাতা। আজ যেন সে সমস্ত কিছুর পূর্তা এনে ঐ সাদা কাগজটার উপর কালির আঁচড় টেনে ওর মুল্যায়ন করতে যাচ্ছ। তোমার কল্পলোকে হয়তো আজ ভেসে উঠেছে সেই সতী সাবিত্রীর চরিত্রটি, বিষ্ণু প্রিয়ার সহিষ্ণুতা, রাধিকার অভিমানটি। হয়তো কপালে পড়বে একটা সিন্দুরের ফোটা, করজোড়ায় পরবে একজোড়া রঙ্গিন শাঁখা। হয়তো ভাবছে সেই কৃষ্ণটার মন যোগাতে পারবে কি না। পারবে সত্যবানকে বাঁচাতে ? পারবে কি সেই নিমাইকে সন্ন্যাস পথ থেকে ফিরিয়ে ঘরে বাঁধতে ? তাই এতদিনকার "তুমি" আর আজকের তুমিতে অনেক বিয়োগ হতে যাচ্ছে। অনেক কিছু যোগ হতে যাচ্ছে। পার হতে হবে আজ তোমাকে অনেক বাধা। নুতন জীবন, নুতন পরিবেশে তোমার চিন্তা, তোমার বলা, তোমার সেবা, তোমার ভক্তি, তোমার শুভেচ্ছা, তোমার ভালবাসা, তোমার স্নেহাশীর্বাদ করতে আজ আনন্দমুখর বিচিত্রতর সুখময়। তবেইতো হবে তোমার নারী জীবনের স্বার্থকতা।

হে ভগবান,
দু'টি ফুল এতদিন ছিল দুই বনে,
তোমার বিধানে আসি মিশিয়াছে পাশাপাশি,
তব আদেশে দুটি জীবন চলিল নব যাত্রা পথে
আলোর দিশারী তুমি হে পতিত পাবন।
আঁধারে পথ দেখাও তাদের হে নারায়ণ ॥
প্রার্থনা করি তব পায়ে থাকে সদা তার মতি।
প্রার্থনা করি চিরসুখী হয় যেন এ নব-দম্পতি ॥

বিবাহ বাসর —বাসুদেবপুর।
উপজেলা - পাংশা।
জেলা -- রাজবাড়ী।
তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ '৯৮

তোমাদের —
নিরঞ্জন. নিত্য, সুবোধ, সন্তোষ,
দুলাল, স্বর্ণা, পান্না, যমুনা,
তাপস আরও অনেকে।

ইব্রাহিম প্রেস, কুষ্টিয়া।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

বারুইখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাহার চতুর্থ পুত্র
শ্রীমান রবিদাস সাহার সহিত শ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অরুণ
চন্দ্র সাহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতি সারথি রাণী সাহার
—শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে—

সতিত্ব তেজে সাবিত্রী লভিল হারানো স্বামীর প্রাণ,
নশ্বর দেহ বেচিয়া শৈব্যা রাখিল স্বামীর মান।
অযুত যোজন ভেলায় ভাসিয়া বেহুলা বাচাইলা স্বামী,
জীবনে মরণে তাদের মত হও পতি অনুগামী।

স্নেহের বৌমা,

অদ্য তোমার জীবনের এক নূতন সূচনা। নারী জীবনের চরম বিকাশ এক শুভ অধ্যায়ের আরম্ভ। যাত্রা পথে তুমি কল্যাণী নারী তোমার কক্ষে মঙ্গল ঘট তুমি ছড়িয়ে দিবে প্রীতির তীর নীড়ে, বিলিয়ে দেবে স্নেহ সুধা তোমার হাতে রয়েছে সোনার কাঠি যার যাদুস্পর্শে গড়ে উঠবে একটি সোনার সংসার। এমনি এক সংসার মাঝে তোমার শুভাগমন। এতদিন এই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থেকে তুমি দূরে ছিলে। আজ সেই সংসার প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। এই সংসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু পুত্র কন্যাকে স্নেহ ও স্বামীকে ভালবাসা নয়। বিবাহের মাধ্যমে যে প্রেম, প্রীতির উদ্ভব হয় তাহা বিশ্ব প্রেমে উন্নীত করাই তোমার বিবাহের সার্থকতা। তুমি সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলার চরিত্রের অধিকারিণী হয়ে সতী সাধ্বীর আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে সমগ্র নারী জাতীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। তাতেই তোমার সুখ্যাতি, সুযশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক ইহাই আমাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ।

ইতি—গুরুজনেরা।

দাদার বিয়েতে দু'টি কথা.

বৌদি! হরকে পাবার জন্য পার্বতীকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু তুমি দেখছি দাদাকে অতি সহজেই পেয়ে গেলে। এমন সুন্দর পবিত্র পূজা কোন ফুলে করেছ বৌদি? কি বললে? হৃদয় মন্দিরে দাদাকে প্রতিষ্ঠা করে শ্রদ্ধার চন্দন, ভক্তির তুলসী, অনুরাগের গঙ্গাজল, প্রেমের সুগন্ধি পুষ্প, আর ভালবাসার পবিত্র নৈবেদ্য দিয়ে দাদাকে পূজা করেছ? তা বেশ করেছ! দাদাকেতো জয় করেছ; এবার আমাদেরও আপন করে নিও। সময় অসময়ে আমরা কিন্তু তোমাকে অনেক জ্বালাতন করবো। বর্তমান সংসার নিয়মে আমাদের দূরে ঠেলে দিওনা বৌদি; বরং কাছে টেনে স্নেহাদৃত করো। আমরা চিরদিনই তোমার স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে রইবো।

ইতি—তোমার ভাই ও বোনেরা।

কাকার বিয়েতে :—

ঢুলি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাকুর বিয়েতে ফুল ফুটিয়া উঠিল।
ফুটিল বিয়ের ফুল সৌরভ ছুটিল,
ভালবাসা দিতে কাকী আসিয়া জুটিল।
কাকীমাকে পেয়ে কাকা আনন্দ মগন,
রাঙ্গা চেলি পরে কাকী পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে দধি আর ক্ষীর।
খাওয়া শেষ হলে পরে —পরি নিজ বেশ,
আপন দেশেতে কাকী করিবে প্রবেশ।

ইতি—ভাইপো ও ভাইঝিরা
শুভঙ্কর, স্বরূপ, অরূপ ও সঞ্চিতা।
বিবাহ বাসর—কচুয়া।

ঠাকুরপোর B. A. তে E. R. কি?

Good morning dear ভাই Your নাকি B.A.
আমি ভাই ছুটে এলাম New news পেয়ে।
বলেছিলে থাকব Free করবো নাক বিয়ে,
Today তুমি যাচ্ছ কোথা টোপর মাথায় দিয়ে।
আজ কেন ভাই Your মুখে মৃদু মধুর হাসি,
কার গলে দিবে ফাঁসি Deep ভালবাসি।

ইতি তোমার—বৌদিরা।

মামার বিয়েতে:

বাজছে সানাই ভোর হতে মামার বিয়ে বলে,
তাইতে সবাই ছুটে এলাম সকল কাজ ফেলে।
আসবে যখন রাঙা মামী মাথায় টোপর দিয়ে,
বলবো মোরা ঘোমটা খোলো ওগো লক্ষ্মী মেয়ে।

ইতি—ভায়ে ও ভায়িরা
লিটন, কৃষ্ণা, শিল্পী ও সম্পা।

তারিখ—৭ই বৈশাখ, শুক্রবার ১৪০২ সাল।

পুবালী প্রিন্টিং প্রেস, রেলরোড, বাগেরহাট।

আল্লাহ আকবর ।।

জনাব আলহাজ আনছার উদ্দিন সাহেবের

দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মাৎ নাজিনা খানমের

—সহিত—

ফতেপুর নিবাসী জনাব কাজী মোয়াজ্জেম

হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র

কাজী মহিবুল ইসলাম (টিপু)-এর

—ঃ শুভ-পরিণয়ে ঃ—

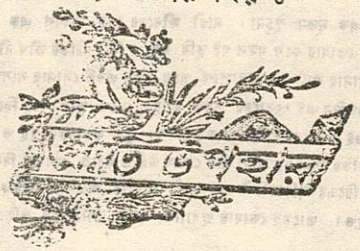

"ফুটে ফুল সরোবরে ফুটেছিল অগোচরে,
তোমার বিবাহে আজি মিলাইলে হেথায়।
দেখিও সতত প্রভু বিচ্ছেদ না হয় কভু,
এই মোদের প্রার্থনা শোনো তোমারই মহিমায়।"

১। স্নেহের নাজিনা ও মহিবুল—
আব্বা, আম্মা ও শ্বশুর শাশুড়ী।

২। আদরের বোন নাজিনা—বড় ভাই ও বোনেরা।

৩। মেঝে আপার বিয়েতে ও তুলা ভাই—
ছোট ভাই ও বোনেরা।

৪। খালা আম্মার বিয়েতে—ভাগ্নে ও ভাগ্নিরা।

৫। ভগ্নিপতিদের একটুখানি ইয়ে—ভগ্নিপতিরা।

বিবাহ-বাসর—পূবালী প্রিন্টিং প্রেস,
রেলরোড, বাগেরহাট।

তারিখ—২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৮৪ সাল।

পূবালী প্রিন্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত।

স্নেহের নাজিনা !

আজ তোমার শুভ-লগ্নে বার বার মনে পড়ছে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যের কথা। আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল—তোমাকে মানুষের মত করে গড়ে তোলা—জানিনা, আমরা তা কতটুকু পেরেছি। চেষ্টার ত্রুটি আমরা পূর্বে করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না। এতদিন কল্পনা ঘন আনন্দ উপভোগে লিপ্ত ছিলে, আজ সে সব তন্ময়তা ঝেড়ে জীবন যুদ্ধের অভিযাত্রী হোতে চলেছ। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়-এ পথে আনন্দ বেদনা পাপাপাশি আম তেঁতুলের মত বাস করে। জীবন যুদ্ধে পদাতিক হিসেবে যাকে সহচর হিসেবে গ্রহণ করছ, তাকে নিয়ে সুযোগ্য সুদক্ষ বীরাঙ্গনার মতো এগিয়ে চলো সম্মুখ পথে। মাড়িয়ে চলো বাঁধার বিন্ধ্যাচলকে। তবেই সার্থক হবে তোমার যাত্রা। ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে তোমার সংসার কানন। গোলাপের মত সুন্দর ও কুসুমের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক তোমার জীবন আমরা এই কামনা করি।

আর মনে রেখো কবির সেই অমর বাণী—

"পতি যদি অন্ধ হয় হে সতী বেঁধ না নয়নে আবরণ।
অন্ধ পতির আঁখি দেয় যেন, তোমার সত্য আচরণ।

তোমার—আব্বা ও আম্মা।

স্নেহের মহিমুল !

এতদিন তুমি ছিলে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কিন্তু আজ তোমাকে আপন করে নিলাম আমাদের স্নেহ দুলালী নাজিনাকে তোমার হাতে সমর্পণ করে। শুরু হ'ল তোমার নতুন জীবন। এ জীবন বড়ই বন্ধুর। তাই চলতে গিয়ে বারবার হোচট খেতে হয়—হারিয়ে ফেলতে হয় ধৈর্য। এক্ষেত্রে জীবন সঙ্গিনী হয় প্রেরণার উৎস, বিপদের বন্ধু। জানি না এই গুরু দায়িত্ব আমাদের স্নেহে পালিতা নাজিনা কতটুকু সার্থকতার সঙ্গে পালন করতে পারবে।

পদে পদে তার ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটবেই। তবে তুমি যদি এসব ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখ তাহলে, আল্লার রহমতে নাজিনা তোমার প্রকৃত জীবন সঙ্গিনী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে রহমানির রহিম আল্লাহ পাকের দরগায় দোয়া করি তোমাদের নতুন জীবন সুন্দর হোক, সুখের হোক। তোমার—শ্বশুর শাশুড়ী।

আদরের বোন নাজিনা,

বিধাতার সেই অমোঘ নিয়মে তুমি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ এক নূতন সংসার মাঝে নারীরূপে যখন জন্মগ্রহণ করেছ তখন ধরে রাখবো এমন সাধ্য আমাদের নেই। এখন তোমার একমাত্র অবলম্বন স্বামী। তুমি তাকে এক পদাতিক সৈনিকরূপে গ্রহণ কোরো। শত ঝঞ্ঝা, শত বাঁধা বিপত্তির মধ্যেও চির অটুট রেখ তোমার স্বামী ভক্তিকে এবং তোমার দ্বারা যেন জীবনে চলার পথে কোন রকম বাঁধা না পায়। মুরব্বিদের সদা সর্বদা খেদমত করবে এবং ছোটদের প্রতি আদর ও স্নেহ করবে তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য। ইতি তোমার—বড় ভাই ও বোনেরা।

মেঝে আপার বিয়েতে :—

আশায় ছিলাম আপামনির কবে হবে বিয়ে,
রং ছিটিয়ে সবাই মিলে করব একটু ইয়ে।
প্রভাত হতে শুনতে পেলাম আজকে আপার বিয়ে,
তাইতো আপা হাসছে বসে ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
রং এখন দূরে থাকুক দুলাভাইকে দেখতে চাই,
একটু পরে আসছে দুলা ভাবনার কিছু নাই।
আসছে বর হচ্ছে রাধা ফুটছে বাজি রাশি রাশি,
হয়েছে জবাই গোণ্ডা পাচেক জোয়ান তাজা খাশি।
মণ্ডা মিঠাই হল্লা করে খাওয়া হলো কত,
বাদ গেল না গরীব দুঃখী এসেছিলো যত।
বিদায় নেবার আগে আপা মোদের কথা শোন,
অন্যায় যদি করে থাকি দোষ দিও না কোন।
শ্বশুর বাড়ী গিয়েও আপা করিও মোদের মনে,
মাঝে মাঝে খবর দিও চিঠির আলাপনে।
তোমরা হেথা থাক সুখে এই দোয়াই করি,
মোদের ভুলের ক্ষমা চাইনি তোমার দু'পায় ধরি।

দুলা ভাই!

কবে আসবে দুলা ভাই আশায় ছিলাম বসে,
এমন সময় শুনতে পেলাম দুলা ভাই গেছে এসে।
দুলা ভাই তুমি আচ্ছা মজার লোক,
মোদের আপার উপর পড়লো তোমার চোখ।
চুরি করা বিদ্যা তুমি বেশতো শিখেছিলে,
অনায়াসে মনটা আপার চুরি করে নিলে।
রাগ করো না ও দুলাভাই বলি দু'টি কথা,
মোদের কভু পর করোনা দিয়ে প্রাণে ব্যথা।
বর সেজে বসে আছো মুখ তুলে চাও,
আমরা তোমার আপন জন জেনে শুনে নাও।
মোদের আপা আপন যেমন তুমিও কিন্তু তাই,
আপার মত আদর যেন তোমার কাছে পাই।

ইতি তোমার স্নেহের—ভাই ও বোনেরা।

খালা আম্মার বিয়েতে ঃ—

এমন দিনে খবর হ'ল খালার হবে বিয়ে,
সেজেগুজে আয়রে সবাই কাজল চোখে দি. ।
হাতে নিয়ে সেজে আসছেন খালা ধরার ফাঁদ,
আজকে চাঁদ ফিরে যাও খালা নাহি যাবে ;
খালা গেলে ঘুম পাড়ান গানটি কেবা গাবে,
লোভী সোনা করি মানা খালারে না চেয়ো ।
ওকি ! খালা তুমিও দেখি পরছ নতুন শাড়ী,
শ্বশুর বাড়ী যাবে বলে করছ ভীষণ আড়ি ।
নেহাত যখন যাবে চলে রাখতে নাহি বল,
মাঝে মাঝে দিও দেখা মুছায়ে আঁখি জল ।

ইতি তোমার—ভাগ্নে ভাগ্নিরা ।

ভগ্নিপতিদের একটুখানি ইয়ে ঃ—

বোন নাজিনা—বিবাহ একটি পুরাতন অথচ নিত্য নূতন জিনিষ, না মিষ্টি না টক। ইহাতে কাশ্মীরি ভালবাসা আছে, বিলাতী হাসি আছে। স্বদেশী কান্না আছে। দিল্লীর গৌরব আছে। লাহোরের সৌরভ আছে। খাঁটি প্রেমের পরীক্ষা আছে। যৌবন তরীর পাড়ি আছে। গ্রীষ্মকালের আইসক্রীম আছে। বর্ষাকালের মুড়ি ভাজা আছে, শীত-কালের গরম চা আছে। এতে আছে হাসি-কান্না মান-অপমান, আশা নিরাশা আরও আছে হাতে ধরা, পায়ে পড়া, স্বদেশী গুড়ুম গুড়ুম কিল আছে এবং মুচকি চাহনিও আছে।

আজ যাকে তুমি বরণ করে নিলে জীবনে, সেই তোমার জীবনের একমাত্র সাথী-সহধর্মী। সুখে দুঃখে আপদে বিপদে—বিরহ-বেদনায় তাকে অবহেলা না করে ঘিরে রেখো ছায়ার মত তোমার মাথার পরশ দিয়ে। স্নেহ-চরিত্র—ত্যাগ-তিতিক্ষা—দয়া মায়া, সেবা ও পতি পরায়ন-তার দ্বারা বিশ্ব সভায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বিজয় মাল্যে ভূষিত কর—ভূষিত হও নিজেও।

ইতি তোমার—*ভগ্নিপতিরা।*

সংকলন

বঙ্গভাষার গতি

সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী

[বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই বিদ্যোৎসাহী জমিদার প্রচুর অবদান রেখেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও রয়েছে তাঁর সনিষ্ঠ প্রয়াস। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি বর্তমানে দুর্লভ। বেশ কিছু প্রবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে সেকালের সাময়িক পত্রের পাতায়। "বঙ্গভাষার গতি" শীর্ষক প্রবন্ধটি *ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন* প্রকাশ করেছিল ঐ পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। ঐ বছরের আষাঢ় সংখ্যা *প্রবাসী* (১৪ শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৩৬১–৩৬৬ পৃষ্ঠায় তা পুনর্মুদ্রন করে। *প্রবাসী* থেকে রচনাটি বর্তমানে *আই.বি.এস. জার্নালে* সংকলিত হলো। – সম্পাদক।]

সকল ভাষাতেই লিখিবার ও কহিবার ভঙ্গী কিছু স্বতন্ত্র। কতকগুলি শব্দ কথাবার্তায় সংক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়; কোন কোন স্থলে দুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে একটি ছোট শব্দে পরিণত করা হয়, যেমন 'ভাই শ্বশুর' হইতে 'ভাশুর'। কতকগুলি শব্দ অশ্লীল বা অসভ্যতাব্যঞ্জক বিবেচনায় লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে, যাহা কেবল লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই প্রভেদ যত অধিক, এরূপ আর কোন ভাষাতেই নহে। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা হইতে যে সমস্ত শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলগুলিই এখনও পরগাছার মত বঙ্গভাষার দেহে লাগিয়া আছে। আমাদের সাহিত্যের ও ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক হইলে, বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে, ভাবের আদান প্রদানের পক্ষে যে সুবিধা হইবে, তাহাতে অনেক প্রকৃত বা কল্পিত বিরোধ বিপ্লব যে কমিয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুসলমানের আদব কায়দা, ধর্ম্ম এবং সম্পর্কসূচক কয়েকটি শব্দ ত্যাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা হিন্দুরও তাই; যা কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, মাতৃভাষায় নহে। যেখানে মুসলমান বা হিন্দু মাতৃভাষা না লিখিয়া পারসী বা সংস্কৃত-পড়া বিদ্যা ফলান সেখানে।

প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা কঠিন সংস্কৃত ভাষারই আলোচনা করিতেন, ঐ ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইত এবং সভ্য সমাজে কথাবার্তাও চলিত। অপেক্ষাকৃত সরল প্রাকৃত ভাষা নিম্নশ্রেণীর এবং স্ত্রী সমাজেরই ভাষা ছিল। পূর্ব্বে বাংলা ভাষাকেও পরাকৃত বা প্রাকৃত বলা হইত। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ

বাংলা ভাষাকে আদরের চক্ষে দেখিতেন না। যখন হইতে নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখ মুসলমান রাজগণ বাংলার প্রতি নেক নজর করিতে লাগিলেন তখন বাংলা ভাষা আর উপেক্ষার জিনিষ রহিল না। চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাংলা আপনার ভিখারিণী-মুর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সগর্ব্বে দেব-ভাষার সিংহাসনে বসিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই রাধা মোহন ঠাকুর মহাশয় "পদামৃতসমুদ্রের" সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিতেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের পতন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের সহিত সংস্কৃতের আদার আবার বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে বাংলা ভাষা, মাতা প্রাকৃতের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের জমকাল পরিচ্ছদ পরিতে থাকেন। এদিকে মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন উপকরণ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। তাহা পারসী এবং পারসী ভাষায় প্রচলিত আরবী। যাহা হউক, বাংলা ভাষা আসলে ইতর প্রাকৃতের ঘরে জন্মিয়া সংস্কৃতের ধুতি চাদরের সহিত মুসলমানী কামিজ পরিয়া এক্ষণে ভদ্রভাষার সমাজে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে দিয়াই বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। হিন্দুর মূল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু উহা সাধারণের বুঝিবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যই প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃতের যোগ সাধন করিয়া বাংলাভাষাকে সংস্কৃতানুগতা করা হইয়াছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে বাংলাভাষাকে মুক্ত করিতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রসাধনের জন্য সংস্কৃতের একান্ত দরকার। কিন্তু বঙ্গভাষা তাহা দাসীর মত হাত পাতিয়া লইবে না। সে তাহা তাহার আত্মমর্যাদার দিক্‌টা বজায় রাখিয়াই লইবে। তেমনি মুসলমানও পারসী আরবী শব্দের বেলা করিবেন। সাধারণ লোক ধর্ম্মপ্রাণ, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত সেই ভাষার প্রতি তাহাদের একটা ভক্তিমূলক অনুরাগ আছে। তা সেসব কথার মর্ম্ম তাহারা বুঝুক আর না বুঝুক। কিন্তু যদি ঐ রূপ সংস্কৃত বা আরবী-মূলক শব্দে পরিপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া 'গ্রাম্যস্বাস্থ্যবিধান', 'কৃষি-উন্নতি', 'গোপালন', 'সরল বিজ্ঞান', প্রভৃতি সাধারণের অতি দরকারী বিষয়ের পুস্তক পড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ঐ জাতীয় শব্দের প্রতি তাহাদের প্রকৃত টান কতখানি। তাই বলিতেছিলাম যে বাংলাভাষাকে একদিকে সংস্কৃতাত্মিকা ও অপরদিকে পারসীশব্দবহুল করিবার চেষ্টাটা কিছু বেশী দুরে গড়াইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে লিখিত ভাষার মধ্যে বহু আরবী ও পারসীমুলক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, কথিত ভাষায় ত কথাই নাই। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে যখন বঙ্গভাষার পুনর্গঠন হইতে থাকে, তখন আরবী ও পারসীমূলক শব্দগুলির দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রবিবাবু প্রমুখ প্রতিভাশালী লেখকগণ কথিত ভাষার প্রচুর শব্দ লিখিত ভাষায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে অথচ উচ্চভাব প্রকাশের কোন বাধা নাই। অধিকন্তু লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আরও কমা দরকার, অন্যথা ভাষার সম্প্রসারণ হইবে না। অনেকে মনে করেন, গভীর ভাব প্রকাশের জন্য কটমট শব্দের দরকার; অর্থাৎ দুর্বোধ হইলেই ভাব গভীর হইল। কিন্তু আজকাল কয়েকজন যশস্বী লেখক কথিত ভাষাতেই গভীর দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ সকল আলোচনা যেমনই সুখপাঠ্য, তেমনই গভীর ভাবপূর্ণ। এক শ্রেণীর পাঠক

আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে বাংলা ভাষার বাহ্যিক আবরণটাকে এইরূপে হালকা করিয়া ঐ সকল লেখক এমন সুন্দর ভাষাটাকে মাটি করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা এই হিসাবে দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। যে সাধু রচনা কেবল পণ্ডিতমন্ডলীকেই তুষ্ট করে না, সর্বসাধারণের অন্তরের মধ্যেও নিজের আসন সংস্থাপিত করিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে, তাহার যে সকলের চেয়ে বেশী সার্থকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত-বহুল শব্দ যে বাংলার আদর্শ, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতের নিকট সহজ ও সরল বলিয়া বোধ হইলেও, সংস্কৃতনভিজ্ঞা মুসলমানের নিকট উহা পরের ভাষাই রহিয়া যায়। এই জন্যই কথিত ভাষাকে একটু মার্জ্জিত করিয়া আজকাল যে রচনা-রীতির প্রচলন হইতেছে তাহাই আমাদের নিজের ভাষা বলিয়া স্নেহপুষ্পাঞ্জলির অধিকারী। বঙ্গদেশের কোন কোন শহরে উর্দ্দুভাষী মুসলমান থাকিলেও, বিশাল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই বাংলা। ইহাতে যাহারা দ্বিধা প্রকাশ করিবেন, হয় তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিবেন, নতুবা বঙ্গভাষার উপর মমতাবিহীন হইয়াই ঐরূপ কথা বলিবেন। হৃদয়বান মুসলমান বাংলার মাটিতে জন্মিয়া, বাংলার আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়া, কখনই বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বঙ্গীয় মুসলমানের অল্প সংখ্যকই বিদেশাগত বংশসম্ভূত। অবশিষ্ট মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ এই বঙ্গেরই অধিবাসী হিন্দু ছিলেন। ইহাতে অগৌরবের কিছুই নাই। ইসলাম গ্রহণ করিলেই উচ্চনীচভেদ তিরোহিত হয়, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকে না, ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ের চক্ষেই সকলে একশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে এবং এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে সকলে আবদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহু হীন অবস্থার এবং কোন কোন স্থলে অবস্থাপন্ন হিন্দুরও মুসলমান ধর্মের উপর টান পড়িয়াছিল। অত্যাচারী রাজশক্তি কৃপাণের বলে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। অতএব বঙ্গভাষা তাহার আবির্ভাব-কাল হইতেই অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষারূপে অধিষ্ঠিতা আছেন। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বিদেশী মুসলমানগণের সহিত আদান প্রদান ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠের ফলে বাঙ্গালা ভাষার সহিত আরবী পারসী শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন; অধিকন্তু সেকালে পারসী ভাষা জানার পরিচয় দেওয়া ভদ্রতার লক্ষণ ছিল; এখন মুসলমানের উর্দু ও সকলেরই ইংরেজি জানা ভদ্রতার লক্ষণ হইয়াছে। মুসলমান বাদশাহদিগের আমলে হিন্দুগণও আরবী ও পারসী ভাষার বিস্তর আলোচনা করিতেন। এই কারণে তাঁহাদেরও কথিত ভাষায়, এবং ক্রমে লিখিত ভাষাতেও প্রচুর আরবী পারসী শব্দ দাখিল হইয়া গিয়াছিল। Sayce বলেন, - "No people can have near neighbours without receiving from them in the shape of inventions, products or social institution, and these, almost inveitably, are adopted under their foreign names." এখনও ইংরেজীশিক্ষিতগণ কথিত ভাষায় অযথা ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এই মিশ্রিত ভাষাতেই অনেক মুসলমান গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দী হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিয়াছেন। আলাওলের পদ্মাবতীর ভাষা যেমন কৃত্রিম, হিন্দুলেখকগণের ভাষাও তেমনি কৃত্রিম। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ কথিত ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইতে না পারিলেও, লিখিত ভাষা হইতে অসাধু বা 'যাবনিক' বলিয়া বর্জন পূর্ব্বক বাংলাভাষাকে একরূপ মুসলমানী গন্ধশূন্য করিয়া

তুলিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান বাংলাভাষাটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহা মুসলমানদের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি, গার্হস্থ্য জীবন প্রভৃতি আলোচনা করিবার উপযুক্ত নহে। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারেও অনেক প্রভেদ। অতএব উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ধারায়ও পার্থক্য আছে; এবং উভয়ের ভাষার গতি স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে যে উদ্দাম আকাঙ্খা দেখা যায়, তাহার সংযম সাধন করিয়া বাংলাদেশে, আমাদের মাতৃভূমিতে, একই ভাষা প্রচলন করা একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা, এই ভাষাসমন্বয়ের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমানে লিখিত বাংলাভাষায়, যতদূর সম্ভব, হিন্দু মুসলমানের ব্যবহৃত কথিত বাংলার প্রচলন করিতে হইবে। বাংলাভাষাকে প্রাণহীন, গৌরবহীন করিয়া আমরা কোন পরিবর্তন চাহি না। এই পরিবর্তন-চেষ্টার ফলে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ বাংলা ভাষার স্থান পাইবে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের তাহা সহিয়া লইতে হইবে। আমরাও বর্ত্তমান মুসলমানী বাংলা হইতে অনেক অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দ ত্যাগ করিয়া বহু সংস্কৃত শব্দ আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

আমাদের বর্ত্তমান বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত যে সমস্ত উপন্যাস, নাটক, গল্প ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, এবং মুসলমানে মুসলমানে যে-সব কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তদ্দারা হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে। কথোপকথনের ভাষা পড়িয়া যদি লোক না চেনা যায়, টিকেট দেখিয়া যদি জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তবে সে রচনা যে নিশ্চয়ই ব্যর্থ রচনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমানের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের এই কৃত্রিমতা দূর করিতে হইবে। মুসলমানের সামাজিক বা ধর্ম্ম জীবনে বিশেষ ভাব প্রকাশার্থ আমরা এখন যে-সব শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি যাহা ভাষান্তরিত করা যায় না, এবং যাহা আমরা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারি না, কেবল সেই গুলিকেই বাংলা ভাষার বুকে স্থান দেওয়া; এবং হিন্দুগণ যে সব মুসলমানী শব্দ পূর্ব হইতেই কথিত ভাষার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, বিচার ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা লিখিত ভাষায় প্রচলিত করিয়া বাংলাভাষার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা-ইহার বেশী আর কিছু আবশ্যক হইবে না।

আমরা হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুসলমানী বাংলাও চাহি না; আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে বুঝে। আমরা আরও কিছু চাই। আমরা চাই ভাষার সরলতা। ভাষার উদ্দেশ্য মনোভাব প্রকাশ; যে প্রকার বাক্যবিন্যাস দ্বারা সুললিত রূপে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই উত্তম রীতির অনুযায়ী (Style)। শব্দের কাঠিন্য বা সমাস ও সন্ধির বাহুল্য ভাষাকে অনর্থক জটিল করিয়া তুলে। ভাষায় জটিলতা মনুষ্যের মনের কুটিলতা। যেমন, যাহারা কড়া তামাক খাইতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট মিঠে-কড়া ভাল লাগে না, সেইরূপ ভাষার অযথা বাহুল্যে অভ্যস্ত আমাদের কানে হয়ত সরল ভাষা ভাল না শুনাইতে পারে। কিন্তু বিবেচকের পক্ষে তাহা নয়। তবে এ কথা কেহ যেন না বুঝেন যে, যে-সকল শব্দ কথিত ভাষায় অপ্রচলিত, আমরা

তাহাদের ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। যে-সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ বাংলায় প্রচলিত নাই, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষা হইতে ধার করিতে হইবে। তবে কথা এই, আমরা অযথা ধার করিব না। যেমন একই মাল-মসলা লইয়া পাকা ও আনাড়ি দুই মিস্ত্রি সুন্দর ও কুৎসিত দুই রকম ইমারত গড়ে, সেইরূপ লেখকের শক্তিভেদে এই সরল ভাষা দ্বারা সুন্দর বা কর্কশ রচনার সৃষ্টি হইবে। রচনা যদি অসুন্দর হয়, তাহা সরল ভাষার দোষ নহে।

আর এক কথা। শব্দের অন্যায় বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ, অক্ষরেরও তাই। বাংলায় যখন শ, ষ এবং হস্ত স্রাব ইত্যাদি শব্দে ছাড়া স-এর, ণ ন-এর, ঙ, ঞ, ং এর উচ্চারণের কোন তফাৎ নাই, তখন সেগুলিকে রাখিয়া ছেলেপিলের অনর্থক মাথা খাওয়া কেন, তাহা বুঝি না। যখন প্রাকৃতে উচ্চারণ অনুসারে বানান হয়, তখন তাহার কন্যা বাংলায় কেন হইবে না? তবে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত লিখিবার জন্য এই অক্ষরগুলির অবশ্যই দরকার আছে। বস্তুত, বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্গীয় 'ব' ও অন্ত্যস্থ 'ব' এর একরূপ আকৃতি করিয়া এবং ঋ ও ঌ কে বর্ণমালা হইতে বাদ দিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বানান সংস্কারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, প্রথম প্রথম তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা খুব ভাল জিনিষ না পাইতে পারি। কিন্তু তাঁহারা ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যখন রাস্তা করিয়া দিবেন, তখন সেই পথ দিয়া বড় বড় সেনাপতিরা অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া আপনাদের প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যের বুকে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে পারিবেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা যখন বাংলা গদ্যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইত তবে তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ই হইতেন। মৃত্যুঞ্জয় হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমের পূর্ব্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মনস্বীরা অনবরত পাথর কাটিয়া বন জঙ্গল ছাঁটিয়া রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

IBS PUBLICATIONS

The IBS, established in 1974, is an advanced interdisciplinary centre for study and research on the history and culture of Bangladesh and such other subjects as are significantly related to the life and society of Bangladesh leading to M. Phil and Ph.D. degrees.

The IBS has a number of publications: Two annual journals, seminar volumes, books and monographs to its credit.

PUBLICATIONS

1. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* edited by S. A. Akanda, Vols, I-VI (1979-82); M. S. Qureshi, Vols, VII-XII (1983-89); S. A. Akanda, Vols, XIII - XV (1990-92); M. S. Qureshi, Vols XVI - XVIII (1995)
2. *Reflections on Bengal Renaissance* (seminar volume I) edited by David Kopf and S. Joarder (1977).
3. *Oitijya, Sangskriti, Shahitya* (seminar volume 3 in Bengali) edited by M. S. Qureshi (1979).
4. *Studies in Modern Bengal* (seminar volume 2) edited by S. A. Akanda (1981)
5. *The New Province of Eastern Bengal and Assam* (1905-1911) by M. K. U. Mollah (1981).
6. *Provincial Autonomy in Bengal* (1937-1943) (seminar volume 7) by Enayetur Rahim (1981)
7. *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (seminar volume 4) edited by S. A. Akanda (1983).
8. *Tribal Cultures in Bangladesh* (seminar volume 5) edited by M. S. Qureshi (1984).
9. *Bankim Chandra O Amra* (seminar volume 6) by Amanullah Ahmed (1985)
10. Bangalir Atmaparichaya (seminar volume 7) edited by Safar A. Akanda (1991).
11. *Rural Proverty and Development Strategies in Bangladesh* (seminar volume 8) edited by Safar A. Akanda & Aminul Islam (1991).
12. *History of Bengal: Mughal Period,* Vol. I & Vol. II. by Abdul Karim.(1992, 1995)
13. *The Institute of Bangladesh Studies, an introduction,* (1994).
14. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An up-to-date Index* by Md. Shahjahan Rarhi (1994)
15. *IBS Journal* Annual Review in Bangla edited by M. S. Qureshi; 1400 - I, 1401-2, 1402-3

For IBS Publications, please write to:

The Librarian
Institute of Bangladesh Studies
Rajshahi University
Rajshahi- 6205, Bangladesh.